গোরা

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৯১১

মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান প্রেস
৩, পাইওনিয়ার রোড, এলাহাবাদ
শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

১৪ই মাঘ ১৩১৬

গোরা।

১

শ্রাবণ মাসের সকাল বেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্ম্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে।

এমন দিনে বিনা কাজের অবকাশে বিনয়ভূষণ তাহার বাসার দোতলার বারান্দায় একলা দাঁড়াইয়া রাস্তায় জনতার চলাচল দেখিতেছিল। কালেজের পড়াও অনেকদিন চুকিয়া গেছে, অথচ সংসারের মধ্যেও প্রবেশ করে নাই, বিনয়ের অবস্থাটা এইরূপ। সভাসমিতি চালানো এবং খবরের কাগজ লেখায় মন দিয়াছে—কিন্তু তাহাতে সব মনটা ভরিয়া উঠে নাই। অন্তত আজ সকাল বেলায় কি করিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

আলখাল্লা-পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল—

> "খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখী কম্‌নে আসে যায়—
> ধরতে পার্‌লে মনোবেড়ি দিতেম পাখীর পায়।"

বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই অচিন্ পাখীর গানটা লিখিয়া লয়, কিন্তু ভোর রাত্রে যেমন শীত-শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে উদ্যম থাকে না তেমনি একটা আলস্যের ভাবে

বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল ঐ অচেনা পাখীর সুরটা মনের মধ্যে গুন্ গুন্ করিতে লাগিল।

এমন সময় ঠিক তাহার বাসার সাম্‌নেই একটা ঠিকা গাড়ির উপর একটা মস্ত জুড়িগাড়ি আসিয়া পড়িল এবং ঠিকা গাড়ির একটা চাকা ভাঙিয়া দিয়া দৃক্‌পাত না করিয়া বেগে চলিয়া গেল। ঠিকা গাড়িটা সম্পূর্ণ উল্‌টাইয়া না পড়িয়া একপাশে কাত হইয়া পড়িল।

বিনয় তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিল গাড়ি হইতে একটি সতেরো আঠারো বৎসরের মেয়ে নামিয়া পড়িয়াছে, এবং ভিতর হইতে একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক নামিবার উপক্রম করিতেছেন।

বিনয় তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া দিল, এবং তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার লাগেনি ত?

তিনি "না, কিছু হয় নি" বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন; সে হাসি তখনই মিলাইয়া গেল এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। বিনয় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল ও উৎকণ্ঠিত মেয়েটিকে কহিল—এই সাম্‌নেই আমার বাড়ী; ভিতরে চলুন।

বৃদ্ধকে বিছানায় শোয়ানো হইলে মেয়েটি চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল ঘরের কোণে একটি জলের কুঁজা আছে। তখনি সেই কুঁজার জল গেলাসে করিয়া লইয়া বৃদ্ধের মুখে ছিটা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল এবং বিনয়কে কহিল,—একজন ডাক্তার ডাক্‌লে হয় না?

বাড়ির কাছেই ডাক্তার ছিল। বিনয় তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে বেহারা পাঠাইয়া দিল।

ঘরের একপাশে টেবিলের উপরে একটা আয়না, তেলের শিশি ও চুল আঁচড়াইবার সরঞ্জাম ছিল। বিনয় সেই মেয়েটির পিছনে দাঁড়াইয়া সেই আয়নার দিকে একদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিনয় ছেলেবেলা হইতেই কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা

করিয়াছে। সংসারের সঙ্গে তাহার যাহা কিছু পরিচয় সে সমস্তই বইয়ের ভিতর দিয়া। নিঃসম্পর্কীয়া ভদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার কোনো দিন কোনো পরিচয় হয় নাই।

আয়নার দিকে চাহিয়া দেখিল, যে মুখের ছায়া পড়িয়াছে সে কি সুন্দর মুখ! মুখের প্রত্যেক রেখা আলাদা করিয়া দেখিবার মত তাহার চোখের অভিজ্ঞতা ছিল না। কেবল সেই উদ্বিগ্ন স্নেহে আনত তরুণ মুখের কোমলতামণ্ডিত উজ্জ্বলতা বিনয়ের চোখে সৃষ্টির সদ্যঃপ্রকাশিত একটি নূতন বিস্ময়ের মত ঠেকিল।

একটু পরেই বৃদ্ধ অল্পে অল্পে চক্ষু মেলিয়া "মা" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মেয়েটি তখন দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া বৃদ্ধের মুখের কাছে মুখ নীচু করিয়া আর্দ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা! তোমার কোথায় লেগেছে?

"এ আমি কোথায় এসেছি" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই বিনয় সম্মুখে আসিয়া কহিল—উঠ্‌বেন না—একটু বিশ্রাম করুন,—ডাক্তার আস্‌চে।

তখন তাঁহার সব কথা মনে পড়িল ও তিনি কহিলেন—মাথার এই খানটায় একটু বেদনা বোধ হচ্চে কিন্তু গুরুতর কিছুই নয়।

সেই মুহূর্ত্তেই ডাক্তার জুতা মচ্‌মচ্ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তিনিও বলিলেন বিশেষ কিছুই নয়। একটু গরম দুধ দিয়া অল্প ব্রাণ্ডি খাইবার ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া যাইতেই বৃদ্ধ অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মেয়ে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিল—বাবা, ব্যস্ত হচ্চ কেন? ডাক্তারের ভিজিট্ ও ওষুধের দাম বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দেব।—বলিয়া সে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল।

সে কি আশ্চর্য্য চক্ষু! সে চক্ষু বড় কি ছোট, কালো কি কটা সে তর্ক মনেই আসে না—প্রথম নজরেই মনে হয় এই দৃষ্টির একটা

অসন্দিগ্ধ প্রভাব আছে। তাহাতে সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, তাহা একটা স্থির শক্তিতে পূর্ণ।

বিনয় বলিতে চেষ্টা করিল,—ভিজিট অতি সামান্য, সেজন্যে—সে আপনারা—সে আমি—

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকাতে কথাটা ঠিকমত শেষ করিতেই পারিল না। কিন্তু ভিজিটের টাকাটা যে তাহাকে লইতে হইবে সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় রহিল না।

বৃদ্ধ কহিলেন,—দেখুন আমার জন্যে ব্রাণ্ডির দরকার নেই—

কন্যা তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল,—কেন বাবা, ডাক্তারবাবু যে বলে গেলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন,—ডাক্তাররা অমন বলে থাকে, ওটা ওদের একটা কুসংস্কার। আমার যেটুকু দুর্ব্বলতা আছে একটু গরম দুধ খেলেই যাবে।

দুধ খাইয়া বল পাইলে বৃদ্ধ বিনয়কে কহিলেন—এবারে আমরা যাই। আপনাকে বড় কষ্ট দিলুম।

মেয়েটি বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—একটা গাড়ি।

বৃদ্ধ সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—আবার কেন ওঁকে ব্যস্ত করা? আমাদের বাসা ত কাছেই, এটুকু হেঁটেই যাব।

মেয়েটি বলিল—না বাবা, সে হতে পারে না!

বৃদ্ধ ইহার উপর কোনো কথা কহিলেন না এবং বিনয় নিজে গিয়া গাড়ি ডাকিয়া আনিল। গাড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার নামটি কি?

বিনয়। আমার নাম শ্রীবিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ কহিলেন,—আমার নাম পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। নিকটেই ৭৮ নম্বর বাড়িতে থাকি। কখনো অবকাশমত যদি আমাদের ওখানে যান ত বড় খুসি হব।

মেয়েটি বিনয়ের মুখের দিকে দুই চোখ তুলিয়া নীরবে এই অনুরোধের সমর্থন করিল। বিনয় তখনই সেই গাড়িতে উঠিয়া তাঁহাদের বাড়িতে যাইতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু সেটা ঠিক শিষ্টাচার হইবে কি না ভাবিয়া না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি ছাড়িবার সময় মেয়েটি বিনয়কে ছোট একটি নমস্কার করিল। এই নমস্কারের জন্য বিনয় একেবারেই প্রস্তুত ছিল না এইজন্য হতবুদ্ধি হইয়া সে প্রতিনমস্কার করিতে পারিল না। এইটুকু ত্রুটি লইয়া বাড়িতে ফিরিয়া সে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল। ইঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে বিদায় হওয়া পর্য্যন্ত বিনয় নিজের আচরণ সমস্তটা আলোচনা করিয়া দেখিল—মনে হইল আগাগোড়া তাহার সমস্ত ব্যবহারেই অসভ্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। কোন্ কোন্ সময়ে কি করা উচিত ছিল, কি বলা উচিত ছিল, তাহা লইয়া মনে মনে কেবলি বৃথা আন্দোলন করিতে লাগিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে রুমাল দিয়া মেয়েটি তাহার বাপের মুখ মুছাইয়া দিয়াছিল সেই রুমালটি বিছানার উপর পড়িয়া আছে—সেটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইল। তাহার মনের মধ্যে বাউলের সুরে ঐ গানটা বাজিতে লাগিল—

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়।"

বেলা বাড়িয়া চলিল, বর্ষার রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, গাড়ির স্রোত আপিসের দিকে বেগে ছুটিতে লাগিল, বিনয় তাহার দিনের কোনো কাজেই মন দিতে পারিল না। তাহার এই ক্ষুদ্র বাসা এবং চারিদিকের কুৎসিৎ কলিকাতা মায়াপুরীর মত হইয়া উঠিল ;—এই বর্ষাপ্রভাতের রৌদ্রের দীপ্ত আভা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল—তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ম্ময় যবনিকার মত পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল।

এমন সময় দেখিল একটি সাত আট বছরের ছেলে রাস্তায় দাঁড়াইয়া

তাহার বাড়ির নম্বর দেখিতেছে। বিনয় উপর হইতে বলিল—এই যে, এই বাড়িই বটে। ছেলেটি যে তাহারই বাড়ির নম্বর খুঁজিতেছিল সে সম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহ মাত্র নাই। তাড়াতাড়ি বিনয় সিঁড়ির উপর চটিজুতা চট্ চট্ করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল—অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। কহিল—দিদি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে—এই বলিয়া সেই বালক বিনয়ভূষণের হাতে এক পত্র দিল।

বিনয় চিঠিখানি লইয়া প্রথমে লেফাফার উপরটাতে দেখিল, পরিষ্কার মেয়েলি ছাঁদের ইংরেজি অক্ষরে তাহার নাম লেখা। ভিতরে চিঠিপত্র কিছুই নাই কেবল কয়েকটি টাকা আছে।

ছেলেটি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বিনয় তাহাকে কোনোমতে ছাড়িয়া দিল না। তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে দোতালার ঘরে লইয়া গেল।

ছেলেটির রং তাহার দিদির চেয়ে কালো, কিন্তু মুখের ছাঁদে কতকটা সাদৃশ্য আছে। তাহাকে দেখিয়া বিনয়ের মনে ভারি একটা স্নেহ এবং আনন্দ জন্মিল।

ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ। সে ঘরে ঢুকিয়া দেয়ালে একটা ছবি দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—এ কার ছবি?

বিনয় কহিল—এ আমার একজন বন্ধুর ছবি।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—বন্ধুর ছবি? আপনার বন্ধু কে?

বিনয় হাসিয়া কহিল—তুমি তাকে চিনবে না। আমার বন্ধু গৌরমোহন, তাঁকে গোরা বলি। আমরা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েছি।

"এখনো পড়েন?"

"না এখন আর পড়িনে।"

"আপনার স-ব পড়া হয়ে গেছে ?"

বিনয় এই ছোট ছেলের কাছেও গর্ব্ব করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিল—হাঁ, সব পড়া হয়ে গেছে।

ছেলেটি বিস্মিত হইয়া একটু নিশ্বাস ফেলিল। সে বোধ হয় ভাবিল এত বিদ্যা সেও কত দিনে শেষ করিতে পারিবে।

বিনয়। তোমার নাম কি ?

"আমার নাম শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল—মুখোপাধ্যায় ?

তাহার পরে একটু একটু করিয়া পরিচয় পাওয়া গেল। পরেশ বাবু ইহাদের পিতা নহেন—তিনি ইহাদের দুই ভাই বোনকে ছেলেবেলা হইতে পালন করিয়াছেন। ইহার দিদির নাম আগে ছিল রাধারাণী—পরেশ বাবুর স্ত্রী তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া "সুচরিতা" নাম রাখিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের সঙ্গে সতীশের খুব ভাব হইয়া গেল। সতীশ যখন বাড়ী যাইতে উদ্যত হইল বিনয় কহিল—তুমি একলা যেতে পারবে ?

সে গর্ব্ব করিয়া কহিল—আমি ত একলা যাই।

বিনয় কহিল—আমি তোমাকে পৌঁছে দিই গে।

তাহার শক্তির প্রতি বিনয়ের এই সন্দেহ দেখিয়া সতীশ ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল,—কেন আমি একলা যেতে পারি !—এই বলিয়া তাহার একলা যাতায়াতের অনেকগুলি বিস্ময়কর দৃষ্টান্তের সে উল্লেখ করিতে লাগিল। কিন্তু তবু যে বিনয় কেন তাহার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গেল তাহার ঠিক কারণটি বালক বুঝিতে পারিল না।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—আপনি ভিতরে আসবেন না ?

বিনয় সমস্ত মনকে দমন করিয়া কহিল—আর একদিন আসব।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বিনয় সেই শিরোনামা-লেখা লেফাফা পকেট

হইতে বাহির করিয়া অনেকক্ষণ দেখিল—প্রত্যেক অক্ষরের টান ও ছাঁদ এক রকম মুখস্থ হইয়া গেল—তার পরে টাকা-সমেত সেই লেফাফা বাক্সের মধ্যে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল। এ কয়টা টাকা যে কোনো দুঃসময়ে খরচ করিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না।

২

বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারি হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নীচে কলিকাতা সহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের মত ল্যাজের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। কাল সন্ধ্যা হইতে টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া কেবলি বর্ষণ হইয়াছে; সে বৃষ্টিতে রাস্তার মাটিকে কাদা করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু কাদাকে ধুইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবার মত বল প্রকাশ করে নাই। আজ বেলা চারটে হইতে বৃষ্টি বন্ধ আছে কিন্তু মেঘের গতিক ভাল নয়। এইরূপ আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় সন্ধ্যাবেলায় নির্জ্জন ঘরের মধ্যে যখন মন টেকে না এবং বাহিরেও যখন আরাম পাওয়া যায় না সেই সময়টাতে দুটি লোক একটি তেতলা বাড়ির স্যাঁতসেঁতে ছাতে দুটি বেতের মোড়ার উপর বসিয়া আছে।

এই দুই বন্ধু যখন ছোট ছিল তখন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই ছাতে ছুটাছুটি খেলা করিয়াছে; পরীক্ষার পূর্ব্বে উভয়ে চীৎকার করিয়া পড়া আবৃত্তি করিতে করিতে এই ছাতে দ্রুতপদে পাগলের মত পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছে; গর্ম্মিকালে কালেজ হইতে ফিরিয়া রাত্রে এই ছাতের উপরেই আহার করিয়াছে, তার পরে তর্ক করিতে করিতে কতদিন রাত্রি দুইটা হইয়া গেছে এবং সকালে রৌদ্র আসিয়া যখন তাহাদের মুখের উপর পড়িয়াছে তখন চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিয়াছে সেইখানেই মাদুরের উপরে দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কালেজে পাস করা যখন একটাও

আর বাকি রহিল না তখন এই ছাতের উপরে মাসে একবার করিয়া যে হিন্দুহিতৈষী সভার অধিবেশন হইয়া আসিয়াছে এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজন তাহার সভাপতি এবং আর একজন তাহার সেক্রেটরি।

যে ছিল সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন; তাহাকে আত্মীয় বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে। সে চারিদিকের সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে তাহার কালেজের পণ্ডিত মহাশয় রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন। তাহার গায়ের রংটা কিছু উগ্ররকমের শাদা—হল্‌দের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মত বড়—গলার আওয়াজ এমনি মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে "কেরে" বলিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড় এবং অতিরিক্ত রকমের মজ্‌বুৎ; চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মত; চোখের উপর ভ্রূরেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গেছে। ওষ্ঠাধর পাৎলা এবং চাপা; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মত ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মত অতি দূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া আছে অথচ এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিষকেও বিদ্যুতের মত আঘাত করিতে পারে। গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।

আর তাহার বন্ধু বিনয় সাধারণ বাঙালী শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত নম্র, অথচ উজ্জ্বল; স্বভাবের সৌকুমার্য্য ও বুদ্ধির প্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে। কালেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে; গোরা কোনো মতেই তাহার সঙ্গে সমান চলিতে পারিত না। পাঠ্য বিষয়ে গোরার তেমন আসক্তিই ছিল

না; বিনয়ের মত সে দ্রুত বুঝিতে এবং মনে রাখিতে পারিত না। বিনয়ই তাহার বাহন হইয়া কালেজের পরীক্ষা কয়টার ভিতর দিয়া নিজের পশ্চাতে তাহাকে টানিয়া পার করিয়া আনিয়াছে।

গোরা বলিতেছিল,—শোন বলি! অবিনাশ যে ব্রাহ্মদের নিন্দে করছিল, তাতে এই বুঝা যায় যে লোকটা বেশ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এতে তুমি হঠাৎ অমন ক্ষাপা হয়ে উঠলে কেন?

বিনয়। কি আশ্চর্য্য! এ সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন চলতে পারে তাও আমি মনে করতে পারতুম না।

গোরা। তা যদি হয় তবে তোমার মনে দোষ ঘটেছে। একদল লোক সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে সব বিষয়ে উল্টারকম করে চলবে আর সমাজের লোক অবিচলিত ভাবে তাদের সুবিচার করবে এ স্বভাবের নিয়ম নয়। সমাজের লোকে তাদের ভুল বুঝবেই, তারা সোজা ভাবে যেটা করবে এদের চোখে সেটা বাঁকা ভাবে পড়বেই, তাদের ভাল এদের কাছে মন্দ হয়ে দাঁড়াবেই, এইটেই হওয়া উচিত। ইচ্ছামত সমাজ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার যতগুলো শাস্তি আছে এও তার মধ্যে একটা।

বিনয়। যেটা স্বাভাবিক সেইটেই যে ভাল, তা আমি বলতে পারিনে।

গোরা একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়া কহিল,—আমার ভালয় কাজ নাই। পৃথিবীতে ভাল দুচারজন যদি থাকে ত থাক্ কিন্তু বাকি সবাই যেন স্বাভাবিক হয়! নইলে কাজও চলে না প্রাণও বাঁচে না! ব্রাহ্ম হয়ে বাহাদুরী করবার সখ যাদের আছে অব্রাহ্মরা তাদের সব কাজেই ভুল বুঝে নিন্দে করবে এটুকু দুঃখ তাদের সহ্য করতেই হবে। তারাও বুক ফুলিয়ে বেড়াবে আর তাদের বিরুদ্ধ পক্ষও তাদের পিছন পিছন বাহবা দিয়ে চলবে জগতে এটা ঘটে না, ঘটলেও জগতের সুবিধে হত না।

বিনয়। আমি দলের নিন্দের কথা বল্‌চিনে—ব্যক্তিগত—

গোরা। দলের নিন্দে আবার, নিন্দে কিসের! সে ত মতামত বিচার। ব্যক্তিগত নিন্দেই চাই। আচ্ছা সাধু পুরুষ, তুমি নিন্দে করতে না?

বিনয়। করতুম। খুবই করতুম—কিন্তু সেজন্যে আমি লজ্জিত আছি।

গোরা তার ডান হাতের মুঠা শক্ত করিয়া কহিল—না, বিনয় এ চল্‌বে না, কিছুতেই না।

বিনয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পরে কহিল—কেন কি হয়েছে? তোমার ভয় কিসের?

গোরা। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি তুমি নিজেকে দুর্ব্বল করে ফেল্‌চ।

বিনয় ঈষৎ একটুখানি উত্তেজিত হইয়া কহিল—দুর্ব্বল! তুমি জান, আমি ইচ্ছে কর্‌লে এখনি তাঁদের বাড়ি যেতে পারি—তাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণও করেছিলেন—কিন্তু আমি যাই নি।

গোরা। কিন্তু এই যে যাও নি সেই কথাটা কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌চ না। দিন রাত্রি কেবল ভাবচ, যাই নি, আমি তাদের বাড়ি যাই নি—এর চেয়ে যে যাওয়াই ভাল।

বিনয়। তবে কি যেতেই বল?

গোরা নিজের জানু চাপড়াইয়া কহিল,—না, আমি যেতে বলি নে। আমি তোমাকে লিখে পড়ে দিচ্চি, যে দিন তুমি যাবে সে দিন একেবারে পুরোপুরিই যাবে। তার পর দিন থেকেই তাদের বাড়ি খানা খেতে সুরু কর্‌বে এবং ব্রাহ্ম সমাজের খাতায় নাম লিখিয়ে একেবারে দিগ্বিজয়ী প্রচারক হয়ে উঠবে।

বিনয়। বল কি! তার পরে?

গোরা। আর তার পরে! মরার বাড়া ত গাল নাই! ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, তোমার আচার বিচার কিছুই থাকবে না, কম্পাস-ভাঙা কাণ্ডারীর মত তোমার পূর্ব্ব পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে—তখন মনে হবে জাহাজ বন্দরে উত্তীর্ণ করাই কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা—কেবল না-হক্ ভেসে চলে যাওয়াই যথার্থ জাহাজ চালানো। কিন্তু এ সব কথা নিয়ে বকাবকি করতে আমার ধৈর্য্য থাকে না—আমি বলি তুমি যাও! অধঃপাতের মুখের সামনে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের সুদ্ধ কেন ভয়ে-ভয়ে রেখে দিয়েচ?

বিনয় হাসিয়া উঠিল, কহিল,—ডাক্তার আশা ছেড়ে দিলেই যে রোগী সব সময়ে মরে তা নয়! আমি ত নিদেন কালের কোনো লক্ষণ বুঝতে পারচিনে।

গোরা। পারচ না?

বিনয়। না।

গোরা। নাড়ি ছাড়ে ছাড়ে করচে না?

বিনয়। না, দিব্যি জোর আছে।

গোরা। মনে হচ্চে না যে, শ্রীহস্তে যদি পরিবেষণ করে তবে ম্লেচ্ছের অন্নই দেবতার ভোগ?

বিনয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কহিল,—গোরা, বস্, এইবার থামো।

গোরা। কেন এর মধ্যে ত আব্রুর কোনো কথা নেই। শ্রীহস্ত ত অসূর্য্যম্পশ্য নয়। পুরুষ মানুষের সঙ্গে যার শেক্‌হ্যাণ্ড্ চলে সেই পবিত্র করপল্লবের উল্লেখটি পর্য্যন্ত যখন তোমার সহ্য হচ্চে না, তদা ন সংশে মরণায় সঞ্জয়!

বিনয়। দেখ গোরা, আমি স্ত্রীজাতিকে ভক্তি করে থাকি—আমাদের শাস্ত্রেও—

গোরা। স্ত্রীজাতিকে যে ভাবে ভক্তি করচ তার জন্যে শাস্ত্রের দোহাই পেড় না! ওকে ভক্তি বলে না, যা বলে তা যদি মুখে আনি ত মারতে আস্‌বে।

বিনয়। এ তুমি গায়ের জোরে বলচ।

গোরা। শাস্ত্রে মেয়েদের বলেন "পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।" তাঁরা পূজার্হা কেন না গৃহকে দীপ্তি দেন, পুরুষ মানুষের হৃদয়কে দীপ্ত করে তোলেন বলে বিলিতি বিধানে তাঁদের যে মান দেওয়া হয় তাকে পূজা না বল্লেই ভাল হয়।

বিনয়। কোনো কোনো স্থলে বিকৃতি দেখা যায় বলে কি একটা বড় ভাবের উপর ওরকম কটাক্ষপাত করা উচিত!

গোরা অধীর হইয়া কহিল,—বিনু, এখন যখন তোমার বিচার করবার বুদ্ধি গেছে তখন আমার কথাটা মেনেই নাও—আমি বল্‌চি বিলিতি শাস্ত্রে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে সমস্ত অত্যুক্তি আছে তার ভিতরকার কথাটা হচ্চে বাসনা। স্ত্রীজাতিকে পূজো করবার জায়গা হল মার ঘর, সতীলক্ষ্মী গৃহিণীর আসন—সেখান থেকে সরিয়ে এনে তাঁদের যে স্তব করা হয়, তার মধ্যে অপমান লুকিয়ে আছে। পতঙ্গের মত তোমার মনটা যে কারণে পরেশ বাবুর বাড়ির চারিদিকে ঘুরচে, ইংরাজিতে তাকে বলে থাকে 'লাভ্'—কিন্তু ইংরেজের নকল করে ঐ 'লাভ্' ব্যাপারটাকেই সংসারের মধ্যে একটা চরম পুরুষার্থ বলে উপাসনা করতে হবে, এমন বাঁদরামি যেন তোমাকে না পেয়ে বসে!

বিনয় কষাহত তাজা ঘোড়ার মত লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—আঃ গোরা, থাক্ যথেষ্ট হয়েচে!

গোরা। কোথায় যথেষ্ট হয়েচে! কিছুই হয় নি! স্ত্রী আর পুরুষকে তাদের স্বস্থানে বেশ সহজ করে দেখ্‌তে শিখিনি বলেই আমরা কতকগুলা কবিত্ব জমা করে তুলেচি!

বিনয় কহিল—আচ্ছা মানচি স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ ঠিক যে জায়গাটাতে থাকলে সহজ হতে পারত আমরা প্রবৃত্তির ঝোঁকে সেটা লঙ্ঘন করি এবং সেটাকে মিথ্যে করে তুলি কিন্তু এই অপরাধটা কি কেবল বিদেশেরই? এ সম্বন্ধে ইংরেজের কবিত্ব যদি মিথ্যে হয় ত আমরা ঐ যে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ নিয়ে সর্ব্বদা বাড়াবাড়ি করে থাকি সেটাও ত মিথ্যে! মানুষের প্রকৃতি যা নিয়ে সহজে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে তার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যে কেউ বা প্রেমের সৌন্দর্য্য-অংশকেই কবিত্বের দ্বারা উজ্জ্বল করে তুলে তার মন্দটাকে লজ্জা দেয়, আর কেউ বা ওর মন্দটাকেই বড় করে তুলে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের বিধান দিয়ে থাকে; ও দুটো কেবল দুই ভিন্ন প্রকৃতির লোকের ভিন্ন রকম প্রণালী। একটাকেই যদি নিন্দে কর তবে অন্যটাকেও রেয়াৎ করলে চল্‌বে না।

গোরা। নাঃ আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম। তোমার অবস্থা তেমন খারাপ হয়নি! এখনো যখন ফিলজফি তোমার মাথায় খেল্‌চে তখন নির্ভয়ে তুমি 'লাভ্‌' করতে পার কিন্তু সময় থাকতে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ো—হিতৈষী বন্ধুদের এই অনুরোধ।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল,—আঃ তুমি কি পাগল হয়েচ? আমার আবার 'লাভ্‌'! তবে এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, পরেশ বাবুদের আমি যেটুকু দেখেচি এবং ওঁদের সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে ওঁদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হয়েচে। বোধ করি তাই ওঁদের ঘরের ভিতরকার জীবন-যাত্রাটা কি রকম সেটা জানবার জন্যে আমার একটা আকর্ষণ হয়েছিল।

গোরা। উত্তম কথা, সেই আকর্ষণটাই সাম্‌লে চলতে হবে। ওঁদের সম্বন্ধে প্রাণিবৃত্তান্তের অধ্যায়টা না হয় অনাবিষ্কৃতই রইল। বিশেষত ওঁরা হলেন শিকারী প্রাণী, ওঁদের ভিতরকার ব্যাপার জানতে গিয়ে শেষকালে এতদূর পর্য্যন্ত ভিতরে যেতে পার যে তোমার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার জো থাকবে না।

বিনয়। দেখ, তোমার একটা দোষ আছে। তুমি মনে কর যত কিছু শক্তি ঈশ্বর কেবল একলা তোমাকেই দিয়েচেন, আর আমরা সবাই দুর্ব্বল প্রাণী।

কথাটা গোরাকে হঠাৎ যেন নূতন করিয়া ঠেকিল। সে উৎসাহবেগে বিনয়ের পিঠে এক চাপড় মারিয়া কহিল—ঠিক বলেচ—ঐটে আমার দোষ—আমার মস্ত দোষ!

বিনয়। উঃ, ওর চেয়েও তোমার আর একটা মস্ত দোষ আছে। অন্য লোকের শিরদাঁড়ার উপরে কতটা আঘাত সয় তার ওজনবোধ তোমার একেবারেই নেই।

এমন সময় গোরার বড় বৈমাত্র ভাই মহিম তাহার পরিপুষ্ট শরীর লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে আসিয়া কহিলেন—গোরা!

গোরা তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আজ্ঞে!

মহিম। দেখতে এলেম বর্ষার জলধরপটল আমাদের ছাতের উপরে গর্জ্জন করতে নেমেচে কি না। আজ ব্যাপারখানা কি? ইংরেজকে বুঝি এতক্ষণে ভারতসমুদ্রের অর্দ্ধেকটা পথ পার করে দিয়েছ? ইংরেজের বিশেষ কোনো লোকসান দেখচিনে, কিন্তু নীচের ঘরে মাথা ধরে বড় বৌ পড়ে আছে, সিংহনাদে তারই যা অসুবিধে হচ্চে।

এই বলিয়া মহিম নীচে চলিয়া গেলেন।

৩

গোরা ও বিনয় ছাত হইতে নামিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় গোরার মা উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনয় তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

গোরার মা আনন্দময়ীকে দেখিলে গোরার মা বলিয়া মনে হয় না।

তিনি ছিপ্‌ছিপে পাৎলা, আঁটসাঁট; চুল যদি বা কিছু কিছু পাকিয়া থাকে বাহির হইতে দেখা যায় না; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় তাঁহার বয়স চল্লিশেরও কম। মুখের বেড় অত্যন্ত সুকুমার, নাকের ঠোঁটের চিবুকের ললাটের রেখা কে যেন যত্নে কুঁদিয়া কাটিয়াছে; শরীরের সমস্তই বাহুল্যবর্জ্জিত,—মুখে একটি পরিষ্কার ও সতেজ বুদ্ধির ভাব সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইতেছে। রং শ্যামবর্ণ, গোরার রঙের সঙ্গে তাহার কোনোই তুলনা হয় না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই একটা জিনিষ সকলের চোখে পড়ে—তিনি শাড়ির সঙ্গে শেমিজ পরিয়া থাকেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনকার দিনে মেয়েদের জামা বা শেমিজ পরা যদিও নব্য দলে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তবু প্রবীণা গৃহিণীরা তাহাকে নিতান্তই খৃষ্টানী বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন। আনন্দময়ীর স্বামী কৃষ্ণদয়াল বাবু কমিসরিয়েটে কাজ করিতেন, আনন্দময়ী তাঁহার সঙ্গে ছেলেবেলা হইতে পশ্চিমে কাটাইয়াছেন, তাই ভাল করিয়া গা ঢাকিয়া গায়ে কাপড় দেওয়া যে লজ্জা বা পরিহাসের বিষয় এ সংস্কার তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ঘর দুয়ার মাজিয়া ঘসিয়া, ধুইয়া মুছিয়া, রাঁধিয়া বাড়িয়া, সেলাই করিয়া, গুণ্‌তি করিয়া, হিসাব করিয়া, ঝাড়িয়া, রৌদ্রে দিয়া, আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর খবর লইয়া তবু তাঁহার সময় যেন ফুরাইতে চাহে না।

গোরার মা উপরে আসিয়া কহিলেন,—গোরার গলা যখন নীচে থেকে শোনা যায় তখনি বুঝতে পারি বিনু নিশ্চয়ই এসেচে। ক'দিন বাড়ি একেবারে চুপচাপ ছিল—কি হয়েছে বল্ ত বাছা? আসিস্‌নি কেন? অসুখ বিসুখ করেনি ত?

বিনয় কুণ্ঠিত হইয়া কহিল—না, মা, অসুখ না,—যে বৃষ্টিবাদল!

গোরা কহিল—তাই বই কি! এর পরে বৃষ্টিবাদল যখন ধরে যাবে তখন বিনয় বল্‌বেন যে রোদ পড়েচে! দেবতার উপর দোষ দিলে

দেবতা ত কোনো জবাব করেন না—আসল মনের কথা জানেন।

বিনয় কহিল—গোরা তুমি কি বাজে বক্‌চ!

আনন্দময়ী কহিলেন—তা সত্যি বাছা, অমন করে বল্‌তে নেই। মানুষের মন কখনো ভাল থাকে কখনো মন্দ থাকে, সব সময় কি সমান যায়! তা নিয়ে কথা পাড়তে গেলে উৎপাত করা হয়। তা আয় বিনু, আমার ঘরে আয়, তোর জন্যে খাবার ঠিক করেছি।

গোরা জোর করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল—না, মা, সে হচ্চে না, তোমার ঘরে আমি বিনয়কে খেতে দেব না।

আনন্দময়ী। ইস্ তাই ত! কেন, বাপু, তোকে ত আমি কোনো দিন খেতে বলিনে—এদিকে তোর বাপ ত ভয়ঙ্কর শুদ্ধাচারী হয়ে উঠেচেন—স্বপাক না হলে খান না। বিনু আমার লক্ষ্মী ছেলে, তোর মত ওর গোঁড়ামি নেই, তুই কেবল ওকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চাস্।

গোরা। সে কথা ঠিক, আমি জোর করেই ওকে ঠেকিয়ে রাখ্‌ব। তোমার ওই খৃষ্টান দাসী লছ্‌মিয়াটাকে না বিদায় করে দিলে তোমার ঘরে খাওয়া চল্‌বে না।

আনন্দময়ী। ওরে গোরা, অমন কথা তুই মুখে আনিস্‌নে। চিরদিন ওর হাতে তুই খেয়েছিস্—ও তোকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেচে। এই সেদিন পর্য্যন্ত ওর হাতের তৈরি চাট্‌নি না হলে তোর যে খাওয়া রুচ্‌ত না! ছোটবেলায় তোর যখন বসন্ত হয়েছিল লছমিয়া যে করে তোকে সেবা করে বাঁচিয়েচে সে আমি কোনো দিন ভুল্‌তে পারব না।

গোরা। ওকে পেন্‌সন্ দাও, জমি কিনে দাও, ঘর করে দাও, যা খুসি কর, কিন্তু ওকে রাখা চল্‌বে না মা!

আনন্দময়ী। গোরা, তুই মনে করিস্ টাকা দিলেই সব ঋণ শোধ হয়ে

যায়! ও জমিও চায় না, বাড়িও চায় না, তোকে না দেখতে পেলে ও মরে যাবে।

গোরা। তবে তোমার খুসি ওকে রাখ। কিন্তু বিনু তোমার ঘরে খেতে পাবে না। যা নিয়ম তা মান্‌তেই হবে, কিছুতেই তার অন্যথা হতে পারে না। মা, তুমি এত বড় অধ্যাপকের বংশের মেয়ে, তুমি যে আচার পালন করে চল না এ কিন্তু—

আনন্দময়ী। ওগো, তোমার মা আগে আচার পালন করেই চল্‌ত; তাই নিয়ে অনেক চোখের জল ফেল্‌তে হয়েচে—তখন তুমি ছিলে কোথায়? রোজ শিব গড়ে পূজো করতে বস্‌তুম আর তোমার বাবা এসে টান মেরে ফেলে ফেলে দিতেন। তখন অপরিচিত বামুনের হাতেও ভাত খেতে আমার ঘেন্না করত। সে কালে রেলগাড়ি বেশি দূর ছিল না—গরুর গাড়িতে, ডাক গাড়িতে, পাল্কীতে, উটের উপর চড়ে কতদিন ধরে কত উপোস করে কাটিয়েচি। তোমার বাবা কি সহজে আমার আচার ভাংতে পেরেছিলেন? তিনি স্ত্রীকে নিয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন বলে তাঁর সায়েব মনিবরা তাঁকে বাহবা দিত, তাঁর মাইনেই বেড়ে গেল—ঐ জন্যেই তাঁকে এক জায়গায় অনেক দিন রেখে দিত—প্রায় নড়াতে চাইত না। এখন ত বুড়ো বয়সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাশ রাশ টাকা নিয়ে তিনি হঠাৎ উল্টে খুব শুচি হয়ে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু আমি তা পারব না! আমার সাতপুরুষের সংস্কার এক একটা করে নির্ম্মূল করা হয়েছে—সে কি এখন আর বল্লেই ফেরে?

গোরা। আচ্ছা, তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কথা ছেড়ে দাও—তাঁরা ত কোনো আপত্তি করতে আস্‌চেন না। কিন্তু আমাদের খাতিরে তোমাকে কতকগুলো জিনিষ মেনে চল্‌তেই হবে। না হয় শাস্ত্রের মান নাই রাখ্‌লে, স্নেহের মান রাখ্‌তে হবে ত!

আনন্দময়ী। ওরে অত করে আমাকে কি বোঝাচ্চিস্! আমার মনে

কি হয় সে আমিই জানি! আমার স্বামী, আমার ছেলে—আমাকে নিয়ে তাদের যদি পদে পদে কেবল বাধ্‌তে লাগল তবে আমার আর সুখ কি নিয়ে! কিন্তু তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েচি তা জানিস্? ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা যে দিন বুঝেচি সে দিন থেকে এ কথা নিশ্চয় জেনেচি যে আমি যদি খৃষ্টান বলে ছোট জাত বলে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো করে থাক্ আমি পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল খাব!

আজ আনন্দময়ীর কথা শুনিয়া বিনয়ের মনে হঠাৎ কি একটা অস্পষ্ট সংশয়ের আভাস দেখা দিল। সে একবার আনন্দময়ীর ও একবার গোরার মুখের দিকে তাকাইল কিন্তু তখনি মন হইতে সকল তর্কের উপক্রম দূর করিয়া দিল।

গোরা কহিল—মা, তোমার যুক্তিটা ভাল বোঝা গেল না। যারা বিচার করে শাস্ত্র মেনে চলে তাদের ঘরেও ত ছেলে বেঁচে থাকে আর ঈশ্বর তোমার সম্বন্ধেই বিশেষ আইন খাটাবেন এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে?

আনন্দময়ী। যিনি তোকে দিয়েচেন বুদ্ধিও তিনি দিয়েচেন। তা আমি কি করব বল্! আমার এতে কোনো হাত নেই। কিন্তু ওরে পাগল, তোর পাগলামি দেখে আমি হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব তা ভেবে পাইনে। যাক্ সে সব কথা যাক্। তবে বিনয় আমার ঘরে খাবে না?

গোরা। ও ত এখনি সুযোগ পেলেই ছোটে, লোভটি ওর ষোলো আনা। কিন্তু মা, আমি যেতে দেব না। ও যে বামুনের ছেলে, দুটো মিষ্টি দিয়ে সে কথা ওকে ভোলালে চল্‌বে না। ওকে অনেক ত্যাগ করতে হবে, প্রবৃত্তি সাম্‌লাতে হবে, তবে ওর জন্মের গৌরব রাখতে পারবে। মা, তুমি কিন্তু রাগ কোরো না! আমি তোমার পায়ের ধুলো নিচ্ছি!

আনন্দময়ী। আমি রাগ করব! তুই বলিস্ কি! তুই যা করচিস্ এ তুই জ্ঞানে করচিস্ নে, তা আমি তোকে বলে দিলুম। আমার মনে এই কষ্ট রইল যে তোকে মানুষ করলুম বটে কিন্তু—যাই হোক্‌গে, তুই যাকে ধর্ম্ম বলে বেড়াস্ সে আমার মানা চল্‌বে না—না হয়, তুই আমার ঘরে আমার হাতে নাই খেলি—কিন্তু তোকে ত দুসন্ধ্যে দেখতে পাব, সেই আমার ঢের। বিনয়, তুমি মুখটি অমন মলিন কোরো না বাপ,—তোমার মনটি নরম, তুমি ভাবচ আমি দুঃখ পেলুম—কিছু না বাপ! আর একদিন নিমন্ত্রণ করে খুব ভাল বামুনের হাতেই তোমাকে খাইয়ে দেব—তার ভাবনা কি! আমি কিন্তু, বাছা, লছমিয়ার হাতের জল খাব, সে আমি সবাইকে বলে রাখচি।

গোরার মা নীচে চলিয়া গেলেন। বিনয় চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল—গোরা, এটা যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্চে!

গোরা। কার বাড়াবাড়ি?

বিনয়। তোমার।

গোরা। এক চুল বাড়াবাড়ি নয়। যেখানে যার সীমা আমি সেইটে ঠিক রক্ষে করে চলতে চাই। কোনো ছুতোয় সূচ্যগ্রভূমি ছাড়তে আরম্ভ করলে শেষকালে কিছুই বাকি থাকে না।

বিনয়। কিন্তু মা যে!

গোরা। মা কাকে বলে সে আমি জানি। আমাকে কি সে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে! আমার মার মত মা ক'জনের আছে! কিন্তু আচার যদি না মান্‌তে সুরু করি তবে একদিন হয় ত মাকেও মানব না। দেখ বিনয়, তোমাকে একটা কথা বলি, মনে রেখো—হৃদয় জিনিষটা অতি উত্তম কিন্তু সকলের চেয়ে উত্তম নয়।

বিনয় কিছুক্ষণ পরে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—দেখ, গোরা, আজ

মার কথা শুনে আমার মনের ভিতরে কি রকম একটা নাড়াচাড়া হচ্চে। আমার বোধ হচ্চে যেন মার মনে কি একটা কথা আছে সেইটে তিনি আমাদের বোঝাতে পারচেন না তাই কষ্ট পাচ্চেন।

গোরা অধীর হইয়া কহিল—আঃ বিনয়, অত কল্পনা নিয়ে খেলিয়ো না—ওতে কেবলি সময় নষ্ট হয় আর কোন ফল হয় না।

বিনয়। তুমি পৃথিবীর কোনো জিনিষের দিকে কখনও ভাল করে তাকাও না, তাই যেটা তোমার নজরে পড়ে না, সেটাকেই তুমি কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাও। কিন্তু আমি তোমাকে বলচি আমি কতবার দেখেচি মা যেন কিসের জন্যে একটা ভাবনা পুষে রেখেছেন—কি যেন একটা ঠিক মত মিলিয়ে দিতে পারচেন না—সেই জন্যে ওঁর ঘরকরনার ভিতরে একটা দুঃখ আছে। গোরা, তুমি ওঁর কথাগুলো একটু কান পেতে শুনো।

গোরা। কান পেতে যতটা শোনা যায় তা আমি শুনে থাকি—তার চেয়ে বেশী শোন্‌বার চেষ্টা করলে ভুল শোনবার সম্ভাবনা আছে বলে সে চেষ্টাই করিনে!

৪

মত হিসাবে একটা কথা যেমনতর শুনিতে হয় মানুষের উপর প্রয়োগ করিবার বেলায় সকল সময় তাহার সেই একান্ত নিশ্চিত ভাবটা থাকে না —অন্তত বিনয়ের কাছে থাকে না—বিনয়ের হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তাই তর্কের সময় সে একটা মতকে খুব উচ্চস্বরে মানিয়া থাকে কিন্তু ব্যবহারের বেলা মানুষকে তাহার চেয়ে বেশী না মানিয়া থাকিতে পারে না। এমন কি, গোরার প্রচারিত মতগুলি বিনয় যে গ্রহণ করিয়াছে তাহা কতটা মতের খাতিরে আর কতটা গোরার প্রতি তাহার একান্ত ভালবাসার টানে তাহা বলা শক্ত।

গোরাদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বাসায় ফিরিবার সময় বর্ষার সন্ধ্যায় যখন সে কাদা বাঁচাইয়া ধীরে ধীরে রাস্তায় চলিতেছিল তখন মত এবং মানুষে তাহার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়াছিল।

এখনকার কালের নানাপ্রকার প্রকাশ্য এবং গোপন আঘাত হইতে সমাজ যদি আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে চায় তবে খাওয়া ছোঁওয়া প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাহাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক হইতে হইবে এই মতটি বিনয় গোরার মুখ হইতে অতি সহজেই গ্রহণ করিয়াছে; এ লইয়া বিরুদ্ধ লোক-দের সঙ্গে সে তীক্ষ্ণভাবে তর্ক করিয়াছে; বলিয়াছে শত্রু যখন কেল্লাকে চারিদিকে আক্রমণ করিয়াছে তখন এই কেল্লার প্রত্যেক পথ গলি দরজা জানলা প্রত্যেক ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া প্রাণ দিয়া যদি রক্ষা করিতে থাকি, তবে তাহাকে উদারতার অভাব বলে না।

কিন্তু আজ ঐ যে আনন্দময়ীর ঘরে গোরা তাহার খাওয়া নিষেধ করিয়া দিল ইহার আঘাত ভিতরে ভিতরে তাহাকে কেবলি বেদনা দিতে লাগিল।

বিনয়ের বাপ ছিল না, মাকেও সে অল্প বয়সে হারাইয়াছে; খুড়া থাকেন দেশে, এবং ছেলেবেলা হইতেই পড়াশুনা লইয়া বিনয় কলিকাতার বাসায় একলা মানুষ হইয়াছে। গোরার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে বিনয় যে দিন হইতে আনন্দময়ীকে জানিয়াছে সেই দিন হইতে তাঁহাকেই মা বলিয়াই জানিয়াছে। কতদিন তাঁহার ঘরে গিয়া সে কাড়াকাড়ি করিয়া উৎপাত করিয়া খাইয়াছে; আহার্য্যের অংশ বিভাগ লইয়া আনন্দময়ী গোরার প্রতি পক্ষপাত করিয়া থাকেন এই অপবাদ দিয়া কতদিন সে তাহার প্রতি কৃত্রিম ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছে! দুই চারিদিন বিনয় কাছে না আসিলেই আনন্দময়ী যে কতটা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেন বিনয়কে কাছে বসাইয়া খাওয়াইবেন এই প্রত্যাশায় কতদিন তিনি তাহাদের সভাভঙ্গের জন্য উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন তাহা

বিনয় সমস্তই জানিত। সেই বিনয় আজ সামাজিক ঘৃণায় আনন্দময়ীর ঘরে গিয়া খাইবে না ইহা কি আনন্দময়ী সহিতে পারেন, না বিনয় সহিবে!

ইহার পর হইতে ভাল বামুনের হাতে মা আমাকে খাওয়াইবেন, নিজের হাতে আর কখনো খাওয়াইবেন না—এ কথা মা হাসিমুখ করিয়া বলিলেন; কিন্তু এ যে মর্ম্মান্তিক কথা! এই কথাটাই বিনয় বারবার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে বাসায় পৌঁছিল।

শূন্যঘর অন্ধকার হইয়া আছে; চারিদিকে কাগজ পত্র বই এলোমেলো ছাড়ানো; দেয়াশেলাই ধরাইয়া বিনয় তেলের সেজ জ্বালাইল,—সেজের উপর বেহারার করকোষ্ঠী নানা চিহ্নে অঙ্কিত; লিখিবার টেবিলের উপর যে একটা শাদা কাপড়ের আবরণ আছে তাহার নানান্ জায়গায় কালী এবং তেলের দাগ; এই ঘরে তাহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিল। মানুষের সঙ্গ এবং স্নেহের অভাব আজ তাহার বুক যেন চাপিয়া ধরিল। দেশকে উদ্ধার, সমাজকে রক্ষা এই সমস্ত কর্ত্তব্যকে সে কোনোমতেই স্পষ্ট এবং সত্য করিয়া তুলিতে পারিল না—ইহার চেয়ে ঢের সত্য সেই 'অচিন পাখী' যে একদিন শ্রাবণের উজ্জ্বল সুন্দর প্রভাতে খাঁচার কাছে আসিয়া আবার খাঁচার কাছ হইতে চলিয়া গেছে। কিন্তু সেই অচিন পাখীর কথা বিনয় কোনোমতেই মনে আমল দিবে না, কোনোমতেই না। সেই জন্য মনকে আশ্রয় দিবার জন্য যে আনন্দময়ীর ঘর হইতে গোরা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে সেই ঘরটির ছবি মনে আঁকিতে লাগিল।

পঙ্খের কাজকরা উজ্জ্বল মেঝে পরিষ্কার তক্ তক্ করিতেছে; একধারে তক্তপোষের উপর শাদা রাজহাঁসের পাখার মত কোমল নির্ম্মল বিছানা পাতা রহিয়াছে; বিছানার পাশেই একটা ছোট টুলের উপর রেড়ির তেলের বাতি এতক্ষণে জ্বালানো হইয়াছে; মা নিশ্চয়ই নানা

রঙের সূতা লইয়া সেই বাতির কাছে ঝুঁকিয়া কাঁথার উপর শিল্পকাজ করিতেছেন, লছমিয়া নীচে মেজের উপর বসিয়া তাহার বাঁকা উচ্চারণের বাংলায় অনর্গল বকিয়া যাইতেছে, মা তাহার অধিকাংশই কানে আনিতেছেন না! মা যখন মনে কোনো কষ্ট পান তখন শিল্পকাজ লইয়া পড়েন—তাঁহার সেই কর্ম্মনিবিষ্ট স্তব্ধ মুখের ছবির প্রতি বিনয় তাহার মনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল; সে মনে মনে কহিল, এই মুখের স্নেহদীপ্তি আমাকে আমার সমস্ত মনের বিক্ষেপ হইতে রক্ষা করুক। এই মুখই আমার মাতৃভূমির প্রতিমাস্বরূপ হউক, আমাকে কর্ত্তব্যে প্রেরণ করুক এবং কর্ত্তব্যে দৃঢ় রাখুক। তাঁহাকে মনে মনে একবার মা বলিয়া ডাকিল এবং কহিল তোমার অন্ন যে আমার অমৃত নয় এ কথা কোনো শাস্ত্রের প্রমাণেই স্বীকার করিব না।

নিস্তব্ধ ঘরে বড় ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করিয়া চলিতে লাগিল;—ঘরের মধ্যে বিনয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। আলোর কাছে দেওয়ালের গায়ে একটা টিক্‌টিকি পোকা ধরিতেছে—তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বিনয় উঠিয়া পড়িল এবং একটা ছাতা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

কি করিবে সেটা মনের মধ্যে স্পষ্ট ছিল না। বোধ হয় আনন্দময়ীর কাছে ফিরিয়া যাইবে এই তাহার মনের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কখন্ এক সময় তাহার মনে উঠিল আজ রবিবার, আজ ব্রাহ্ম সভায় কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিতে যাই।—এ কথা যেমন মনে ওঠা অমনি সমস্ত দ্বিধা দূর করিয়া বিনয় জোরে চলিতে আরম্ভ করিল। বক্তৃতা শুনিবার সময় যে বড় বেশী নাই তাহা সে জানিত তবু তাহার সঙ্কল্প বিচলিত হইল না।

যথাস্থানে পৌঁছিয়া দেখিল উপাসকেরা বাহির হইয়া আসিতেছে। ছাতা মাথায় রাস্তার ধারে এক কোণে সে দাঁড়াইল—মন্দির হইতে

সেই মুহূর্ত্তেই পরেশ বাবু শান্ত প্রসন্ন মুখে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পরিজন চার পাঁচটি ছিল—বিনয় তাহাদের মধ্যে কেবল একজনের তরুণ মুখ রাস্তার গ্যাসের আলোকে ক্ষণকালের জন্য দেখিল—তাহার পরে গাড়ির চাকার শব্দ হইল এবং এই দৃশ্যটুকু অন্ধকারের মহাসমুদ্রের মধ্যে একটি বুদ্বুদের মত মিলাইয়া গেল।

বিনয় বাসায় না গিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে যখন গোরার বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল তখন বর্ষার দীর্ঘদিন শেষ হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিয়াছে। গোরা সেই সময় আলোটি জ্বালাইয়া লিখিতে বসিয়াছে।

গোরা কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল—কি গো, বিনয়, হাওয়া কোন্‌দিক থেকে বইচে?

বিনয় সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল—গোরা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ভারতবর্ষ তোমার কাছে খুব সত্য? খুব স্পষ্ট তুমি ত দিন রাত্রি তাকে মনে রাখ, কিন্তু কি রকম করে মনে রাখ?

গোরা লেখা ছাড়িয়া কিছুক্ষণ তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি লইয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল—তাহার পরে কলমটা রাখিয়া চৌকির পিঠের দিকে ঠেস্ দিয়া কহিল—জাহাজের কাপ্তেন যখন সমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন যেমন আহারে বিহারে কাজে বিশ্রামে সমুদ্র পারের বন্দরটিকে সে মনের মধ্যে রেখে দেয় আমার ভারতবর্ষকে আমি তেমনি করে মনে রেখেচি।

বিনয়। কোথায় তোমার সেই ভারতবর্ষ?

গোরা বুকে হাত দিয়া কহিল—আমার এইখানকার কম্পাস্‌টা দিন-রাত যেখানে কাঁটা ফিরিয়ে আছে সেইখানে, তোমার মার্শম্যান সাহেবের হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ার মধ্যে নয়।

বিনয়। তোমার কাঁটা যেদিকে সেদিকে কিছু একটা আছে কি?

গোরা উত্তেজিত হইয়া কহিল—আছে না ত কি? আমি পথ ভুল্‌তে পারি, ডুবে মরতে পারি, কিন্তু আমার সেই লক্ষ্মীর বন্দরটি আছে। সেই আমার পূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষ—ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ, ধর্ম্মে পূর্ণ—সে ভারতবর্ষ কোথাও নেই! আছে কেবল চারিদিকের এই মিথ্যেটা! এই তোমার কলকতা সহর, এই আপিস, এই আদালত, এই গোটাকতক ইটকাঠের বুদ্বুদ!—ছোঃ!

বলিয়া গোরা বিনয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল—বিনয় কোনো উত্তর না করিয়া ভাবিতে লাগিল। গোরা কহিল,—এই যেখানে আমরা পড়চি শুনচি, চাকরির উমেদারি করে বেড়াচ্চি, দশটা পাঁচটায় ভূতের খাটুনি খেটে কি যে করচি তার কিছুই ঠিকানা নেই, এই যাদুকরের মিথ্যে ভারতবর্ষটাকেই আমরা সত্য বলে ঠাউরেছি বলেই পঁচিশ কোটী লোক মিথ্যে মানকে মান বলে মিথ্যে কর্ম্মকে কর্ম্ম বলে দিনরাত বিভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্চি—এই মরীচিকার ভিতর থেকে কি আমরা কোনো রকম চেষ্টায় প্রাণ পাব! আমরা তাই প্রতিদিন শুকিয়ে মরচি। একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে—পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেইখানে স্থিতি না হলে আমরা কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণ-রসটা টেনে নিতে পারব না। তাই বলচি আর সমস্ত ভুলে—কেতাবের বিদ্যে, খেতাবের মায়া, উঞ্ছবৃত্তির প্রলোভন সব টান মেরে ফেলে দিয়ে সেই বন্দরের দিকেই জাহাজ ভাসাতে হবে—ডুবিত ডুব্‌বো, মরিত মরব। সাধে আমি ভারতবর্ষের সত্য মূর্ত্তি, পূর্ণ মূর্ত্তি কোনো দিন ভুল্‌তে পারিনে!

বিনয়। এসব কেবল উত্তেজনার কথা নয়? এ তুমি সত্য বলচ?

গোরা মেঘের মত গর্জ্জিয়া কহিল—সত্যই বলচি!

বিনয়। যারা তোমার মত দেখতে পাচ্চে না?

গোরা মুঠা বাঁধিয়া কহিল—তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। এই ত আমাদের কাজ। সত্যের ছবি স্পষ্ট না দেখতে পেলে লোকে আত্মসমর্পণ

করবে কোন্ উপছায়ার কাছে? ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ মূর্ত্তিটা সবার কাছে তুলে ধর—লোকে তাহলে পাগল হয়ে যাবে। তখন কি দ্বারে দ্বারে চাঁদা সেধে বেড়াতে হবে? প্রাণ দেবার জন্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে।

বিনয়। হয় আমাকে সংসারের দশজনের মত ভেসে চলে যেতে দাও নইলে আমাকে সেই মূর্ত্তি দেখাও!

গোরা। সাধনা কর। যদি বিশ্বাস মনে থাকে তাহলে কঠোর সাধনাতেই সুখ পাবে। আমাদের সৌখীন প্যাট্রিয়ট্‌দের সত্যকার বিশ্বাস কিছুই নেই তাই তাঁরা নিজের এবং পরের কাছে কিছুই জোর করে দাবি করতে পারেন না। স্বয়ং কুবের যদি তাঁদের সেধে বর দিতে আসেন তাহলে তাঁরা বোধ হয় লাট সাহেবের চাপরাশির গিল্টিকরা তকমাটার চেয়ে বেশী আর কিছু সাহস করে চাইতেই পারেন না! তাঁদের বিশ্বাস নেই তাই ভরসা নেই।

বিনয়। গোরা, সকলের প্রকৃতি সমান নয়। তুমি নিজের বিশ্বাস নিজের ভিতরেই পেয়েছ, এবং নিজের আশ্রয় নিজের জোরেই খাড়া করে রাখতে পার তাই অন্যের অবস্থা ঠিক বুঝতে পার না। আমি বলচি তুমি আমাকে যা হয় একটা কাজে লাগিয়ে দাও,—দিনরাত আমাকে খাটিয়ে নাও—নইলে তোমার কাছে যতক্ষণ থাকি মনে হয় যেন একটা কি পেলুম—তার পরে দূরে গেলে এমন কিছু হাতের কাছে পাইনে যেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি।

গোরা। কাজের কথা বলচ? এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা-কিছু স্বদেশের, তারই প্রতি সঙ্কোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া। দেশের সম্বন্ধে লজ্জা করে করে আমরা নিজের মনকে দাসত্বের বিষে দুর্ব্বল করে ফেলেচি; আমাদের প্রত্যেকে নিজের দৃষ্টান্তে তার প্রতিকার করলে তার পর আমরা কাজ করবার ঠিক ক্ষেত্রটি পাব। এখন যে-কোনো

কাজ করতে চাই সে কেবল ইতিহাসের ইস্কুলবইটি ধরে পরের কাজের নকল হয়ে ওঠে। সেই ঝুঁটো কাজে কি আমরা কখনো সত্যভাবে আমাদের সমস্ত প্রাণ মন দিতে পারব? তাতে কেবল নিজেদের হীন করেই তুলব।

এমন সময় হাতে একটা হুঁকা লইয়া মৃদুমন্দ অলস ভাবে মহিম আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আপিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ সারিয়া, একটা পান মুখে দিয়া এবং গোটাছয়েক পান বাটায় লইয়া রাস্তার ধারে বসিয়া মহিমের এই তামাক টানিবার সময়। আর কিছুক্ষণ পরেই একটি একটি করিয়া পাড়ার বন্ধুরা আসিয়া জুটিবে, তখন সদর দরজার পাশের ঘরটাতে প্রমারা খেলিবার সভা বসিবে।

মহিম ঘরে ঢুকিতেই গোরা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মহিম হুঁকায় টান দিতে দিতে কহিল, ভারত উদ্ধারে ব্যস্ত আছ আপাতত ভাইকে উদ্ধার কর ত!

গোরা মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মহিম কহিলেন—আমাদের আপিসের নতুন যে বড় সাহেব হয়েচে—ডালকুত্তার চেহারা—সে বেটা ভারি পাজি। সে বাবুদের বলে বেবুন—কারো মা মরে গেলে ছুটি দিতে চায় না, বলে মিথ্যে কথা—কোনো মাসেই কোনো বাঙালী আম্‌লার গোটা মাইনে পাবার জো নেই, জরিমানায় জরিমানায় একেবারে শতছিদ্র করে ফেলে; কাগজে তার নামে একটা চিঠি বেরিয়েছিল—সে বেটা ঠাউরেচে আমারই কর্ম্ম। নেহাৎ মিথ্যে ঠাওরায় নি। কাজেই এখন আবার স্বনামে তার একটা কড়া প্রতিবাদ না লিখ্‌লে টিক্‌তে দেবে না। তোমরা ত য়ুনিভারসিটির জলধি মন্থন করে দুই রত্ন উঠেছ—এই চিঠিখানা একটু ভাল করে লিখে দিতে হবে। ওর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে even-handed justice, never-failing generosity, kind courteousness ইত্যাদি ইত্যাদি।

গোরা চুপ করিয়া রহিল। বিনয় হাসিয়া কহিল, দাদা, অতগুলো মিথ্যা কথা একনিশ্বাসে চালাবেন?

মহিম। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। অনেক দিন ওদের সংসর্গ করেছি, আমার কাছে কিছুই অবিদিত নেই। ওরা যা মিথ্যা কথা জমাতে পারে সে তারিফ করতে হয়। দরকার হলে ওদের কিছু বাধে না; একজন যদি মিছে বলে ত শেয়ালের মত আর সব কটাই সেই সুরে হুক্কাহুয়া করে ওঠে, আমাদের মত একজন আর একজনকে ধরিয়ে দিয়ে বাহবা নিতে চায় না। এটা নিশ্চয় জেনো ওদের ঠকালে পাপ নেই যদি না পড়ি ধরা!

বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া মহিম টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন— বিনয়ও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

মহিম কহিলেন,—তোমরা ওদের মুখের উপর সত্যি কথা বলে ওদের অপ্রতিভ করতে চাও! এম্‌নি বুদ্ধি যদি ভগবান তোমাদের না দেবেন তবে দেশের এমন দশা হবে কেন? এটা ত বুঝ্‌তে হবে, যার গায়ের জোর আছে বাহাদুরি করে তার চুরি ধরিয়ে দিতে গেলে সে লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে না। সে উল্টে তার সিঁধকাটিটা তুলে পরম সাধুর মতই হুঙ্কার দিয়ে মারতে আসে। সত্যি কিনা বল।

বিনয়। সত্যি বই কি।

মহিম। তার চেয়ে মিছে কথার ঘানি থেকে বিনি পয়সায় যে তেলটুকু বেরয় তারি এক আধ ছটাক তার পায়ে মালিশ করে যদি বলি, সাধুজি, বাবা পরমহংস, দয়া করে ঝুলিটা একটু ঝাড়, ওর ধূলো পেলেও বেঁচে যাব; তা হলে তোমারি ঘরের মালের অন্তত একটা অংশ হয় ত তোমারি ঘরে ফিরে আস্‌তে পারে অথচ শান্তিভঙ্গেরও আশঙ্কা থাকে না। যদি বুঝে দেখ ত একেই বলে পেট্রিয়টিজ্‌ম। কিন্তু আমার ভায়া চট্‌চে। ও হিঁদু হয়ে অবধি আমাকে দাদা বলে খুব মানে, ওর সাম্‌নে আজ

আমার কথাগুলো ঠিক্‌ বড় ভায়ের মত হল না। কিন্তু কি করব, ভাই, মিছে কথা সম্বন্ধেও ত সত্যি কথাটা বলতে হবে। বিনয়, সেই লেখাটা কিন্তু চাই। রোস, আমার নোট লেখা আছে, সেটা নিয়ে আসি।

বলিয়া মহিম তামাক টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেলেন। গোরা বিনয়কে কহিল—বিনু, তুমি দাদার ঘরে গিয়ে ওঁকে ঠেকাও গে। আমি লেখাটা শেষ করে ফেলি।

৫

ওগো শুন্‌চ? আমি তোমার পূজোর ঘরে ঢুকচিনে, ভয় নেই। আহ্নিক শেষ হলে একবার ওঘরে যেয়ো—তোমার সঙ্গে কথা আছে। দুজন নূতন সন্ন্যাসী যখন এসেচে তখন কিছুকাল তোমার আর দেখা পাব না জানি সেই জন্যে বল্‌তে এলুম। ভুলো না একবার যেয়ো।

এই বলিয়া অনন্দময়ী ঘরকর্‌নার কাজে ফিরিয়া গেলেন।

কৃষ্ণদয়াল বাবু শ্যামবর্ণ দোহারা গোছের মানুষ, মাথায় বেশী লম্বা নহেন। মুখের মধ্যে বড় বড় দুইটা চোখ সব চেয়ে চোখে পড়ে, বাকি প্রায় সমস্তই কাঁচাপাকা গোঁফে দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। ইনি সর্ব্বদাই গেরুয়া রঙের পট্টবস্ত্র পরিয়া আছেন, হাতের কাছে পিত্তলের কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম। মাথার সাম্‌নের দিকে টাক পড়িয়া আসিতেছে—বাকি বড় বড় চুল গ্রন্থি দিয়া মাথার উপরে একটা চূড়া করিয়া বাঁধা।

একদিন পশ্চিমে থাকিতে ইনি পল্টনের গোরাদের সঙ্গে মিশিয়া মদ মাংস খাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছেন। তখন দেশের পূজারি পুরোহিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রেণীর লোকদিগকে গায়ে পড়িয়া অপমান করাকে পৌরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন; এখন না মানেন এমন জিনিষ নাই। নূতন সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহার কাছে নূতন সাধনার পন্থা শিখিতে বসিয়া যান। মুক্তির নিগূঢ় পথ এবং যোগের নিগূঢ় প্রণালীর

জন্য ইঁহার লুব্ধতার অবধি নাই। তান্ত্রিক সাধনা অভ্যাস করিবেন বলিয়া কৃষ্ণদয়াল কিছুদিন উপদেশ লইতেছিলেন এমন সময় একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের সন্ধান পাইয়া সম্প্রতি তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ইঁহার প্রথম স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিয়া যখন মারা যান তখন ইঁহার বয়স তেইশ বছর। মাতার মৃত্যুর কারণ বলিয়া রাগ করিয়া ছেলেটিকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া কৃষ্ণদয়াল প্রবল বৈরাগ্যের ঝোঁকে একেবারে পশ্চিমে চলিয়া যান এবং ছয় মাসের মধ্যেই কাশীবাসী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পিতৃহীনা পৌত্রী আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন।

পশ্চিমেই কৃষ্ণদয়াল চাকরীর জোগাড় করিলেন এবং মনিবদের কাছে নানা উপায়ে প্রতিপত্তি করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে সার্ব্বভৌমের মৃত্যু হইল; অন্য কোনো অভিভাবক না থাকাতে স্ত্রীকে নিজের কাছে আনিয়াই রাখিতে হইল।

ইতিমধ্যে যখন সিপাহিদের ম্যুটিনি বাধিল সেই সময়ে কৌশলে দুই একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের প্রাণরক্ষা করিয়া ইনি যশ এবং জায়গির লাভ করেন। ম্যুটিনির কিছুকাল পরেই কাজ ছাড়িয়া দিলেন এবং নবজাত গোরাকে লইয়া কিছুদিন কাশীতে কাটাইলেন। গোরার বয়স যখন বছর পাঁচেক হইল তখন কৃষ্ণদয়াল কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বড় ছেলে মহিমকে তাহার মামার বাড়ী হইতে নিজের কাছে আনাইয়া মানুষ করিলেন। এখন মহিম পিতার মুরুব্বিদের অনুগ্রহে সরকারী খাতাঞ্চিখানায় খুব তেজের সঙ্গে কাজ চালাইতেছে।

গোরা শিশুকাল হইতেই তাহার পাড়ার এবং ইস্কুলের ছেলের সর্দ্দারি করিত। মাষ্টার পণ্ডিতের জীবন অসহ্য করিয়া তোলাই তাহার প্রধান কাজ এবং আমোদ ছিল। একটু বয়স হইতেই সে ছাত্রদের ক্লাবে "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" এবং "বিংশতি কোটি মানবের বাস" আওড়াইয়া, ইংরেজিভাষায় বক্তৃতা করিয়া ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদের দলপতি

হইয়া উঠিল। অবশেষে যখন এক সময় ছাত্রসভার ডিম্ব ভেদ করিয়া গোরা বয়স্কসভায় কাকলী বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল তখন কৃষ্ণদয়াল বাবুর কাছে সেটা অত্যন্ত কৌতুকের বিষয় বলিয়া মনে হইল।

বাহিরের লোকের কাছে গোরার প্রতিপত্তি দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল; কিন্তু ঘরে কাহারো কাছে সে বড় আমল পাইল না। মহিম তখন চাকরী করে—সে গোরাকে কখন বা "পেট্রিয়ট্ জ্যাঠা" কখন বা "হরিশ মুখুয্যে দি সেকেণ্ড" বলিয়া নানা প্রকারে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তখন দাদার সঙ্গে গোরার প্রায় মাঝে মাঝে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইত। আনন্দময়ী গোরার ইংরেজ-বিদ্বেষে মনে মনে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতেন—তাহাকে নানা প্রকারে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কোনো ফলই হইত না। গোরা রাস্তায় ঘাটে কোনো সুযোগে ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিত।

এ দিকে কেশব বাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গোবা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল; আবার এই সময়টাতেই কৃষ্ণদয়াল ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এমন কি, গোরা তাঁহার ঘরে গেলেও তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। গুটি দুই তিন ঘর লইয়া তিনি নিজের মহল স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন। ঘটা করিয়া সেই মহলের দ্বারের কাছে "সাধনাশ্রম" নাম লিখিয়া কাষ্ঠফলকে লট্‌কাইয়া দিলেন।

বাপের এই কাণ্ডকারখানায় গোরার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে বলিল—আমি এ সমস্ত মূঢ়তা সহ্য করিতে পারি না—এ আমার চক্ষুশূল। এই উপলক্ষে গোরা তাহার বাপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া একেবারে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল—আনন্দময়ী তাহাকে কোনো রকমে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

বাপের কাছে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইতে লাগিল

গোরা জো পাইলেই তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক বাধাইয়া দিত। সে ত তর্ক নয় প্রায় ঘুষী বলিলেই হয়। তাঁহাদের অনেকেরই পাণ্ডিত্য অতি যৎসামান্য এবং অর্থলোভ অপরিমিত ছিল; গোরাকে তাঁহারা পারিয়া উঠিতেন না, তাহাকে বাঘের মত ভয় করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেবল হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রতি গোরার শ্রদ্ধা জন্মিল।

বেদান্ত চর্চ্চা করিবার জন্য বিদ্যাবাগীশকে কৃষ্ণদয়াল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোরা প্রথমেই ইঁহার সঙ্গে উদ্ধতভাবে লড়াই করিতে গিয়া দেখিল লড়াই চলে না। লোকটি যে কেবল পণ্ডিত তাহা নয়, তাঁহার মতের ঔদার্য্য অতি আশ্চর্য্য। কেবল সংস্কৃত পড়িয়া এমন তীক্ষ্ণ অথচ প্রশস্ত বুদ্ধি যে হইতে পারে গোরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিত না। বিদ্যাবাগীশের চরিত্রে ক্ষমা ও শান্তিতে পূর্ণ এমন একটি অবিচলিত ধৈর্য্য ও গভীরতা ছিল যে তাঁহার কাছে নিজেকে সংযত না করা গোরার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। হরচন্দ্রের কাছে গোরা বেদান্তদর্শন পড়িতে আরম্ভ করিল। গোরা কোনো কাজ আধাআধি রকম করিতে পারে না সুতরাং দর্শন আলোচনার মধ্যে সে একবারে তলাইয়া গেল।

ঘটনাক্রমে এই সময় একজন ইংরেজ মিশনারি কোনো সংবাদপত্রে হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজকে আক্রমণ করিয়া দেশের লোককে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। গোরা ত একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। যদিচ সে নিজে অবকাশ পাইলেই শাস্ত্র ও লোকাচারের নিন্দা করিয়া বিরুদ্ধমতের লোককে যত রকম করিয়া পারে পীড়া দিত তবু হিন্দুসমাজের প্রতি বিদেশী লোকের অবজ্ঞা তাহাকে যেন অঙ্কুশে আহত করিয়া তুলিল।

সংবাদপত্রে গোরা লড়াই সুরু করিল। অপর পক্ষে হিন্দুসমাজকে যতগুলি দোষ দিয়াছিল গোরা তাহার একটাও এবং একটুও স্বীকার

করিল না। দুই পক্ষে অনেক উত্তর চলাচলি হইলে পর সম্পাদক বলিলেন আমরা আর বেশী চিঠিপত্র ছাপিব না।

কিন্তু গোরার তখন রোখ চড়িয়া গেছে: সে "হিণ্ডুয়িজ্‌ম" নাম দিয়া ইংরেজিতে এক বই লিখিতে লাগিল—তাহাতে তাহার সাধ্যমত সমস্ত যুক্তি ও শাস্ত্র ঘাঁটিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অনিন্দনীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বসিয়া গেল।

এমনি করিয়া মিশনারির সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়া গোরা আস্তে আস্তে নিজের ওকালতির কাছে নিজে হার মানিল। গোরা বলিল, আমার আপন দেশকে বিদেশীর আদালতে আসামীর মত খাড়া করিয়া বিদেশীর আইন মতে তাহার বিচার করিতে আমরা দিবই না। বিলাতের আদর্শের সঙ্গে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মিল করিয়া আমরা লজ্জাও পাইব না, গৌরবও বোধ করিব না। যে দেশে জন্মিয়াছি সে দেশের আচার, বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্ব্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।

এই বলিয়া গোরা গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিল, টিকি রাখিল, খাওয়া ছোঁওয়া সম্বন্ধে বিচার করিয়া চলিল। এখন হইতে প্রত্যহ সকাল বেলায় সে বাপ মায়ের পায়ের ধূলা লয়, যে মহিমকে সে কথায় কথায় ইংরেজি ভাষায় "ক্যাড্‌" ও "স্নব" বলিয়া অভিহিত করিতে ছাড়িত না, তাহাকে দেখিলে উঠিয়া দাঁড়ায়, প্রণাম করে; মহিম এই হঠাৎ ভক্তি লইয়া তাহাকে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে, কিন্তু গোরা তাহার কোনো জবাব করে না।

গোরা তাহার উপদেশে ও আচরণে দেশের একদল লোককে যেন জাগাইয়া দিল। তাহারা যেন একটা টানাটানির হাত হইতে বাঁচিয়া

গেল; হাঁফ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আমরা ভাল কি মন্দ, সভ্য কি অসভ্য তাহা লইয়া জবাবদিহি কারো কাছে করিতে চাই না—কেবল আমরা ষোলো আনা অনুভব করিতে চাই যে আমরা আমরাই!

কিন্তু কৃষ্ণদয়াল গোরার এই নূতন পরিবর্ত্তনে যে খুসি হইলেন তাহা মনে হইল না। এমন কি, তিনি একদিন গোরাকে ডাকিয়া বলিলেন—দেখ বাবা, হিন্দুশাস্ত্র বড় গভীর জিনিষ। ঋষিরা যে ধর্ম্ম স্থাপন করে গেছেন তা তলিয়ে বোঝা যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়। আমার বিবেচনায় না বুঝে এ নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই ভাল। তুমি ছেলেমানুষ, বরাবর ইংরেজি পড়ে মানুষ হয়েচ, তুমি যে ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুঁকেছিলে সেটা তোমার ঠিক অধিকারের মতই কাজ করেছিলে। সেই জন্যেই আমি তাতে কিছুই রাগ করিনি বরঞ্চ খুসিই ছিলুম। কিন্তু এখন তুমি যে পথে চলেচ এটা ঠিক ভাল ঠেকচে না। এ তোমার পথই নয়।

গোরা কহিল, বলেন কি বাবা? আমি যে হিন্দু। হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম আজ না বুঝি ত কাল বুঝ্‌ব—কোনো কালে যদি না বুঝি তবু এই পথে চল্‌তেই হবে। হিন্দুসমাজের সঙ্গে পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ কাটাতে পারিনি বলেই ত এ জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি, এমনি করেই জন্মে জন্মে এই হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের ভিতর দিয়েই অবশেষে এর চরমে উত্তীর্ণ হব। যদি কখনো ভুলে অন্য পথের দিকে একটু হেলি আবার দ্বিগুণ জোরে ফিরতেই হবে।

কৃষ্ণদয়াল কেবলি মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন—কিন্তু, বাবা, হিন্দু বল্লেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান হওয়া সোজা, খ্রীষ্টান যে-সে হোতে পারে—কিন্তু হিন্দু! বাস্‌রে! ও বড় শক্ত কথা।

গোরা। সে ত ঠিক্। কিন্তু আমি যখন হিন্দু হয়ে জন্মেছি, তখন ত সিংহদ্বার পার হয়ে এসেছি। এখন ঠিক্‌মত সাধন করে গেলেই অল্পে অল্পে এগতে পারব!

কৃষ্ণদয়াল। বাবা, তর্কে তোমাকে ঠিকটি বোঝাতে পারব না। তবে তুমি যা বলচ সেও সত্য। যার যেটা কর্ম্মফল, নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, তাকে একদিন ঘুরেফিরে সেই ধর্ম্মের পথেই আসতে হবে—কেউ আট্‌কাতে পারবেনা। ভগবানের ইচ্ছে! আমরা কি করতে পারি; আমরা ত উপলক্ষ্য!

কর্ম্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা, সোঽহংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব সমস্তই কৃষ্ণদয়াল সম্পূর্ণ সমান ভাবে গ্রহণ করেন—পরস্পরের মধ্যে যে কোনো প্রকার সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে তাহা অনুভবমাত্র করেন না।

৬

আজ আহ্নিক ও স্নানাহার সারিয়া কৃষ্ণদয়াল অনেকদিন পরে আনন্দময়ীর ঘরের মেজের উপর নিজের কম্বলের আসনটি পাতিয়া সাবধানে চারিদিকের সমস্ত সংস্রব হইতে যেন বিবিক্ত হইয়া খাড়া হইয়া বসিলেন।

আনন্দময়ী কহিলেন—ওগো, তুমি ত তপস্যা করচ, ঘরের কথা কিছু ভাব না, কিন্তু আমি যে গোরার জন্যে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে গেলুম।

কৃষ্ণদয়াল। কেন, ভয় কিসের?

আনন্দময়ী। তা আমি ঠিক বল্‌তে পারিনে। কিন্তু আমার মনে হচ্চে গোরা আজকাল এই যে হিঁদুয়ানী আরম্ভ করেছে এ ওকে কখনই সইবে না, এ ভাবে চলতে গেলে শেষকালে একটা কি বিপদ ঘট্‌বে। আমি ত তোমাকে তখনি বলেছিলুম ওর পৈতে দিয়ো না। তখন যে তুমি কিছুই মান্‌তে না; বল্লে গলায় এক গাছা সুতো পরিয়ে দিলে তাতে কারো কিছু আসে যায় না। কিন্তু শুধু ত সুতো নয়—এখন ওকে ঠেকাবে কোথায়?

কৃষ্ণদয়াল। বেশ! সব দোষ বুঝি আমার! গোড়ায় তুমি যে ভুল করলে। তুমি যে ওকে কোনোমতেই ছাড়তে চাইলে না। তখন

আমিও গোঁয়ার গোছের ছিলুম—ধর্ম্মকর্ম্ম কোনো কিছুর ত জ্ঞান ছিল না। এখন হলে কি এমন কাজ করতে পারতুম!

আনন্দময়ী। কিন্তু যাই বল, আমি যে কিছু অধর্ম্ম করেছি সে আমি কোনোমতে মানতে পারব না। তোমার ত মনে আছে ছেলে হবার জন্যে আমি কি না করেছি—যে যা বলেছে তাই শুনেছি—কত মাদুলি কত মন্ত্র নিয়েছি সে ত তুমি জানই। একদিন স্বপ্নে দেখলুম যেন সাজি ভরে টগর ফুল নিয়ে এসে ঠাকুরের পূজো করতে বসেচি—এক সময় চেয়ে দেখি সাজিতে ফুল নেই, ফুলের মত ধবধবে, একটি ছোট্ট ছেলে; আহা সে কি দেখেছিলুম সে কি বলব, আমার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল —তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিতে যাব আর ঘুম ভেঙে গেল। তার দশ দিন না যেতেই ত গোরাকে পেলুম—সে আমার ঠাকুরের দান —সে কি আর কারো যে আমি কাউকে ফিরিয়ে দেব! আর জন্মে তাকে গর্ভে ধারণ করে বোধ হয় অনেক কষ্ট পেয়েছিলুম তাই আজ সে আমাকে মা বলতে এসেছে। কেমন করে কোথাথেকে সে এল ভেবে দেখ দেখি! চারিদিকে তখন মারামারি কাটাকাটি, নিজের প্রাণের ভয়েই মরি—সেই সময় রাত দুপুরে সেই মেম আমাদের বাড়িতে এসে লুকোলো; তুমি ত তাকে ভয়ে বাড়িতে রাখতেই চাও না— আমি তোমাকে ভাঁড়িয়ে তাকে গোয়াল ঘরে লুকিয়ে রাখলুম। সেই রাত্রেই ছেলেটি প্রসব করে সে ত মারা গেল। সেই বাপ-মা-মরা ছেলেকে আমি যদি না বাঁচাতুম ত সে কি বাঁচত! তোমার কি! তুমি ত পাদ্রির হাতে ওকে দিতে চেয়েছিলে। কেন! পাদ্রিকে দিতে যাব কেন? পাদ্রি কি ওর মা বাপ, না, ওর প্রাণরক্ষা করেচে? এমন করে যে ছেলে পেয়েছি সে কি গর্ভে পাওয়ার চেয়ে কম! তুমি যাই বল, এ ছেলে যিনি আমাকে দিয়েচেন তিনি স্বয়ং যদি না নেন তবে প্রাণ গেলেও আর কাউকে নিতে দিচ্চিনে।

কৃষ্ণদয়াল। সে ত জানি। তা তোমার গোরাকে নিয়ে তুমি থাক, আমি ত কখনো তাতে কোনো বাধা দিইনি। কিন্তু ওকে ছেলে বলে পরিচয় দিলে তার পরে ওর পৈতে না দিলে ত সমাজে মানবে না। তাই পৈতে কাজেই দিতে হল। এখন কেবল দুটি কথা ভাববার আছে। ন্যায়ত আমার বিষয় সম্পত্তি সমস্ত মহিমেরই প্রাপ্য—তাই—

আনন্দময়ী। কে তোমার বিষয় সম্পত্তির অংশ নিতে চায়। তুমি যত টাকা করেচ সব তুমি মহিমকে দিয়ে যেয়ো—গোরা তার এক পয়সাও নেবে না। ও পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া শিখেচে, নিজে খেটে উপার্জ্জন করে খাবে—ও পরের ধনে ভাগ বসাতে যাবে কেন। ও বেঁচে থাক্ সেই আমার ঢের—আমার আর কোনো সম্পত্তির দরকার নেই।

কৃষ্ণদয়াল। না, ওকে একেবারে বঞ্চিত করব না, জায়গিরটা ওকেই দিয়ে দেব—কালে তার মুনফা বছরে হাজার টাকা হতে পারবে। এখন ভাবনার কথা হচ্চে ওর বিবাহ দেওয়া নিয়ে। পূর্ব্বে যা করেচি তা করেচি—কিন্তু এখন ত হিন্দুমতে ব্রাহ্মণের ঘরে ওর বিয়ে দিতে পারব না—তা এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর!

আনন্দময়ী। হায় হায়! তুমি মনে কর তোমার মতো পৃথিবীময় গঙ্গাজল আর গোবর ছিটিয়ে বেড়াইনে বলে আমার ধর্ম্মজ্ঞান নেই। ব্রাহ্মণের ঘরে ওর বিয়েই বা দেব কেন, আর রাগ করবই বা কি জন্যে?

কৃষ্ণদয়াল। বল কি! তুমি যে বামুনের মেয়ে।

আনন্দময়ী। তা হইনা বামুনের মেয়ে! বাম্‌নাই করা ত আমি ছেড়েই দিয়েছি। ঐ ত মহিমের বিয়ের সময় আমার খ্রীষ্টানী চাল বলে কুটুম্বরা গোল করতে চেয়েছিল—আমি তাই ইচ্ছে করেই তফাৎ হয়ে ছিলুম, কথাটি কইনি। পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমাকে খ্রীষ্টান বলে, আরো কত কি কথা কয়—আমি সমস্ত মেনে নিয়েই বলি—তা খ্রীষ্টান কি

মানুষ নয়! তোমরাই যদি এত উঁচু জাত আর ভগবানের এত আদরের তবে তিনি একবার পাঠানের, একবার মোগলের, একবার খ্রীষ্টানের পায়ে এমন করে তোমাদের মাথা মুড়িয়ে দিচ্চেন কেন?

কৃষ্ণদয়াল। ও সব অনেক কথা, তুমি মেয়ে মানুষ সে সব বুঝবে না। কিন্তু সমাজ একটা আছে—সেটা ত বোঝ, সেটা তোমার মেনে চলাই উচিত।

আনন্দময়ী। আমার বুঝে কাজ নেই। আমি এই বুঝি যে গোরাকে আমি যখন ছেলে বলে মানুষ করেচি তখন আচার বিচারের ভড়ং করতে গেলে সমাজ থাক্ আর না থাক্ ধর্ম্ম থাক্‌বে না। আমি কেবল সেই ধর্ম্মের ভয়েই কোনো দিন কিছুই লুকোইনে—আমি যে কিছু মানচিনে সে সকলকেই জানতে দিই, আর সকলেরই ঘৃণা কুড়িয়ে চুপ করে পড়ে থাকি। কেবল একটি কথাই লুকিয়েছি, তারই জন্যে ভয়ে ভয়ে সারা হয়ে গেলুম ঠাকুর কখন্ কি করেন। দেখ, আমার মনে হয় গোরাকে সকল কথা বলে ফেলি, তার পরে অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।

কৃষ্ণদয়াল। ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, আমি বেঁচে থাকতে কোনো মতেই সে হতে পারবে না। গোরাকে ত জানই। এ কথা শুনলে সে কিযে করে বসবে তা কিছুই বলা যায় না। তার পরে সমাজে একটা হুলস্থুল পড়ে যাবে। সুধু তাই! এদিকে গবর্মেণ্ট কি করে তাও বলা যায় না। যদিও গোরার বাপ লড়াইয়ে মারা গেছে, ওর মাওত মরেচে জানি কিন্তু সব হাঙ্গামা চুকে গেলে মেজেষ্টরিতে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এখন এই নিয়ে যদি একটা গোলমাল উঠে পড়ে তাহলে আমার সাধন ভজন সমস্ত মাটি হবে, আরো কি বিপদ ঘটে বলা যায় না।

আনন্দময়ী নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণদয়াল কিছুক্ষণ পরে কহিলেন—গোরার বিবাহ সম্বন্ধে আমি একটা পরামর্শ মনে মনে করেচি। পরেশ ভটচাজ আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ত। সে স্কুল-

ইন্‌স্পেক্টরি কাজে পেন্সন নিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় এসে বসেছে। সে ঘোর ব্রাহ্ম। শুনেছি তার ঘরে অনেকগুলি মেয়েও আছে। গোরাকে তার বাড়িতে যদি ভিড়িয়ে দেওয়া যায় তবে যাতায়াত করতে করতে পরেশের কোনো মেয়েকে তার পছন্দ হয়ে যেতেও পারে। তার পরে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

আনন্দময়ী। বল কি! গোরা ব্রাহ্মর বাড়ি যাতায়াত করবে? সে দিন ওর আর নেই।

বলিতে বলিতে স্বয়ং গোরা তাহার মেঘমন্দ্র স্বরে "মা" বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণদয়ালকে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গোরার কাছে গিয়া দুই চক্ষে স্নেহ বিকীর্ণ করিতে করিতে কহিলেন—কি, বাবা কি চাই?

না বিশেষ কিছু না, এখন থাক্!—বলিয়া গোরা ফিরিবার উপক্রম করিল।

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন—একটু বোস, একটা কথা আছে। আমার একটি ব্রাহ্মবন্ধু সম্প্রতি কলকাতায় এসেচেন তিনি হেদো তলায় থাকেন।

গোরা। পরেশ বাবু নাকি!

কৃষ্ণদয়াল। তুমি তাঁকে জান্‌লে কি করে?

গোরা। বিনয় তাঁর বাড়ীর কাছেই থাকে, তার কাছে তাঁদের গল্প শুনেছি।

কৃষ্ণদয়াল। আমি ইচ্ছা করি তুমি তাঁদের খবর নিয়ে এস।

গোরা আপন মনে একটু চিন্তা করিল, তার পরে হঠাৎ বলিল—আচ্ছা আমি কালই যাব।

আনন্দময়ী কিছু আশ্চর্য্য হইলেন।

গোরা একটু ভাবিয়া আবার কহিল—না, কাল ত আমার যাওয়া হবে না।

কৃষ্ণদয়াল। কেন?

গোরা। কাল আমাকে ত্রিবেণী যেতে হবে।

কৃষ্ণদয়াল আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, ত্রিবেণী!

গোরা। কাল সূর্য্যগ্রহণের স্নান।

আনন্দময়ী। তুই অবাক্ করলি গোরা। স্নান করতে চাস্ কলকাতার গঙ্গা আছে। ত্রিবেণী না হলে তোর স্নান হবে না—তুই যে দেশসুদ্ধ সকল লোককেই ছাড়িয়ে উঠ্‌লি!

গোরা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

গোরা যে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে তাহার কারণ এই যে সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী একত্র হইবে। যেখানে গোরা একটুমাত্র অবকাশ পায় সেখানেই সে তাহার সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কার সবলে পরিত্যাগ করিয়া দেশের সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইয়া মনের সঙ্গে বলিতে চায়, "আমি তোমাদের, তোমরা আমার।"

ভোরে উঠিয়া বিনয় দেখিল রাত্রির মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেছে। সকাল বেলাকার আলোটি দুধের ছেলের হাসির মত নির্ম্মল হইয়া ফুটিয়াছে। দুই একটা শাদা মেঘ নিতান্তই বিনা প্রয়োজনে আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া আর একটি নির্ম্মল প্রভাতের স্মৃতিতে যখন সে পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল এমন সময় দেখিল পরেশ এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে সতীশের হাত ধরিয়া রাস্তা দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। সতীশ বিনয়কে বারান্দায় দেখতে পাইয়াই হাততালি দিয়া বিনয় বাবু বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পরেশও মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিনয়কে

দেখিতে পাইলেন। বিনয় তাড়াতাড়ি নীচে যেমন নামিয়া আসিল, সতীশকে লইয়া পরেশও তাহার বাসার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সতীশ বিনয়ের হাত ধরিয়া কহিল,—বিনয় বাবু, আপনি যে সেদিন বল্লেন আমাদের বাড়ীতে যাবেন, কই, গেলেন না ত?

বিনয় সস্নেহে সতীশের পিঠে হাত দিয়া হাসিতে লাগিল। পরেশ সাবধানে তাঁহার লাঠিগাছটি টেবিলের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড় করাইয়া চৌকিতে বসিলেন ও কহিলেন,—সেদিন আপনি না থাক্‌লে আমাদের ভারি মুস্কিল হত। বড় উপকার করেচেন।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল,—কি বলেন! কিইবা করেচি?

সতীশ হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বিনয় বাবু, আপনার কুকুর নেই?

বিনয় হাসিয়া কহিল, কুকুর? না কুকুর নেই।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—কেন, কুকুর রাখেন নি কেন?

বিনয় কহিল,—কুকুরের কথাটা কখনো মনে হয় নি।

পরেশ কহিলেন,—শুন্‌লুম সেদিন সতীশ আপনার এখানে এসেছিল, খুব বোধ হয় বিরক্ত করে গেছে! ও এত বকে যে, ওর দিদি ওকে বক্তিয়ার খিলিজি নাম দিয়েছে।

বিনয় কহিল,—আমিও খুব বক্‌তে পারি তাই আমাদের দুজনের খুব ভাব হয়ে গেছে। কি বল সতীশ বাবু?

সতীশ এ কথার কোনো উত্তর দিল না; কিন্তু পাছে তাহার নূতন নামকরণ লইয়া বিনয়ের কাছে তাহার গৌরবহানি হয় সেই জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এবং কহিল,—বেশ ত ভালই ত। বক্তিয়ার খিলিজি ভালই ত! আচ্ছা বিনয় বাবু, বক্তিয়ার খিলিজি ত লড়াই করেছিল? সে ত বাংলা দেশ জিতে নিয়েছিল?

বিনয় হাসিয়া কহিল,—আগে সে লড়াই করত, এখন আর

লড়াইয়ের দরকার হয় না, এখন সে সুধু বক্তৃতা করে। আর বাংলা দেশ জিতেও নেয়।

এম্‌নি করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। পরেশ সকলের চেয়ে কম কথা কহিয়াছিলেন,—তিনি কেবল প্রসন্ন শান্তমুখে মাঝে মাঝে হাসিয়াছেন এবং দুটো একটা কথায় যোগ দিয়াছেন। বিদায় লইবার সময় চৌকি হইতে উঠিয়া বলিলেন,—আমাদের আটাত্তর নম্বরের বাড়িটা এখান থেকে বরাবর ডানহাতি গিয়ে—

সতীশ কহিল,—উনি আমাদের বাড়ি জানেন। উনি যে সে দিন আমার সঙ্গে বরাবর আমাদের দরজা পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন।

এ কথায় লজ্জা পাইবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না—কিন্তু বিনয় মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিল। যেন কি-একটা তাহার ধরা পড়িয়া গেল।

বৃদ্ধ কহিলেন—তবে ত আপনি আমাদের বাড়ী জানেন। তা হলে যদি কখনো আপনার—

বিনয়। সে আর বল্‌তে হবে না—যখনি—

পরেশ। আমাদের এ ত একই পাড়া—কেবল কলকাতা বলেই এত দিন চেনাশোনা হয় নি।

বিনয় রাস্তা পর্য্যন্ত পরেশকে পৌঁছাইয়া দিল। দ্বারের কাছে কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ লাঠি লইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন—আর সতীশ ক্রমাগত বকিতে বকিতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বিনয় মনে মনে বলিতে লাগিল, পরেশ বাবুর মত এমন বৃদ্ধ দেখি নাই, পায়ের ধূলা লইতে ইচ্ছা করে। আর সতীশ ছেলেটি কি চমৎকার! বাঁচিয়া থাকিলে এ একজন মানুষ হইবে—যেমন বুদ্ধি তেমনি সরলতা।

এই বৃদ্ধ এবং বালকটি যতই ভাল হোক এত অল্পক্ষণের পরিচয়ে

তাহাদের সম্বন্ধে এতটা পরিমাণে ভক্তি ও স্নেহের উচ্ছ্বাস সাধারণতঃ সম্ভবপর হইতে পারিত না। কিন্তু বিনয়ের মনটা এমন অবস্থায় ছিল যে, সে অধিক পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে নাই।

তাহার পরে বিনয় মনে মনে ভাবিতে লাগিল—পরেশ বাবুর বাড়িতে যাইতেই হইবে, নহিলে ভদ্রতা রক্ষা হইবে না।

কিন্তু গোরার মুখ দিয়া তাহাদের দলের ভারতবর্ষ তাহাকে বলিতে লাগিল ওখানে তোমার যাতায়াত চলিবেনা! খবরদার!

বিনয় পদে পদে তাহার দলের ভারতবর্ষের অনেক নিষেধ মানিয়াছে। অনেক সময় দ্বিধা বোধ করিয়াছে তবু মানিয়াছে। আজ তাহার মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল ভারতবর্ষ যেন কেবল নিষেধরই মূর্ত্তি।

চাকর আসিয়া খবর দিল আহার প্রস্তুত—কিন্তু এখনো বিনয়ের স্নানও হয় নাই। বারোটা বাজিয়া গেছে। হঠাৎ এক সময়ে বিনয় সজোরে মাথা ঝাড়া দিয়া কহিল,—আমি খাব না, তোরা যা! বলিয়া ছাতা ঘাড়ে করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল—একটা চাদরও কাঁধে লইল না।

বরাবর গোরাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। বিনয় জানিত আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটা বাড়ি ভাড়া লইয়া হিন্দুহিতৈষীর আপিস বসিয়াছে; প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গোরা আপিসে গিয়া সমস্ত বাংলাদেশে তাহার দলের লোক যেখানে যে আছে সবাইকে পত্র লিখিয়া জাগ্রত করিয়া রাখে। এই খানেই তাহার ভক্তরা তাহার মুখে উপদেশ শুনিতে আসে এবং তাহার সহকারিতা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে।

সে দিনও গোরা সেই আপিসের কাজে গিয়াছিল। বিনয় একেবারে যেন দৌড়িয়া অন্তঃপুরে আনন্দময়ীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্দময়ী তখন ভাত খাইতে বসিয়াছিলেন এবং লছমিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহাকে পাখা করিতেছিল।

আনন্দময়ী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—কি রে বিনয়, কি হয়েছে তোর ?

বিনয় তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—মা বড় ক্ষিদে পেয়েচে, আমাকে খেতে দাও।

আনন্দময়ী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—তবেই মুস্কিলে ফেল্লি। বামুন ঠাকুর চলে গেছে—তোরা যে আবার—

বিনয় কহিল,—আমি কি বামুন ঠাকুরের রান্না খেতে এলুম! তা হলে আমার বাসার বামুন কি দোষ করলে? আমি তোমার পাতের প্রসাদ খাব মা। লছ্‌মিয়া, দে ত আমাকে এক গ্লাস্ জল এনে!

লছ্‌মিয়া জল আনিয়া দিতেই বিনয় ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। তখন আনন্দময়ী আর একটা থালা আনাইয়া নিজের পাতের ভাত সস্নেহে সযত্নে মাখিয়া সেই থালে তুলিয়া দিতে থাকিলেন এবং বিনয় বহুদিনের বুভুক্ষুর মত তাহাই খাইতে লাগিল।

আনন্দময়ীর মনের একটা বেদনা আজ দূর হইল। তাঁহার মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া বিনয়েরও বুকের একটা বোঝা যেন নামিয়া গেল। আনন্দময়ী বালিসের খোল সেলাই করিতে বসিয়া গেলেন; কেয়াখয়ের তৈরি করিবার জন্য পাশের ঘরে কেয়াফুল জড় হইয়াছিল তাহারই গন্ধ আসিতে লাগিল; বিনয় আনন্দময়ীর পায়ের কাছে ঊর্দ্ধোত্থিত একটা হাতে মাথা রাখিয়া আধশোয়া রকমে পড়িয়া রহিল, এবং পৃথিবীর আর সমস্ত ভুলিয়া ঠিক সেই আগেকার দিনের মত আনন্দে বকিয়া যাইতে লাগিল।

৮

এই একটা বাঁধ ভাঙিয়া যাইতেই বিনয়ের হৃদয়ের নূতন বন্যা আরো যেন উদ্দাম হইয়া উঠিল। আনন্দময়ীর ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া সে যেন একেবারে উড়িয়া চলিল; মাটির স্পর্শ তাহার যেন পায়ে

ঠেকিল না; তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল মনের যে কথাটা লইয়া সে এ কয়দিন সঙ্কোচে পীড়িত হইয়াছে তাহাই আজ মুখ তুলিয়া সকলের কাছে ঘোষণা করিয়া দেয়।

বিনয় যে মুহূর্ত্তে ৭৮ নম্বরের দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিল ঠিক সেই সময়েই পরেশও বিপরীত দিক দিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"আসুন আসুন, বিনয়বাবু, বড় খুসি হলুম।" এই বলিয়া পরেশ বিনয়কে তাঁহার রাস্তার ধারের বসিবার ঘরটাতে লইয়া গিয়া বসাইলেন। একটি ছোট টেবিল, তাহার এক ধারে পিঠওয়ালা বেঞ্চি, অন্যধারে একটা কাঠের ও বেতের চৌকি; দেয়ালে, একদিকে যিসুখৃষ্টের একটি রং করা ছবি এবং অন্যদিকে কেশববাবুর ফটোগ্রাফ। টেবিলের উপর দুই চারি দিনের খবরের কাগজ ভাঁজ করা, তাহার উপরে শীষার কাগজচাপা। কোণে একটি ছোট আলমারি, তাহার উপরের থাকে থিয়োডার পার্কারের বই সারি সারি সাজানো রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। আলমারির মাথার উপরে একটা গ্লোব কাপড় দিয়া ঢাকা রহিয়াছে।

বিনয় বসিল: তাহার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল তাহার পিঠের দিকের খোলা দরজা দিয়া যদি কেহ ঘরের ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করে।

পরেশ কহিলেন,—সোমবারে সুচরিতা আমার একটি বন্ধুর মেয়েকে পড়াতে যায় সেখানে সতীশের একটি সমবয়সী ছেলে আছে তাই সতীশও তার সঙ্গে গেছে। আমি তাদের সেখানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসচি। আর একটু দেরি হলেই ত আপনার সঙ্গে দেখা হত না।

খবরটা শুনিয়া বিনয় একইকালে একটা আশাভঙ্গের খোঁচা এবং আরাম মনের মধ্যে অনুভব করিল। পরেশের সঙ্গে তাহার কথাবার্ত্তা দিব্য সহজ হইয়া আসিল।

গল্প করিতে করিতে একেএকে পরেশ আজ বিনয়ের সমস্ত খবর জানিতে পারিলেন। বিনয়ের বাপ মা নাই ; খুড়িমাকে লইয়া খুড়া দেশে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখেন। তাহার খুড়তুত দুই ভাই তাহার সঙ্গে এক বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত—বড়টি উকীল হইয়া তাহাদের জেলা কোর্টে ব্যবসায় চালাইতেছে, ছোটটী কলিকাতায় থাকিতেই ওলাওঠা হইয়া মারা গিয়াছে। খুড়ার ইচ্ছা বিনয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটির চেষ্টা করে কিন্তু বিনয় কোনো চেষ্টাই না করিয়া নানা বাজে কাজে নিযুক্ত আছে।

এমনি করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বিনা প্রয়োজনে আর বেশিক্ষণ থাকিলে অভদ্রতা হয় তাই বিনয় উঠিয়া পড়িল, কহিল, বন্ধু সতীশের সঙ্গে আমার দেখা হল না দুঃখ রইল ; তাকে খবর দেবেন আমি এসেছিলুম।

পরেশবাবু কহিলেন, আর একটু বসলেই তাদের সঙ্গে দেখা হত। তাদের ফেরবার আর বড় দেরি নেই।

এই কথাটুকুর উপরে নির্ভর করিয়া আবার বসিয়া পড়িতে বিনয়ের লজ্জা বোধ হইল। আর একটু পীড়াপীড়ি করিলে সে বসিতে পারিত—কিন্তু পরেশ অধিক কথা বলিবার বা পীড়াপীড়ি করিবার লোক নহেন,সুতরাং বিদায় লইতে হইল। পরেশ বলিলেন, আপনি মাঝে মাঝে এলে খুসি হব।

রাস্তায় বাহির হইয়া বিনয় বাড়ির দিকে ফিরিবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করিল না। সেখানে কোনো কাজ নাই। বিনয় কাগজে লিখিয়া থাকে—তাহার ইংরেজি লেখার সকলে খুব তারিফ করে কিন্তু গত কয় দিন হইতে লিখিতে বসিলে লেখা মাথায় আসে না। টেবিলের সামনে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকাই দায়—মন ছট্‌ফট্ করিয়া উঠে। বিনয় তাই আজ বিনা কারণেই উল্টা দিকে চলিল।

দু-পা যাইতেই একটি বালককণ্ঠের চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইল "বিনয়-বাবু, বিনয়বাবু!"

মুখ তুলিয়া দেখিল একটি ভাড়াটে গাড়ির দরজার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সতীশ তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছে। গাড়ির ভিতরের আসনে খানিকটা শাড়ি খানিকটা শাদা জামার আস্তিন যেটুকু দেখা গেল তাহাতে আরোহীটি যে কে তাহা বুঝিতে কোন সন্দেহ রহিল না।

বাঙালী ভদ্রতার সংস্কার অনুসারে গাড়ির দিকে দৃষ্টি রক্ষা করা বিনয়ের পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সেইখানেই গাড়ি হইতে নামিয়া সতীশ আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল—কহিল চলুন আমাদের বাড়ি!

বিনয় কহিল—আমি যে তোমাদের বাড়ি থেকে এখনি আসচি।

সতীশ। বা, আমরা যে ছিলুম না আবার চলুন!

সতীশের পীড়াপীড়ি বিনয় অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। বন্দীকে লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই সতীশ উচ্চস্বরে কহিল—বাবা বিনয় বাবুকে এনেছি!

বৃদ্ধ ঘর হইতে বাহির হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, শক্ত হাতে ধরা পড়েছেন, শীঘ্র ছাড়া পাবেন না। সতীশ তোর দিদিকে ডেকে দে।

বিনয় ঘরে আসিয়া বসিল, তাহার হৃৎপিণ্ড বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। পরেশ কহিলেন হাঁপিয়ে পড়েছেন বুঝি! সতীশ ভারি দুরন্ত ছেলে!

ঘরে যখন সতীশ তাহার দিদিকে লইয়া প্রবেশ করিল তখন বিনয় প্রথমে একটি মৃদু সুগন্ধ অনুভব করিল—তাহার পরে শুনিল পরেশবাবু বলিতেছেন—রাধে, বিনয়বাবু এসেছেন। এঁকে ত তুমি জানই।

বিনয় চকিতের মত মুখ তুলিয়া দেখিল সুচরিতা তাহাকে নমস্কার করিয়া সামনের চৌকিতে বসিল—এবার বিনয় প্রতিনমস্কার করিতে ভুলিল না।

সুচরিতা কহিল—উনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁকে দেখবামাত্র সতীশকে আর ধরে রাখা গেল না, সে গাড়ি থেকে নেমেই ওঁকে টেনে

নিয়ে এল। আপনি হয়ত কোনো কাজে যাচ্ছিলেন—আপনার ত কোনো অসুবিধে হয়নি!

সুচরিতা বিনয়কে সম্বোধন করিয়া কোনো কথা কহিবে বিনয় তাহা প্রত্যাশাই করে নাই। সে কুণ্ঠিত হইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল—না, আমার কোনো কাজ ছিল না, অসুবিধে কিছুই হয়নি।

সতীশ সুচরিতার কাপড় ধরিয়া টানিয়া কহিল—দিদি চাবিটা দাও না। আমাদের সেই আর্গিনটা এনে বিনয় বাবুকে দেখাই।

সুচরিতা হাসিয়া কহিল—এই বুঝি সুরু হল! যার সঙ্গে বক্তিয়ারের ভাব হবে তার আর রক্ষে নেই—আর্গিন ত তাকে শুন্‌তেই হবে—আরো অনেক দুঃখ তার কপালে আছে। বিনয়বাবু, আপনার এই বন্ধুটি ছোট কিন্তু এর বন্ধুত্বর দায় বড় বেশি—সহ্য করতে পারবেন কি না জানিনে।

বিনয় সুচরিতার এইরূপ অকুণ্ঠিত আলাপে কেমন করিয়া বেশ সহজে যোগ দিবে কোনো মতেই ভাবিয়া পাইল না। লজ্জা করিবে না দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াও কোনো প্রকারে ভাঙাচোরা করিয়া একটা জবাব দিল—না, কিছুই না—আপনি সে—আমি—আমার ও বেশ ভালই লাগে।

সতীশ তাহার দিদির কাছ হইতে চাবি আদায় করিয়া আর্গিন আনিয়া উপস্থিত করিল। একটা চৌকা কাচের আবরণের মধ্যে তরঙ্গিত সমুদ্রের অনুকরণে নীল-রং-করা কাপড়ের উপর একটা খেলার জাহাজ রহিয়াছে। সতীশ চাবি দিয়া দম লাগাইতেই আর্গিনের সুরে-তালে জাহাজটা দুলিতে লাগিল এবং সতীশ একবার জাহাজের দিকে ও একবার বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মনের অস্থিরতা সম্বরণ করিতে পারিল না!

এমনি করিয়া সতীশ মাঝখানে থাকাতে অল্প অল্প করিয়া বিনয়ের সঙ্কোচ ভাঙিয়া গেল—এবং ক্রমে সুচরিতার সঙ্গে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া কথা কহাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল না।

কিছুক্ষণ পরে লীলা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—বাবা, মা তোমাদের উপরের বারাণ্ডায় আস্‌তে বল্লেন।

১০

উপরে গাড়িবারান্দায় একটা টেবিলে শুভ্র কাপড় পাতা ;—টেবিল ঘেরিয়া চৌকি সাজানো। রেলিঙের বাহিরে কার্ণিশের উপরে ছোট ছোট টবে পাতাবাহার এবং ফুলের গাছ। বারান্দার উপর হইতে রাস্তার ধারের শিরীষ ও কৃষ্ণচূড়া গাছের বর্ষাজলধৌত পল্লবিত চিক্কণতা দেখা যাইতেছে।

সূর্য্য তখনও অস্ত যায় নাই ;—পশ্চিম আকাশ হইতে ম্লান রৌদ্র সোজা হইয়া বারান্দার এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে।

ছাতে তখন কেহ ছিল না। একটু পরেই সতীশ শাদা কালো রোঁয়া-ওয়ালা এক ছোট কুকুর লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নাম ক্ষুদে। এই কুকুরের যত রকম বিদ্যা ছিল সতীশ তাহা বিনয়কে দেখাইয়া দিল। সে এক পা তুলিয়া সেলাম করিল, মাথা মাটিতে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, একখণ্ড বিস্কুট দেখাইতেই ল্যাজের উপর বসিয়া দুই পা জড় করিয়া ভিক্ষা চাহিল ;—এইরূপে ক্ষুদে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিল সতীশই তাহা আত্মসাৎ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিল—এই যশোলাভে ক্ষুদের লেশমাত্র উৎসাহ ছিল না ;—বস্তুত যশের চেয়ে বিস্কুট্‌টাকে সে ঢের বেশি সত্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিল।

কোন্ একটা ঘর হইতে মাঝে মাঝে মেয়েদের গলার খিল্‌খিল হাসি ও কৌতুকের কণ্ঠস্বর এবং তাহার সঙ্গে একজন পুরুষের গলাও শুনা যাইতেছিল। এই অপর্য্যাপ্ত হাস্য কৌতুকের শব্দে বিনয়ের মনের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব মিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে একটা যেন ঈর্ষার বেদনা বহন করিয়া আনিল। ঘরের ভিতরে মেয়েদের গলার এই আনন্দের কলধ্বনি বয়স হওয়া

অবধি সে এমন করিয়া কখনো শুনে নাই। এই আনন্দের মাধুর্য্য তাহার এত কাছে উচ্ছ্বসিত হইতেছে অথচ সে ইহা হইতে এত দূরে! সতীশ তাহার কানের কাছে কি বলিতেছিল বিনয় তাহা মন দিয়া শুনিতেই পারিল না।

পরেশ বাবুর স্ত্রী তাঁহার তিন মেয়েকে সঙ্গে করিয়া ছাতে আসিলেন—সঙ্গে একজন যুবক আসিল সে তাঁহাদের দূর আত্মীয়।

পরেশ বাবুর স্ত্রীর নাম বরদাসুন্দরী। তাঁহার বয়স অল্প নহে কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায় যে বিশেষ যত্ন করিয়া সাজ করিয়া আসিয়াছেন। বড় বয়স পর্য্যন্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত কাটাইয়া হঠাৎ এক সময় হইতে আধুনিক কালের সঙ্গে সমান বেগে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; সেই জন্যই তাঁহার সিল্কের শাড়ি বেশি খস্‌খস্‌ এবং উঁচু গোড়ালির জুতা বেশি খট্‌ খট্‌ শব্দ করে। পৃথিবীতে কোন্‌ জিনিষটা ব্রাহ্ম এবং কোন্‌টা অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি সর্ব্বদাই অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন। সেই জন্যই রাধারাণীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি সুচরিতা রাখিয়াছেন।

তাঁহার বড় মেয়ের নাম লাবণ্য। সে মোটাসোটা, হাসিখুসি, লোকের সঙ্গ এবং গল্পগুজব ভালবাসে। মুখটি গোলগাল, চোখ দুটি বড়, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। বেশভূষার ব্যাপারে সে স্বভাবতই কিছু ঢিলা কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার মাতার শাসনে তাহাকে চলিতে হয়। উঁচু গোড়ালির জুতা পরিতে সে সুবিধা বোধ করে না, তবু না পরিয়া উপায় নাই। বিকালে সাজ করিবার সময় মা স্বহস্তে তাহার মুখে পাউডার ও দুই গালে রং লাগাইয়া দেন। একটু মোটা বলিয়া বরদাসুন্দরী তাহার জামা এমনি আঁট করিয়া তৈরি করিয়াছেন যে লাবণ্য যখন সাজিয়া বাহির হইয়া আসে তখন মনে হয় যেন তাহকে পাটের বস্তার মত কলে চাপ দিয়া আঁটিয়া বাঁধা হইয়াছে।

মেজ মেয়ের নাম ললিতা। সে বড় মেয়ের বিপরীত বলিলেই হয়।

তাহার দিদির চেয়ে সে মাথায় লম্বা, রোগা, রং আর একটু কালো, কথাবার্ত্তা বেশি কয় না, সে আপনার নিয়মে চলে, ইচ্ছা করিলে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে পারে। বরদাসুন্দরী তাহাকে মনে মনে ভয় করেন, সহজে তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে সাহস করেন না।

ছোট লীলা, তাহার বয়স বছর দশেক হইবে। সে দৌড়ধাপ উপদ্রব করিতে মজবুৎ—সতীশের সঙ্গে তাহার ঠেলাঠেলি মারামারি সর্ব্বদাই চলে। বিশেষত ক্ষুদে নামধারী কুকুরটার স্বত্বাধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই। কুকুরের নিজের মত লইলে সে বোধ হয় উভয়ের মধ্যে কাহাকেও প্রভুরূপে নির্ব্বাচন করিত না;—তবু দুজনের মধ্যে সে বোধ করি সতীশকেই কিঞ্চিৎ পছন্দ করে। কারণ, লীলার আদরের বেগ সম্বরণ করা এই ছোট জন্তুটার পক্ষে সহজ ছিল না। বালিকার আদরের চেয়ে বালকের শাসন তাহার কাছে অপেক্ষাকৃত সুসহ ছিল।

বরদাসুন্দরী আসিতেই বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পরেশ বাবু কহিলেন—এঁরই বাড়িতে সেদিন আমরা—

বরদা কহিলেন—ওঃ! বড় উপকার করেছেন—আপনি আমাদের অনেক ধন্যবাদ জানবেন।

শুনিয়া বিনয় এত সঙ্কুচিত হইয়া গেল যে ঠিকমত উত্তর দিতে পারিল না।

মেয়েদের সঙ্গে যে যুবকটি আসিয়াছিল তাহার সঙ্গেও বিনয়ের আলাপ হইয়া গেল। তাহার নাম সুধীর। সে কলেজে বি এ পড়ে। চেহারাটি প্রিয়দর্শন, রং গৌর, চোখে চশমা, অল্প গোঁফের রেখা উঠিয়াছে। ভাবখানা অত্যন্ত চঞ্চল—এক দণ্ড বসিয়া থাকিতে চায় না, একটা কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত। সর্ব্বদাই মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা করিয়া বিরক্ত করিয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েরাও

তাহার প্রতি কেবলি তর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু সুধীরকে নহিলে তাহাদের কোনোমতেই চলে না। সার্ক্বস্ দেখাইতে, জুয়লজিকাল গার্ডেনে লইয়া যাইতে, কোনো সখের জিনিষ কিনিয়া আনিতে সুধীর সর্ব্বদাই প্রস্তুত। মেয়েদের সঙ্গে সুধীরের অসঙ্কোচ হৃদ্যতার ভাব বিনয়ের কাছে অত্যন্ত নূতন এবং বিস্ময়কর ঠেকিল। প্রথমটা সে এইরূপ ব্যবহারকে মনে মনে নিন্দাই করিল কিন্তু সেই নিন্দার সঙ্গে একটু যেন ঈর্ষার ভাব মিশিতে লাগিল।

বরদাসুন্দরী কহিলেন—মনে হচ্চে আপনাকে যেন দুই একবার সমাজে দেখেচি।

বিনয়ের মনে হইল যেন তাহার কি একটা অপরাধ ধরা পড়িল। সে অনাবশ্যক লজ্জা প্রকাশ করিয়া কহিল—হাঁ, আমি কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনতে মাঝে মাঝে যাই।

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি বুঝি কলেজে পড়চেন?

বিনয় কহিল—না, এখন আর কলেজে পড়িনে।

বরদা কহিলেন—আপনি কলেজে কতদূর পর্য্যন্ত পড়েচেন?

বিনয় কহিল—এম এ পাস করেচি।

শুনিয়া এই বালকের মত চেহারা যুবকের প্রতি বরদাসুন্দরীর শ্রদ্ধা হইল। তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া পরেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন—আমার মনু যদি থাকত তবে সেও এতদিনে এম এ পাস করে বের হত।

বরদার প্রথম সন্তান মনোরঞ্জন নয় বছর বয়সে মারা গেছে। যে কোনো যুবক কোনো বড় পাস করিয়াছে, বা বড় পদ পাইয়াছে, ভাল বই লিখিয়াছে বা কোনো ভাল কাজ করিয়াছে, শুনেন, বরদার তখনি মনে হয় মনু বাঁচিয়া থাকিলে তাহার দ্বারাও ঠিক এইগুলি ঘটিত। যাহা হউক সে যখন নাই তখন বর্ত্তমানে জনসমাজে তাঁহার মেয়ে তিনটির গুণ প্রচারই বরদাসুন্দরীর একটা বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। তাঁহার

মেয়েরা যে খুব পড়াশুনা করিতেছে একথা বরদা বিশেষ করিয়া বিনয়কে জানাইলেন ;—মেম তাঁহার মেয়েদের বুদ্ধি ও গুণপনা সম্বন্ধে কবে কি বলিয়াছিল তাহাও বিনয়ের অগোচর রহিল না। যখন মেয়ে-ইস্কুলে প্রাইজ দিবার সময় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এবং তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে তোড়া দিবার জন্য ইস্কুলের সমস্ত মেয়েদের মধ্যে লাবণ্যকেই বিশেষ করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং গবর্ণরের স্ত্রী লাবণ্যকে উৎসাহজনক কি একটা মিষ্টবাক্য বলিয়াছিলেন তাহাও বিনয় শুনিল।

অবশেষে বরদা লাবণ্যকে বলিলেন, যে সেলাইটার জন্যে তুমি প্রাইজ পেয়েছিলে সেইটে নিয়ে এস ত মা!

একটা পশমের সেলাই করা টিয়াপাখীর মূর্ত্তি এই বাড়ির আত্মীয় বন্ধুদের নিকটে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। মেমের সহযোগিতায় এই জিনিষটা লাবণ্য অনেকদিন হইল রচনা করিয়াছিল—এই রচনায় লাবণ্যের নিজের কৃতিত্ব যে খুব বেশি ছিল তাহাও নহে—কিন্তু নূতন আলাপী মাত্রকেই এটা দেখাইতে হইবে সে ধরা কথা। পরেশ প্রথম প্রথম আপত্তি করিতেন কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্ফল জানিয়া এখন আর আপত্তিও করেন না। এই পশমের টিয়াপাখীর রচনানৈপুণ্য লইয়া যখন বিনয় দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়াছে তখন বেহারা আসিয়া একখানি চিঠি পরেশের হাতে দিল।

চিঠি পড়িয়া পরেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন ; কহিলেন, বাবুকে উপরে নিয়ে আয়!

বরদা জিজ্ঞাসা করিলেন—কে ?

পরেশ কহিলেন—আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু কৃষ্ণদয়াল তাঁর ছেলেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যে পাঠিয়েছেন।

হঠাৎ বিনয়ের হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া উঠিল এবং তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া

গেল। তাহার পরক্ষণেই সে হাত মুঠা করিয়া বেশ একটু শক্ত হইয়া বসিল—যেন কোনো প্রতিকূল পক্ষের বিরুদ্ধে সে নিজেকে দৃঢ় রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিল। গোরা যে এই পরিবারের লোকদিগকে অশ্রদ্ধার সহিত দেখিবে ও বিচার করিবে ইহা আগে হইতেই বিনয়কে যেন কিছু উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

১১

খুঞ্চের উপর জলখাবার ও চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া চাকরের হাতে দিয়া সুচরিতা ছাতে আসিয়া বসিল এবং সেই মুহূর্ত্তে বেহারার সঙ্গে গোরাও আসিয়া প্রবেশ করিল। সুদীর্ঘ শুভ্রকায় গোরার আকৃতি আয়তন ও সাজ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিল।

গোরার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরনে মোটা ধুতির উপর ফিতা-বাঁধা এক জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়তোলা কট্‌কি জুতা। সে যেন বর্ত্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার এরূপ সাজ সজ্জা বিনয়ও পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই।

আজ গোরার মনে একটা বিরোধের আগুন বিশেষ করিয়াই জ্বলিতেছিল। তাহার কারণও ঘটিয়াছিল।

গ্রহণের স্নান উপলক্ষে কোনো ষ্টীমার কোম্পানি কাল প্রত্যূষে যাত্রী লইয়া ত্রিবেণী রওনা হইয়াছিল। পথের মধ্যে মধ্যে এক এক ষ্টেশন হইতে বহুতর স্ত্রীলোক যাত্রী দুই একজন পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিতেছিল। পাছে জায়গা না পায় এজন্য ভারি ঠেলাঠেলি পড়িয়াছিল। পায়ে কাদা লইয়া জাহাজে চড়িবার তক্তা খানার উপরে টানাটানির চোটে পিছলে কেহবা অসম্বৃত অবস্থায় নদীর জলের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে; কাহাকেও বা খালাসী ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে; কেহ বা নিজে উঠিয়াছে কিন্তু সঙ্গী উঠিতে পারে নাই বলিয়া

ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে;—মাঝে মাঝে দুই এক পসলা বৃষ্টি আসিয়া তাহাদিগকে ভিজাইয়া দিতেছে;—জাহাজে তাহাদের বসিবার স্থান কাদায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মুখে চোখে একটা ত্রস্তব্যস্ত উৎসুক সকরুণ ভাব, তাহারা শক্তিহীন অথচ তাহারা এত ক্ষুদ্র যে জাহাজের মাল্লা হইতে কর্ত্তা পর্য্যন্ত কেহই তাহাদের অনুনয়ে এতটুকু সাহায্য করিবে না ইহা নিশ্চয় জানে বলিয়া তাহাদের চেষ্টার মধ্যে ভারি একটা কাতর আশঙ্কা প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় গোরা যথাসাধ্য যাত্রী-দিগকে সাহায্য করিতেছিল। উপরের ফাষ্ট ক্লাসের ডেকে একজন ইংরেজ এবং একটি আধুনিক ধরণের বাঙালীবাবু জাহাজের রেলিং ধরিয়া পরস্পর হাস্যালাপ করিতে করিতে চুরুট মুখে তামাসা দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে কোনো যাত্রীর বিশেষ কোনো আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া ইংরেজ হাসিয়া উঠিতেছিল এবং বাঙালীটিও তাহার সঙ্গে যোগ দিতেছিল।

দুই তিনটা ষ্টেশন এইরূপে পার হইলে গোরার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে উপরে উঠিয়া তার বজ্রগর্জ্জনে কহিল, ধিক্ তোমাদের! লজ্জা নাই! ইংরেজটা কঠোর দৃষ্টিতে গোরার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। বাঙালী উত্তর দিল,—লজ্জা! দেশের এই সমস্ত পশুবৎ মূঢ়দের জন্যই লজ্জা!

গোরা মুখ লাল করিয়া কহিল—মূঢ়ের চেয়ে বড় পশু আছে—যার হৃদয় নেই!

বাঙালী রাগ করিয়া কহিল—এ তোমার জায়গা নয়—এ ফাষ্ট ক্লাস!

গোরা কহিল—না, তোমার সঙ্গে একত্রে আমার জায়গা নয়—আমার জায়গা ঐ যাত্রীদের সঙ্গে! কিন্তু আমি বলে যাচ্চি আর আমাকে তোমাদের এই ক্লাসে আসতে বাধ্য কোরো না!

বলিয়া গোরা হন্ হন্ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। ইংরেজ তাহার পর

হইতে আরাম কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলিয়া নভেল পড়ায় মনোনিবেশ করিল। তাহার সহযাত্রী বাঙালী তাহার সঙ্গে পুনরায় আলাপ করিবার চেষ্টা দুই একবার করিল কিন্তু আর তাহা তেমন জমিল না। দেশের সাধারণ লোকের দলে সে নহে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য খানসামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল মুরগির কোনো ডিশ আহারের জন্য পাওয়া যাইবে কি না। খান্‌সামা কহিল, না, কেবল রুটি মাখন চা আছে। শুনিয়া ইংরেজকে শুনাইয়া বাঙালীটি ইংরেজি ভাষায় কহিল— Creature comforts সম্বন্ধে জাহাজের সমস্ত বন্দোবস্ত অত্যন্ত যাচ্ছেতাই।

ইংরেজ কোনো উত্তর করিল না। টেবিলের উপর হইতে তাহার খবরের কাগজ উড়িয়া নীচে পড়িয়া গেল। বাবু চৌকি হইতে উঠিয়া কাগজখানা তুলিয়া দিল কিন্তু থ্যাঙ্কস্ পাইল না।

চন্দননগরে পৌঁছিয়া নামিবার সময় সাহেব সহসা গোরার কাছে গিয়া টুপি একটু তুলিয়া কহিল—নিজের ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত—আশা করি আমাকে ক্ষমা করিবে। বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী যে সাধারণ লোকদের দুর্গতি দেখিয়া বিদেশীকে ডাকিয়া লইয়া নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমানে হাসিতে পারে ইহার আক্রোশ গোরাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেকে সকল প্রকার অপমান ও দুর্ব্ব্যবহারের অধীনে আনিয়াছে—তাহাদিগকে পশুর মত লাঞ্ছিত করিলে তাহারাও তাহা স্বীকার করে এবং সকলের কাছেই তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় ইহার মূলে যে একটা দেশব্যাপী সুগভীর অজ্ঞান আছে তাহার জন্য গোরার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু সকলের চেয়ে তাহার এই বাজিল যে, দেশের এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার

গায়ে লয় না—নিজেকে নির্ম্মম ভাবে পৃথক করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরব বোধ করিতে পারে। আজ তাই শিক্ষিত লোকদের সমস্ত বই-পড়া ও নকল-করা সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করিবার জন্যই গোরা কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া ও একটা নূতন অদ্ভুত কটকি চটি কিনিয়া পরিয়া বুক ফুলাইয়া ব্রাহ্ম বাড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনয় মনে মনে ইহা বুঝিতে পারিল, গোরার আজিকার এই যে সাজ ইহা যুদ্ধসাজ। গোরা কি জানি কি করিয়া বসে এই ভাবিয়া বিনয়ের মনে একটা ভয়, একটা সঙ্কোচ এবং একটা বিরোধের ভাব জাগিয়া উঠিল।

বরদাসুন্দরী যখন বিনয়ের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন তখন সতীশ অগত্যা ছাতের এক কোণে একটা টিনের লাঠিম ঘুরাইয়া নিজের চিত্ত বিনোদনে নিযুক্ত ছিল। গোরাকে দেখিয়া তাহার লাঠিম ঘোরানো বন্ধ হইয়া গেল;—সে ধীরে ধীরে বিনয়ের পাশে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে গোরাকে দেখিতে লাগিল এবং কানে কানে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল ইনিই কি আপনার বন্ধু?—

বিনয় কহিল,—হাঁ।

গোরা ছাতে আসিয়া মুহূর্ত্তের এক অংশ কাল বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আর যেন তাহাকে দেখিতেই পাইল না। পরেশকে নমস্কার করিয়া সে অসঙ্কোচে একটা চৌকি টেবিল হইতে কিছু দূরে সরাইয়া লইয়া বসিল। মেয়েরা যে এখানে কোনো এক জায়গায় আছে তাহা লক্ষ্য করা সে অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য করিল।

বরদাসুন্দরী এই অসভ্যের নিকট হইতে মেয়েদিগকে লইয়া চলিয়া যাইবেন স্থির করিতেছিলেন এমন সময় পরেশ তাঁহাকে কহিলেন—এঁর নাম গৌরমোহন, আমার বন্ধু কৃষ্ণদয়ালের ছেলে।

তখন গোরা তাঁহার দিকে ফিরিয়া নমস্কার করিল। যদিও বিনয়ের

সঙ্গে আলোচনায় সুচরিতা গোরার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল তবু এই অভ্যাগতটিই যে বিনয়ের বন্ধু তাহা সে বুঝে নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই গোরার প্রতি তাহার একটা আক্রোশ জন্মিল। ইংরাজি শেখা কোনো লোকের মধ্যে গোঁড়া হিঁদুয়ানি দেখিলে সহ্য করিতে পারে সুচরিতার সেরূপ সংস্কার ও সহিষ্ণুতা ছিল না।

পরেশ গোরার কাছে তাঁহার বাল্যবন্ধু কৃষ্ণদয়ালের খবর লইলেন। তাহার পরে নিজেদের ছাত্র অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া বলিলেন—তখনকার দিনে কলেজে আমরা দুজনেই এক জুড়ি ছিলুম—দুজনেই মস্ত কালাপাহাড়—কিছুই মান্‌তুম না—হোটেলে খাওয়াটাই একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে মনে করতুম। দুজনে কতদিন সন্ধ্যার সময়ে গোলদিঘিতে বসে মুসলমান দোকানের কাবাব খেয়ে তার পরে কি রকম করে আমরা হিন্দু সমাজের সংস্কার করব রাত দুপুর পর্য্যন্ত তারই আলোচনা করতুম।

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন তিনি কি করেন?

গোরা কহিল—এখন তিনি হিন্দু আচার পালন করেন।

বরদা কহিলেন—লজ্জা করে না?—রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল।

গোরা একটু হাসিয়া কহিল—লজ্জা করা দুর্ব্বল স্বভাবের লক্ষণ। কেউ কেউ বাপের পরিচয় দিতে লজ্জা করে।

বরদা। আগে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না?

গোরা। আমিও ত এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলুম।

বরদা। এখন আপনি সাকার উপাসনায় বিশ্বাস করেন?

গোরা। আকার জিনিষটাকে বিনা কারণে অশ্রদ্ধা করব আমার মনে এমন কুসংস্কার নেই। আকারকে গাল দিলেই কি সে ছোট হয়ে যায়? আকারের রহস্য কে ভেদ করতে পেরেচে?

পরেশ বাবু মৃদু স্বরে কহিলেন—আকার যে অন্তবিশিষ্ট।

গোরা কহিল—অন্ত না থাক্‌লে, যে প্রকাশই হয় না। অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেচেন—নইলে তাঁর প্রকাশ কোথায়? যার প্রকাশ নেই তার সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।

বরদা মাথা নাড়িয়া কহিলেন—নিরাকারের চেয়ে আকার সম্পূর্ণ আপনি এমন কথা বলেন?

গোরা। আমি যদি নাও বল্‌তুম তাতে কিছুই আস্‌ত যেত না। জগতে আকার আমার বলার উপর নির্ভর করচে না। নিরাকারই যদি যথার্থ পরিপূর্ণতা হত তবে আকার কোথাও স্থান পেত না।

সুচরিতার অত্যন্ত ইচ্ছা করিতে লাগিল কেহ এই উদ্ধত যুবককে তর্কে একেবারে পরাস্ত লাঞ্ছিত করিয়া দেয়। বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া গোরার কথা শুনিতেছে দেখিয়া তাহার মনে মনে রাগ হইল। গোরা এতই জোরের সঙ্গে কথা বলিতেছিল যে, এই জোরকে নত করিয়া দিবার জন্য সুচরিতার মনের মধ্যেও যেন জোর করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বেহারা চায়ের জন্য কাৎলিতে গরম জল আনিল। সুচরিতা উঠিয়া চা তৈরি করিতে নিযুক্ত হইল। বিনয় মাঝে মাঝে চকিতের মত সুচরিতার মুখের দিকে চাহিয়া লইল। যদিচ উপাসনা সম্বন্ধে গোরার সঙ্গে বিনয়ের মতের বিশেষ পার্থক্য ছিল না তবু গোরা যে এই ব্রাহ্ম পরিবারের মাঝখানে অনাহূত আসিয়া বিরুদ্ধ মত এমন অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া যাইতেছে ইহাতে বিনয়কে পীড়া দিতে লাগিল। গোরার এই প্রকার যুদ্ধোদ্যত আচরণের সহিত তুলনা করিয়া বৃদ্ধ পরেশের একটি আত্মসমাহিত প্রশান্ত ভাব, সকল প্রকার তর্কবিতর্কের অতীত একটি গভীর প্রসন্নতা বিনয়ের হৃদয়কে ভক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল—মতামত কিছুই নয়, অন্তঃ-

করণের মধ্যে পূর্ণতা, স্তব্ধতা ও আত্মপ্রসাদ ইহাই সকলের চেয়ে দুর্লভ। কথাটার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা তাহা লইয়া যতই তর্ক কর না কেন প্রাপ্তির মধ্যে যেটা সত্য সেইটাই আসল। পরেশ সকল কথা-বার্ত্তার মধ্যে মধ্যে এক একবার চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে তলাইয়া লইতেছিলেন—ইহা তাঁহার অভ্যাস—তাঁহার সেই সময়কার অন্তর্নিবিষ্ট শান্ত মুখশ্রী বিনয় একদৃষ্টে দেখিতেছিল। গোরা যে এই বৃদ্ধের প্রতি ভক্তি অনুভব করিয়া নিজের বাক্য সংযত করিতেছিল না ইহাতে বিনয় বড়ই আঘাত পাইতেছিল।

সুচরিতা কয়েক পেয়ালা চা তৈরি করিয়া পরেশের মুখের দিকে চাহিল। কাহাকে চা খাইতে অনুরোধ করিবে না করিবে তাহা লইয়া তাহার মনে দ্বিধা হইতেছিল। বরদাসুন্দরী গোরার দিকে চাহিয়াই একেবারে বলিয়া বসিলেন—আপনি এ সমস্ত কিছু খাবেন না বুঝি!

গোরা কহিল—না।

বরদা। কেন? জাত যাবে?

গোরা বলিল—হাঁ।

বরদা। আপনি জাত মানেন?

গোরা। জাত কি আমার নিজের তৈরি যে মান্‌ব না? সমাজকে যখন মানি তখন জাতও মানি।

বরদা। সমাজকে কি সব কথায় মান্‌তেই হবে?

গোরা। না মান্‌লে সমাজকে ভাঙা হয়।

বরদা। ভাঙলে দোষ কি?

গোরা। যে ডালে সকলে মিলে বসে আছি সে ডাল্‌ কাট্‌লেই বা দোষ কি?

সুচরিতা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল—মা, মিছে তর্ক করে লাভ কি? উনি আমাদের ছোঁওয়া খাবেন না।

গোরা সুচরিতার মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি একবার স্থাপিত করিল। সুচরিতা বিনয়ের দিকে চাহিয়া ঈষৎ সংশয়ের সহিত কহিল —আপনি কি—

বিনয় কোনো কালে চা খায় না। মুসলমানের তৈরি পাঁউরুটি বিস্কুট খাওয়াও অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছে কিন্তু আজ তাহার না খাইলে নয়। সে জোর করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—হাঁ খাব বই কি! বলিয়া গোরার মুখের দিকে চাহিল। গোরার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ একটু কঠোর হাসি দেখা দিল। বিনয়ের মুখে চা তিতো ও বিস্বাদ লাগিল কিন্তু সে খাইতে ছাড়িল না। বরদাসুন্দরী মনে মনে বলিলেন—আহা, এই বিনয় ছেলেটি বড় ভাল।

তখন তিনি গোরার দিক হইতে একেবারেই মুখ ফিরাইয়া বিনয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তাই দেখিয়া পরেশ আস্তে আস্তে গোরার কাছে তার চৌকি টানিয়া লইয়া তার সঙ্গে মৃদুস্বরে আলাপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় রাস্তা দিয়া চীনের বাদামওয়ালা গরম চীনাবাদাম ভাজা হাঁকিয়া যাইতেই লীলা হাততালি দিয়া উঠিল—কহিল—সুধীর দা, চীনেবাদাম ডাক।

বলিতেই ছাদের বারান্দা ধরিয়া সতীশ চীনাবাদামওয়ালাকে ডাকিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আর একটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সকলেই পানু বাবু বলিয়া সম্ভাষণ করিল কিন্তু তাঁহার আসল নাম হারানচন্দ্র নাগ। দলের মধ্যে ইঁহার বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। যদিও স্পষ্ট করিয়া কোনো পক্ষই কোনো কথাই বলে নাই তথাপি ইঁহার সঙ্গেই সুচরিতার বিবাহ হইবে এই প্রকারের একটা সম্ভাবনা আকাশে ভাসিতেছিল। পানু বাবুর হৃদয় যে সুচরিতার

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে কাহারো সন্দেহ ছিল না এবং ইহাই লইয়া মেয়েরা সুচরিতাকে সর্ব্বদা ঠাট্টা করিতে ছাড়িত না।

পানু বাবু ইস্কুলে মাষ্টারি করেন। বরদাসুন্দরী তাহাকে ইস্কুলমাষ্টার-মাত্র জানিয়া বড় শ্রদ্ধা করেন না। তিনি ভাবে দেখান যে পানু বাবু যে, তাঁহার কোনো মেয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই সে ভালই হইয়াছে। তাঁহার ভাবী জামাতারা ডেপুটিগিরির লক্ষ্য-বেধরূপ অতি দুঃসাধ্য পণে আবদ্ধ।

সুচরিতা হারানকে এক পেয়ালা চা অগ্রসর করিয়া দিতেই লাবণ্য দূর হইতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। সেই হাসিটুকু বিনয়ের অগোচর রহিল না। অতি অল্প কালের মধ্যেই দুই একটা বিষয়ে বিনয়ের নজর বেশ একটু তীক্ষ্ণ এবং সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে;—দর্শন-নৈপুণ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে সে প্রসিদ্ধ ছিল না।

এই যে হারান ও সুধীর এ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে অনেক দিন হইতে পরিচিত—এবং এই পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে তাহারা মেয়েদের মধ্যে পরস্পর ইঙ্গিতের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে বিনয়ের বুকের মধ্যে ইহা বিধাতার অবিচার বলিয়া বাজিতে লাগিল।

এদিকে হারানের অভ্যাগমে সুচরিতার মন যেন একটু আশান্বিত হইয়া উঠিল। গোরার স্পর্দ্ধা যেমন করিয়া হোক্ কেহ দমন করিয়া দিলে তবে তাহার গায়ের জ্বালা মেটে। অন্য সময়ে হারানের তার্কিকতায় সে অনেকবার বিরক্ত হইয়াছে কিন্তু আজ এই তর্কবীরকে দেখিয়া সে আনন্দের সঙ্গে তাঁহাকে চা ও পাঁউরুটির রসদ জোগাইয়া দিল।

পরেশ কহিলেন—পানু বাবু, ইনি আমাদের—

হারান কহিলেন—ওঁকে বিলক্ষণ জানি। উনি এক সময়ে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের একজন খুব উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

এই বলিয়া গোরার সঙ্গে কোনো প্রকার আলাপের চেষ্টা না করিয়া হারান চায়ের পেয়ালার প্রতি মন দিলেন।

সেই সময়ে দুই একজন মাত্র বাঙালী সিভিল সার্ভিস উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আসিয়াছেন। সুধীর তাঁহাদেরই একজনের অভ্যর্থনার গল্প তুলিল। হারান কহিলেন, পরীক্ষায় বাঙালী যতই পাস করুন বাঙালীর দ্বারা কোন কাজ হবে না।

কোনো বাঙালী ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ্ ডিষ্ট্রিক্টের ভার লইয়া যে কখনো কাজ চালাইতে পারিবে না ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য হারান বাঙালীর চরিত্রের নানা দোষ ও দুর্ব্বলতার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে গোরার মুখ লাল হইয়া উঠিল—সে তাহার সিংহনাদকে যথাসাধ্য রুদ্ধ করিয়া কহিল—এই যদি সত্যই আপনার মত হয় তবে আপনি আরামে এই টেবিলে বসে বসে পাঁউরুটি চিবচ্চেন কোন্ লজ্জায়!

হারান বিস্মিত হইয়া ভুরু তুলিয়া কহিলেন, কি করতে বলেন?

গোরা। হয় বাঙালী-চরিত্রের কলঙ্ক মোচন করুন নয় গলায় দড়ি দিয়ে মরুনগে। আমাদের জাতের দ্বারা কখনো কিছুই হবে না একথা কি এতই সহজে বল্‌বার? আপনার গলায় রুটি বেধে গেল না?

হারান। সত্য কথা বল্‌ব না?

গোরা। রাগ করবেন না, কিন্তু এ কথা যদি আপনি যথার্থই সত্য বলে জান্‌তেন তাহলে অমন আরামে অত আস্ফালন করে বল্‌তে পারতেন না। কথাটি মিথ্যে জানেন বলেই আপনার মুখ দিয়ে বেরল—হারান বাবু মিথ্যা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরো পাপ, এবং স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মত পাপ অল্পই আছে।

হারান ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। গোরা কহিল, আপনি

একলাই কি আপনার সমস্ত স্বজাতির চেয়ে বড়? রাগ আপনি করবেন—আর আমাদের পিতৃপিতামহের হয়ে আমরা সমস্ত সহ্য করব!

ইহার পর হারানের পক্ষে হার মানা আরো শক্ত হইয়া উঠিল। তিনি আরো সুর চড়াইয়া বাঙালীর নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাঙালী-সমাজের নানাপ্রকার প্রথার উল্লেখে কহিলেন—এ সমস্ত থাকৃতে বাঙালীর কোনও আশা নাই।

গোরা কহিল—আপনি যাকে কুপ্রথা বলচেন সে কেবল ইংরেজি বই মুখস্থ করে বল্‌চেন—নিজে ও সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ইংরেজের সমস্ত কুপ্রথাকেও যখন আপনি ঠিক এমনি করেই অবজ্ঞা করতে পারবেন তখন এ সম্বন্ধে কথা কবেন।

পরেশ এই প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ক্রুদ্ধ হারান নিবৃত্ত হইলেন না। সূর্য্য অস্ত গেল; মেঘের ভিতর হইতে একটা অপরূপ আরক্ত আভায় সমস্ত আকাশ লাবণ্যময় হইয়া উঠিল;—সমস্ত তর্কের কোলাহল ছাপাইয়া বিনয়ের প্রাণের ভিতরে একটা সুর বাজিতে লাগিল। পরেশ তাঁহার সায়ংকালীন উপাসনায় মন দিবার জন্য ছাত হইতে উঠিয়া গিয়া বাগানের প্রান্তে একটা বড় চাঁপা গাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে গিয়া বসিলেন।

গোরার প্রতি বরদাসুন্দরীর মন যেমন বিমুখ হইয়াছিল হারানও তেমনি তাঁহার প্রিয় ছিল না। এই উভয়ের তর্ক যখন তাঁহার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল তিনি বিনয়কে ডাকিয়া কহিলেন,—আসুন বিনয় বাবু আমরা ঘরে যাই।

বরদাসুন্দরীর এই সস্নেহ পক্ষপাত স্বীকার করিয়া বিনয়কে ছাত ছাড়িয়া অগত্যা ঘরের মধ্যে যাইতে হইল। বরদা তাঁহার মেয়েদের ডাকিয়া লইলেন। সতীশ তর্কের গতিক দেখিয়া পূর্ব্বেই চীনাবাদামের কিঞ্চিৎ অংশ সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষুদে কুকুরকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্ধান করিয়াছিল।

বরদাসুন্দরী বিনয়ের কাছে তাঁহার মেয়েদের গুণপনার পরিচয় দিতে লাগিলেন। লাবণ্যকে বলিলেন,—তোমার সেই খাতাটা এনে বিনয় বাবুকে দেখাও না।

বাড়ির নূতন আলাপীদের এই খাতা দেখানো লাবণ্যর অভ্যাস হইয়াছিল। এমন কি সে ইহার জন্য মনে মনে অপেক্ষা করিয়া থাকিত। আজ তর্ক উঠিয়া পড়াতে সে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

বিনয় খাতা খুলিয়া দেখিল, তাহাতে কবি মুর এবং লংফেলোর ইংরেজি কবিতা লেখা। হাতের অক্ষরে যত্ন এবং পারিপাট্য প্রকাশ পাইতেছে। কবিতাগুলির শিরোনামা এবং আরম্ভের অক্ষর রোমান ছাঁদে লিখিত।

এই লেখাগুলি দেখিয়া বিনয়ের মনে অকৃত্রিম বিস্ময় উৎপন্ন হইল। তখনকার দিনে মুরের কবিতা খাতায় কপি করিতে পারা মেয়েদের পক্ষে কম বাহাদুরী ছিল না। বিনয়ের মন যথোচিত অভিভূত হইয়াছে দেখিয়া বরদাসুন্দরী তাঁহার মেঝোমেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— ললিতা, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, তোমার সেই কবিতাটা—

ললিতা শক্ত হইয়া উঠিয়া কহিল—না, মা, আমি পারব না। সে আমার ভাল মনে নেই। বলিয়া সে দূরে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতে লাগিল।

বরদাসুন্দরী বিনয়কে বুঝাইয়া দিলেন, মনে সমস্তই আছে কিন্তু ললিতা বড় চাপা, বিদ্যা বাহির করিতে চায় না। এই বলিয়া ললিতার আশ্চর্য্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় স্বরূপ দুই একটা ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, ললিতা শিশুকাল হইতেই এইরূপ; কান্না পাইলেও মেয়ে চোখের জল ফেলিতে চাহিত না। এ সম্বন্ধে বাপের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আলোচনা করিলেন।

এবার লীলার পালা। তাহাকে অনুরোধ করিতেই সে প্রথমে

খুব খানিকটে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া তাহার পরে কল-টেপা আর্গিনের মত অর্থ না বুঝিয়া "Twinkle twinkle little stars" কবিতাটা গড় গড় করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল।

এইবার সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে জানিয়া ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের ছাতে তর্ক তখন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। হারান তখন রাগের মাথায় তর্ক ছাড়িয়া গালি দিবার উপক্রম করিতেছেন। হারানের অসহিষ্ণুতায় লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া সুচরিতা গোরার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। হারানের পক্ষে সেটা কিছুমাত্র সান্ত্বনাজনক বা শান্তিকর হয় নাই।

আকাশে অন্ধকার এবং শ্রাবণের মেঘ ঘনাইয়া আসিল; বেলফুলের মালা হাঁকিয়া রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা চলিয়া গেল। সম্মুখের রাস্তায় কৃষ্ণচূড়া গাছের পল্লবপুঞ্জের মধ্যে জোনাকি জ্বলিতে লাগিল। পাশের বাড়ির পুকুরের জলের উপর একটা নিবিড় কালিমা পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যা উপাসনা শেষ করিয়া পরেশ ছাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোরা ও হারান উভয়েই লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইল। গোরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—রাত হয়ে গেছে আজ তবে আসি।

বিনয়ও ঘর হইতে বিদায় লইয়া ছাতে আসিয়া দেখা দিল। পরেশ গোরাকে কহিলেন, দেখ, তোমার যখন ইচ্ছা এখানে এসো। কৃষ্ণদয়াল আমার ভাইয়ের মত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এখন আমার মতের মিল নেই—দেখাও হয় না—চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ আছে কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুত্ব রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে থাকে। কৃষ্ণদয়ালের সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অতি নিকটের।

পরেশের সস্নেহ শান্ত কণ্ঠস্বরে গোরার এতক্ষণকার তর্কতাপ যেন গেল। প্রথমে আসিয়া গোরা পরেশকে বড় একটা খাতির

করে নাই। যাইবার সময় যথার্থ ভক্তির সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গেল। সুচরিতাকে গোরা কোনো প্রকার বিদায় সম্ভাষণ করিল না। সুচরিতা যে সম্মুখে আছে ইহা কোনো আচরণের দ্বারা স্বীকার করাকেই সে অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য করিল। বিনয় পরেশকে নতভাবে প্রণাম করিয়া সুচরিতার দিকে ফিরিয়া তাহাকে নমস্কার করিল এবং লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি গোরার অনুসরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

হারান এই বিদায়সম্ভাষণ ব্যাপার এড়াইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া টেবিলের উপরকার একটি ব্রহ্মসঙ্গীত বই লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

বিনয় ও গোরা চলিয়া যাইবামাত্র হারান দ্রুতপদে ছাতে আসিয়া পরেশকে কহিলেন—দেখুন সকলের সঙ্গেই মেয়েদের আলাপ করিয়ে দেওয়া আমি ভাল মনে করিনে।

সুচরিতা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাই সে ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে পারিল না; কহিল, বাবা যদি সে নিয়ম মান্‌তেন তাহ'লে ত আপনার সঙ্গেও আমাদের আলাপ হতে পারত না।

হারান কহিলেন—আলাপ পরিচয় নিজেদের সমাজের মধ্যেই বদ্ধ হলে ভাল হয়।

পরেশ হাসিয়া কহিলেন—আপনি পারিবারিক অন্তঃপুরকে, আর-একটুখানি বড় করে একটা সামাজিক অন্তঃপুর বানাতে চান। কিন্তু আমি মনে করি নানা মতের ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেয়েদের মেশা উচিত; নইলে তাদের বুদ্ধিকে জোর করে খর্ব্ব করে রাখা হয়। এতে ভয় কিম্বা লজ্জার কারণ ত কিছুই দেখিনে।

হারান। ভিন্ন মতের লোকের সঙ্গে মেয়েরা মিশবে না এমন কথা বলিনে কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় সে ভদ্রতা যে এঁরা জানেন না।

পরেশ। না, না, বলেন কি! ভদ্রতার অভাব আপনি যাকে বল্‌চেন সে একটা সঙ্কোচ মাত্র—মেয়েদের সঙ্গে না মিশ্‌লে সেটা কেটে যায় না।

১২

সে দিন তর্কে গোরাকে অপদস্থ করিয়া সুচরিতার সম্মুখে নিজের জয়পতাকা তুলিয়া ধরিবার জন্য হারানের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, গোড়ায় সুচরিতাও তাহার আশা করিয়াছিল। কিন্তু দৈবক্রমে ঠিক তার বিপরীত ঘটিল। ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক মতে সুচরিতার সঙ্গে গোরার মিল ছিল না কিন্তু স্বদেশের প্রতি মমত্ব, স্বজাতির জন্য বেদনা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। যদিচ দেশের ব্যাপার লইয়া সে সর্ব্বদা আলোচনা করে নাই কিন্তু সে দিন স্বজাতির নিন্দায় গোরা যখন অকস্মাৎ বজ্রনাদ করিয়া উঠিল তখন সুচরিতার সমস্ত মনের মধ্যে তাহার অনুকূল প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। এমন বলের সঙ্গে এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দেশের সম্বন্ধে কেহ তাহার সম্মুখে কথা বলে নাই।

তাহার পরে হারান যখন গোরা ও বিনয়ের অসাক্ষাতে ক্ষুদ্র ঈর্ষাবশত তাঁহাদের প্রতি অভদ্রতার অপবাদ আরোপ করিলেন তখনও এই অন্যায় ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে সুচরিতাকে গোরাদের পক্ষে দাঁড়াইতে হইল।

অথচ গোরার বিরুদ্ধে সুচরিতার মনের বিদ্রোহ একেবারেই যে শান্ত হইয়াছে তাহাও নহে। গোরার একপ্রকার গায়ে-পড়া উদ্ধত হিন্দুয়ানি তাহাকে এখনো মনে মনে আঘাত করিতেছিল। সে একরকম করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল এই হিন্দুয়ানির মধ্যে একটা প্রতিকূলতার ভাব আছে—ইহা সহজ প্রশান্ত নহে—ইহা নিজের ভক্তি বিশ্বাসের মধ্যে পর্য্যাপ্ত নহে—ইহা অন্যকে আঘাত করিবার জন্য সর্ব্বদাই উগ্রভাবে উদ্যত।

সে দিন সন্ধ্যায় সকল কথায় সকল কাজে, আহার করিবার কালে, লীলাকে গল্প বলিবার সময় ক্রমাগতই সুচরিতার মনের তলদেশে একটা কিসের বেদনা কেবল পীড়া দিতে লাগিল—তাহা কোনোমতেই সে দূর করিতে পারিল না। কাঁটা কোথায় আছে তাহা জানিতে পারিলে তবে কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে পারা যায়। মনের কাঁটাটি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সে দিন রাত্রে সুচরিতা সেই গাড়িবারান্দার ছাতে একলা বসিয়া রহিল।

রাত্রে স্নিগ্ধ অন্ধকার দিয়া সে নিজের মনের অকারণ তাপ যেন মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কোনো ফল হইল না। তাহার বুকের অনির্দ্দেশ্য বোঝাটার জন্য তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু কান্না আসিল না।

একজন অপরিচিত যুবা কপালে তিলক কাটিয়া আসিয়াছে অথবা তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া তাহার অহঙ্কার নত করা গেল না এই জন্যই সুচরিতা এতক্ষণ ধরিয়া পীড়া বোধ করিতেছে ইহার অপেক্ষা অদ্ভুত হাস্যকর কিছুই হইতে পারে না। এই কারণটাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মন হইতে সে বিদায় করিয়া দিল। তখন আসল কারণটা মনে পড়িল এবং মনে পড়িয়া তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইল। আজ তিন চার ঘণ্টা সুচরিতা সেই যুবকের সম্মুখেই বসিয়া ছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তর্কেও যোগ দিয়াছে অথচ সে তাহাকে একেবারে যেন লক্ষ্য মাত্রই করে নাই ;—যাবার সময়েও তাহাকে সে যেন চোখে দেখিতেই পাইল না। এই পরিপূর্ণ উপেক্ষাই যে সুচরিতাকে গভীর ভাবে বিঁধিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বাহিরের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অনভ্যাস থাকিলে যে একটা সঙ্কোচ জন্মে, বিনয়ের ব্যবহারে যে একটি সঙ্কোচের পরিচয় পাওয়া যায়—সেই সঙ্কোচের মধ্যে একটা সলজ্জ নম্রতা আছে। গোরার আচরণে তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না।

তাহার সেই কঠোর এবং প্রবল ঔদাসীন্য সহ্য করা বা তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া সুচরিতার পক্ষে আজ কেন এমন অসম্ভব হইয়া উঠিল? এত বড় উপেক্ষার সম্মুখেও সে যে আত্মসম্বরণ না করিয়া তর্কে যোগ দিয়াছিল, নিজের এই প্রগল্‌ভতায় সে যেন মরিয়া যাইতেছিল। হারানের অন্যায় তর্কে একবার যখন সুচরিতা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন গোরা তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল; সে চাহনিতে সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না—কিন্তু সে চাহনির ভিতর কি ছিল তাহাও বোঝা শক্ত। তখন কি সে মনে মনে বলিতেছিল—এ মেয়েটি কি নির্লজ্জ, অথবা, ইহার অহঙ্কার ত কম নয়, পুরুষমানুষের তর্কে এ অনাহূত যোগ দিতে আসে? তাহাই যদি সে মনে করিয়া থাকে তাহাতে কি আসে যায়? কিছুই আসে যায় না কিন্তু তবু সুচরিতা অত্যন্ত পীড়া বোধ করিতে লাগিল। এ সমস্তই ভুলিয়া যাইতে, মুছিয়া ফেলিতে সে একান্ত চেষ্টা করিল কিন্তু কোনোমতেই পারিল না। গোরার উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল—গোরাকে সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন উদ্ধত যুবক বলিয়া সমস্ত মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে চাহিল কিন্তু তবু সেই বিপুলকায় বজ্রকণ্ঠ পুরুষের সেই নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টির স্মৃতির সম্মুখে সুচরিতা মনে মনে অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল—কোনোমতেই সে নিজের গৌরব খাড়া করিয়া রাখিতে পারিল না।

এমনি করিয়া নিজের মনখানা লইয়া টানাছেঁড়া করিতে করিতে রাত্রি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বাতি নিবাইয়া দিয়া বাড়ির সকলেই ঘুমাইতে গিয়াছে। সদর দরজা বন্ধ হইবার শব্দ হইল—বোঝা গেল বেহারা রান্না খাওয়া সারিয়া এইবার শুইতে যাইবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় ললিতা তাহার রাত্রির কাপড় পরিয়া ছাদে আসিল। সুচরিতাকে কিছুই না বলিয়া তাহার পাশ দিয়া গিয়া ছাদের এক কোণে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। সুচরিতা মনে মনে একটু হাসিল, বুঝিল

ললিতা তাহার প্রতি অভিমান করিয়াছে। আজ যে তাহার ললিতার সঙ্গে শুইবার কথা ছিল তাহা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভুলিয়া গেছি বলিলে ললিতার কাছে অপরাধ ক্ষালন হয় না—কারণ, ভুলিতে পারাটাই সকলের চেয়ে গুরুতর অপরাধ। সে যে যথা সময়ে প্রতিশ্রুতি মনে করাইয়া দিবে তেমন মেয়ে নয়। এতক্ষণ সে শক্ত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল—যতই সময় যাইতেছিল ততই তাহার অভিমান তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে যখন নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল তখন সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া কেবল নীরবে জানাইতে আসিল যে আমি এখনো জাগিয়া আছি।

সুচরিতা চৌকি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে ললিতার কাছে আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল—কহিল, ললিতা, লক্ষ্মী ভাই, রাগ কোরো না ভাই!

ললিতা সুচরিতার হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—না, রাগ কেন করব? তুমি বোসো না।

সুচরিতা তাহার হাত টানিয়া লইয়া কহিল—চল ভাই, শুতে যাই।

ললিতা কোনো উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে সুচরিতা তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া শোবার ঘরে লইয়া গেল।

ললিতা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—কেন তুমি এত দেরি করলে? জান এগারটা বেজেছে। আমি সমস্ত ঘড়ি শুনেছি। এখনি ত তুমি ঘুমিয়ে পড়বে।

সুচরিতা ললিতাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, আজ আমার অন্যায় হয়ে গেছে ভাই।

যেমনি অপরাধ স্বীকার করা ললিতার আর রাগ রহিল না। একেবারে নরম হইয়া কহিল—এতক্ষণ একলা বসে কার কথা ভাবছিলে দিদি? পানু বাবুর কথা?

তাহাকে তর্জ্জনি দিয়া আঘাত করিয়া সুচরিতা কহিল—দূর!

পানু বাবুকে ললিতা সহিতে পারিত না। এমন কি, তাহার অন্য বোনের মত তাহাকে লইয়া সুচরিতাকে ঠাট্টা করাও তাহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। পানু বাবু সুচরিতাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এ কথা মনে করিলে তাহার রাগ হইত।

একটুখানি চুপ করিয়া ললিতা কথা তুলিল—আচ্ছা দিদি বিনয় বাবু লোকটি কিন্তু বেশ। না?

সুচরিতার মনের ভাবটা যাচাই করিবার উদ্দেশ্য যে এ প্রশ্নের মধ্যে ছিল না তাহা বলিতে পারি না।

সুচরিতা কহিল—হাঁ, বিনয় বাবু লোকটি ভাল বইকি—বেশ ভাল মানুষ।

ললিতা যে সুর আশা করিয়াছিল তাহা ত সম্পূর্ণ বাজিল না। তখন সে আবার কহিল—কিন্তু যাই বল দিদি, আমার গৌরমোহন বাবুকে একেবারেই ভাল লাগে নি। কি রকম কটা কটা রং, কাটখোট্টা চেহারা, পৃথিবীর কাউকে যেন গ্রাহ্যই করে না। তোমার কি রকম লাগ্‌ল?

সুচরিতা কহিল—বড় বেশি রকম হিঁদুয়ানি!

ললিতা কহিল—না, না, আমাদের মেসোমশায়ের ত খুবই হিঁদুয়ানি কিন্তু সে আর এক রকমের। এ যেন—ঠিক বল্‌তে পারিনে কি রকম।

সুচরিতা হাসিয়া কহিল—কি রকমই বটে! বলিয়া গোরার সেই উচ্চ শুভ্র ললাটে তিলক কাটা মূর্ত্তি মনে আনিয়া সুচরিতা রাগ করিল। রাগ করিবার কারণ এই যে ঐ তিলকের দ্বারা গোরা কপালে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে যে তোমাদের হইতে আমি পৃথক্। সেই পার্থক্যের প্রচণ্ড অভিমানকে সুচরিতা যদি ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিত তবেই তাহার গায়ের জ্বালা মিটিত।

আলোচনা বন্ধ হইল, ক্রমে দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি যখন

দুইটা সুচরিতা জাগিয়া দেখিল, বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে; মাঝে মাঝে তাহাদের মশারির আবরণ ভেদ করিয়া বিদ্যুতের আলো চমকিয়া উঠিতেছে; ঘরের কোণে যে প্রদীপ ছিল সেটা নিবিয়া গেছে। সেই রাত্রির নিস্তব্ধতায়, অন্ধকারে, অবিশ্রাম বৃষ্টির শব্দে, সুচরিতার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইতে লাগিল। সে এপাশ ওপাশ করিয়া ঘুমাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল—পাশেই ললিতাকে গভীর সুপ্তিতে মগ্ন দেখিয়া তাহার ঈর্ষা জন্মিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। বিরক্ত হইয়া সে বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। খোলা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সম্মুখের ছাতের দিকে চাহিয়া রহিল—মাঝে মাঝে বাতাসের বেগে গায়ে বৃষ্টির ছাঁট লাগিতে লাগিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ সন্ধ্যাবেলাকার সমস্ত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া তাহার মনে উদয় হইল। সেই সূর্য্যাস্তরঞ্জিত গাড়িবারান্দার উপর গোরার উদ্দীপ্ত মুখ স্পষ্ট ছবির মত তাহার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল এবং তখন তর্কের যে সমস্ত কথা কানে শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল সে সমস্তই গোরার গভীর প্রবল কণ্ঠস্বরে জড়িত হইয়া আগাগোড়া তাহার মনে পড়িল। কানে বাজিতে লাগিল—আপনারা যাদের অশিক্ষিত বলেন, আমি তাদেরই দলে—আপনারা যাকে কুসংস্কার বলেন আমার সংস্কার তাই। যতক্ষণ না আপনি দেশকে ভালবাসবেন এবং দেশের লোকের সঙ্গে এক জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মুখ থেকে দেশের নিন্দা আমি এক বর্ণও সহ্য করতে পারব না। এ কথার উত্তরে পানু বাবু কহিলেন—এমন করলে দেশের সংশোধন হবে কি করে? গোরা গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—সংশোধন! সংশোধন ঢের পরের কথা। সংশোধনের চেয়েও বড় কথা ভালবাসা, শ্রদ্ধা। আগে আমরা এক হব তাহলেই সংশোধন ভিতর থেকে আপনিই হবে। আপনারা যে পৃথক হয়ে দেশকে খণ্ড খণ্ড করতে চান,—আপনারা বলেন দেশের কুসংস্কার আছে অতএব আমরা সুসংস্কারীর দল

আলাদা হয়ে থাকব। আমি এই কথা বলি, আমি কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে কারো থেকে পৃথক হব না এই আমার সকলের চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা —তারপর এক হলে কোন্ সংস্কার থাকবে কোন্ সংস্কার যাবে তা আমার দেশই জানে, এবং দেশের যিনি বিধাতা তিনিই জানেন! পানু বাবু কহিলেন,—এমন সকল প্রথা ও সংস্কার আছে যা দেশকে এক হতে দিচ্চে না। গোরা কহিল—যদি এই কথা মনে করেন যে আগে সেই সমস্ত প্রথা ও সংস্কারকে একে একে উৎপাটিত করে ফেলবেন তার পরে দেশ এক হবে তবে সমুদ্রকে ছেঁচে ফেলে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করা হবে। অবজ্ঞা ও অহঙ্কার দূর করে নম্র হয়ে ভালবেসে নিজেকে অন্তরের সঙ্গে সকলের করুন, সেই ভালবাসার কাছে সহস্র ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সহজেই হার মানবে। সকল দেশের সকল সমাজেই ত্রুটি ও অপূর্ণতা আছে কিন্তু দেশের লোকে স্বজাতির প্রতি ভালবাসার টানে যতক্ষণ এক থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার বিষ কাটিয়ে চলতে পারে। পচ্‌বার কারণ হাওয়ার মধ্যেই আছে। কিন্তু বেঁচে থাকলেই সেটা কাটিয়ে চলি, মরে গেলেই পচে উঠি। আমি আপনাকে বল্‌চি সংশোধন করতে যদি আসেন ত আমরা সহ্য করব না, তা আপনারাই হোন বা মিশনারিই হোন। পানু বাবু কহিলেন—কেন করবেন না? গোরা কহিল—করব না তার কারণ আছে। বাপ মায়ের সংশোধন সহ্য করা যায় কিন্তু পাহারাওয়ালার সংশোধনে শোধনের চেয়ে অপমান অনেক বেশি; সেই সংশোধন সহ্য করতে হলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। আগে আত্মীয় হবেন তার পরে সংশোধক হবেন—নইলে আপনার মুখের ভাল কথাতেও আমাদের অনিষ্ট হবে।—এমনি করিয়া একটি একটি সমস্ত কথা আগাগোড়া সুচরিতার মনে উঠিতে লাগিল এবং এই সঙ্গে মনের মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য বেদনাও কেবলি পীড়া দিতে থাকিল। শ্রান্ত হইয়া সুচরিতা বিছানায় ফিরিয়া আসিল এবং চোখের উপর করতল চাপিয়া সমস্ত

ভাবনাকে ঠেলিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার মুখ ও কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল এবং এই সমস্ত আলোচনা ভাঙিয়া চুরিয়া তাহার মনের মধ্যে কেবলই আনাগোনা করিতে থাকিল।

১৩

বিনয় ও গোরা পরেশের বাড়ী হইতে রাস্তায় বাহির হইলে বিনয় কহিল—গোরা একটু আস্তে আস্তে চল ভাই—তোমার পা দুটো আমাদের চেয়ে অনেক বড়—ওর চালটা একটু খাট না করলে তোমার সঙ্গে যেতে আমরা হাঁপিয়ে পড়ি।

গোরা কহিল—আমি একলাই যেতে চাই, আমার আজ অনেক কথা ভাববার আছে।

বলিয়া তাহার স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সে বেগে চলিয়া গেল।

বিনয়ের মনে আঘাত লাগিল। সে আজ গোরার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। সে সম্বন্ধে গোরার কাছে তিরস্কার ভোগ করিলে সে খুসি হইত। একটা ঝড় হইয়া গেলেই তাহাদের চিরদিনের বন্ধুত্বের আকাশ হইতে গুমট কাটিয়া যাইত এবং সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত।

গোরা যে বিনয়ের সঙ্গ ছাড়িয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল সে রাগকে বিনয় অন্যায় মনে করিতে পারিল না। এই দুই বন্ধুর বহুদিনের সম্বন্ধে এতকাল পরে আজ একটা সত্যকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

বর্ষারাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারকে স্পন্দিত করিয়া মাঝে মাঝে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বিনয়ের মনে অত্যন্ত একটা ভার বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল তাহার জীবন চিরদিন যে পথ বাহিয়া আসিতেছিল আজ তাহা ছাড়িয়া দিয়া আর একটা নূতন পথ লইয়াছে। এই অন্ধকারের মধ্যে গোরা কোথায় গেল এবং সে কোথায় চলিল!

পরের দিন সকালে উঠিয়া তাহার মন হাল্‌কা হইয়া গেল। রাত্রে কল্পনায় সে আপনার বেদনাকে অনাবশ্যক অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছিল—সকালে গোরার সহিত বন্ধুত্ব এবং পরেশের পরিবারের সহিত আলাপ তাহার কাছে একান্ত পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হইল না। ব্যাপারখানা এমন কি গুরুতর, এই বলিয়া কাল রাত্রিকার মনঃপীড়ায় আজ বিনয়ের হাসি পাইল।

বিনয় কাঁধে একখানা চাদর লইয়া দ্রুতপদে গোরার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। গোরা তখন তাহার নীচের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। বিনয় যখন রাস্তায় তখন গোরা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল—কিন্তু আজ বিনয়ের আগমনে খবরের কাগজ হইতে তাহার দৃষ্টি উঠিল না। বিনয় আসিয়াই কোনো কথা না বলিয়া ফস্‌ করিয়া গোরার হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইল।

গোরা কহিল—বোধ করি তুমি ভুল করেছ—আমি গৌরমোহন—একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু।

বিনয় কহিল—ভুল তুমিই হয় ত করচ। আমি হচ্চি শ্রীযুক্ত বিনয়—উক্ত গৌরমোহনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বন্ধু।

গোরা। কিন্তু গৌরমোহন এতই বেহায়া যে সে তাঁর কুসংস্কারের জন্য কারো কাছে কোনো দিন লজ্জা বোধ করে না।

বিনয়। বিনয়ও ঠিক তদ্রূপ। তবে কি না সে নিজের সংস্কার নিয়ে তেড়ে অন্যকে আক্রমণ করতে যায় না।

দেখিতে দেখিতে দুই বন্ধুতে তুমুল তর্ক বাধিয়া উঠিল। পাড়াসুদ্ধ লোক বুঝিতে পারিল আজ গোরার সঙ্গে বিনয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে।

গোরা কহিল—তুমি যে পরেশ বাবুর বাড়িতে যাতায়াত করচ সে কথা সেদিন আমার কাছে অস্বীকার করার কি দরকার ছিল?

বিনয়। কোনো দরকার বশত অস্বীকার করিনি—যাতায়াত করিনে

বলেই অস্বীকার করেছিলুম। এতদিন পরে কাল প্রথম তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করেছি।

গোরা। আমার সন্দেহ হচ্চে অভিমন্যুর মত তুমি প্রবেশ করবার রাস্তাই জান—বেরবার রাস্তা জান না।

বিনয়। তা হতে পারে—ঐটে হয় ত আমার জন্মগত প্রকৃতি। আমি যাকে শ্রদ্ধা করি বা ভালবাসি তাকে আমি ত্যাগ করতে পারিনে। আমার এই স্বভাবের পরিচয় তুমিও পেয়েছ।

গোরা। এখন থেকে তাহলে ওখানে যাতায়াত চল্‌তে থাক্‌বে।

বিনয়। একলা আমারি যে চল্‌তে থাক্‌বে এমন কি কথা আছে! তোমারও ত চলৎশক্তি আছে তুমি ত স্থাবর পদার্থ নও!

গোরা। আমি ত যাই এবং আসি কিন্তু তোমার যে লক্ষণ দেখলুম তুমি যে একেবারে যাবারই দাখিল! গরম চা কি রকম লাগ্‌ল?

বিনয়। কিছু কড়া লেগেছিল।

গোরা। তবে?

বিনয়। না খাওয়াটা তার চেয়ে বেশি কড়া লাগত!

গোরা। সমাজ পালনটা তাহলে কি কেবলমাত্র ভদ্রতা পালন?

বিনয়। সব সময়ে নয়। কিন্তু দেখ গোরা সমাজের সঙ্গে যেখানে হৃদয়ের সংঘাত বাধে সেখানে আমার পক্ষে—

গোরা অধীর হইয়া উঠিয়া বিনয়কে কথাটা শেষ করিতেই দিল না। সে গর্জ্জিয়া কহিল—হৃদয়! সমাজকে তুমি ছোট করে তুচ্ছ করে দেখ বলেই কথায় কথায় তোমার হৃদয়ের সংঘাত বাধে। কিন্তু সমাজকে আঘাত করলে তার বেদনা যে কতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় তা যদি অনুভব করতে তাহলে তোমার ঐ হৃদয়টার কথা তুল্‌তে তোমার লজ্জা বোধ হত। পরেশ বাবুর মেয়েদের মনে একটুখানি আঘাত দিতে

তোমার ভারি কষ্ট লাগে—কিন্তু আমার কষ্ট লাগে এতটুকুর জন্যে সমস্ত দেশকে যখন অনায়াসে আঘাত করতে পার।

বিনয় কহিল—তবে সত্য কথা বলি ভাই গোরা। এক পেয়ালা চা খেলে সমস্ত দেশকে যদি আঘাত করা হয় তবে সে আঘাতে দেশের উপকার হবে। তার থেকে বাঁচিয়ে চল্‌লে দেশটাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল, বাবু করে তোলা হবে।

গোরা। ওগো, মশায়, ও সমস্ত যুক্তি আমি জানি—আমি যে একেবারে অবুঝ তা মনে কোরো না। কিন্তু ও সমস্ত এখনকার কথা নয়। রুগী ছেলে যখন ওষুধ খেতে চায় না মা তখন সুস্থ শরীরেও নিজে ওষুধ খেয়ে তাকে জানাতে চায় যে তোমার সঙ্গে আমার একদশা—এটা ত যুক্তির কথা নয়, এটা ভালবাসার কথা। এই ভালবাসা না থাকলে যতই যুক্তি থাক না ছেলের সঙ্গে মায়ের যোগ নষ্ট হয়। তা হলে কাজও নষ্ট হয়। আমিও চায়ের পেয়ালা নিয়ে তর্ক করি না—কিন্তু দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারি না—চা না খাওয়া তার চেয়ে ঢের সহজ—পরেশ বাবুর মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়া তার চেয়ে ঢের ছোট। সমস্ত দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেলাই আমাদের এখনকার অবস্থায় সকলের চেয়ে প্রধান কাজ—যখন মিলন হয়ে যাবে তখন চা খাবে কি না খাবে দুকথায় সে তর্কের মীমাংসা হয়ে যাবে।

বিনয়। তা হলে আমার দ্বিতীয় পেয়ালা চা খাবার অনেক বিলম্ব আছে দেখ্‌চি।

গোরা। না, বেশি বিলম্ব কর্‌বার দরকার নেই। কিন্তু, বিনয়, আমাকে আর কেন? হিন্দুসমাজের অনেক অপ্রিয় জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ছাড়বার সময় এসেছে। নইলে পরেশবাবুর মেয়েদের মনে আঘাত লাগবে।

এমন সময় অবিনাশ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে গোরার শিষ্য।

গোরার মুখ হইতে সে যাহা শোনে তাহাই সে নিজের বুদ্ধির দ্বারা ছোট এবং নিজের ভাষার দ্বারা বিকৃত করিয়া চারিদিকে বলিয়া বেড়ায়। গোরার কথা যাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না, অবিনাশের কথা তাহারা বেশ বোঝে ও প্রশংসা করে।

বিনয়ের প্রতি অবিনাশের অত্যন্ত একটা ঈর্ষার ভাব আছে। তাই সে জো পাইলেই বিনয়ের সঙ্গে নির্ব্বোধের মত তর্ক করিতে চেষ্টা করে। বিনয় তাহার মূঢ়তায় অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠে—তখন গোরা অবিনাশের তর্ক নিজে তুলিয়া লইয়া বিনয়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়! অবিনাশ মনে করে তাহারই যুক্তি যেন গোরার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে!

অবিনাশ আসিয়া পড়াতে গোরার সঙ্গে মিলন ব্যাপারে বিনয় বাধা পাইল। সে তখন উঠিয়া উপরে গেল। আনন্দময়ী তাঁহার ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন।

আনন্দময়ী কহিলেন—অনেকক্ষণ থেকে তোমাদের গলা শুনতে পাচ্চি। এত সকালে যে? জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছ ত?

অন্য দিন হইলে বিনয় বলিত, না খাই নাই—এবং আনন্দময়ীর সম্মুখে বসিয়া তাহার আহার জমিয়া উঠিত। কিন্তু আজ বলিল—না, মা, খাব না—খেয়েই বেরিয়েছি।

আজ বিনয় গোরার কাছে অপরাধ বাড়াইতে ইচ্ছা করিল না। পরেশবাবুর সঙ্গে তাহার সংস্রবের জন্য গোরা যে এখনো তাহাকে ক্ষমা করে নাই—তাহাকে একটু যেন দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে ইহা অনুভব করিয়া তাহার মনের ভিতরে ভিতরে একটা ক্লেশ হইতেছিল। সে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া আলুর খোসা ছাড়াইতে বসিয়া গেল।

মিনিট পনেরো পরে নীচে গিয়া দেখিল গোরা অবিনাশকে লইয়া বাহির হইয়া গেছে। গোরার ঘরে বিনয় অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে খবরের কাগজ হাতে লইয়া শূন্যমনে বিজ্ঞাপন

দেখিতে লাগিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

১৪

মধ্যাহ্নে আহারের পর গোরার কাছে যাইবার জন্য বিনয়ের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিনয় গোরার কাছে নিজেকে নত করিতে কোনো দিন সঙ্কোচ বোধ করে নাই। কিন্তু নিজের অভিমান না থাকিলেও বন্ধুত্বের অভিমানকে ঠেকানো শক্ত। পরেশ বাবুর কাছে ধরা দিয়া বিনয় গোরার প্রতি তাহার এতদিনকার নিষ্ঠায় একটু যেন খাটো হইয়াছে বলিয়া অপরাধ অনুভব করিতেছিল বটে কিন্তু সেজন্য গোরা তাহাকে পরিহাস ও ভর্ৎসনা করিবে এই পর্য্যন্তই সে আশা করিয়াছিল, তাহাকে যে এমন করিয়া ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে তাহা সে মনেও করে নাই। বাসা হইতে খানিকটা দূর বাহির হইয়া বিনয় আবার ফিরিয়া আসিল;—বন্ধুত্ব পাছে অপমানিত হয় এই ভয়ে সে গোরার বাড়িতে যাইতে পারিল না।

মধ্যাহ্নে আহারের পর গোরাকে একখানা চিঠি লিখিবে বলিয়া কাগজ কলম লইয়া বিনয় বসিয়াছে; বসিয়া অকারণে কলমটাকে ভোঁতা অপবাদ দিয়া একটা ছুরি লইয়া অতিশয় যত্নে একটু একটু করিয়া তাহার সংস্কার করিতে লাগিয়াছে এমন সময়ে নীচে হইতে "বিনয়" বলিয়া ডাক আসিল। বিনয় কলম ফেলিয়া তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া বলিল—মহিম দাদা, আসুন উপরে আসুন।

মহিম উপরের ঘরে আসিয়া বিনয়ের খাটের উপর বেশ চৌকা হইয়া বসিলেন এবং ঘরের আসবাবপত্র বেশ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—দেখ বিনয়, তোমার বাসা যে আমি চিনিনে তা নয়—মাঝে মাঝে তোমার খবর নিয়ে যাই এমন ইচ্ছাও করে কিন্তু আমি জানি

তোমরা আজকালকার ভাল ছেলে, তোমাদের এখানে তামাকটি পাবার জো নেই তাই বিশেষ প্রয়োজন না হলে—

বিনয়কে ব্যস্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়া মহিম কহিলেন—তুমি ভাবচ এখনি বাজার থেকে নতুন হুঁকো কিনে এনে আমাকে তামাক খাওয়াবে, সে চেষ্টা কোরো না। তামাক না দিলে ক্ষমা করতে পারব কিন্তু নতুন হুঁকোয় আনাড়ি হাতের সাজা তামাক আমার সহ্য হবে না।

এই বলিয়া মহিম বিছানা হইতে একটা হাতপাখা তুলিয়া লইয়া হাওয়া খাইতে খাইতে কহিলেন—আজ রবিবারের দিবানিদ্রাটা সম্পূর্ণ মাটি করে তোমার এখানে এসেছি তার একটু কারণ আছে। আমার একটি উপকার তোমাকে করতেই হবে।

বিনয় "কি উপকার" জিজ্ঞাসা করিল। মহিম কহিলেন—আগে কথা দাও, তবে বল্‌ব।

বিনয়। আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় তবে ত?

মহিম। কেবলমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব। আর কিছু নয় তুমি একবার হাঁ বল্লেই হয়।

বিনয়। আমাকে এত করে কেন বল্‌চেন? আপনি ত জানেন আমি আপনাদের ঘরেরই লোক—পারলে আপনার উপকার করব না এ হতেই পারে না।

মহিম পকেট হইতে একটা পানের দোনা বাহির করিয়া তাহা হইতে গোটা দুয়েক পান বিনয়কে দিয়া বাকি তিনটে নিজের মুখে পুরিলেন ও চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন—আমার শশিমুখীকে ত তুমি জানই। দেখ্‌তে শুনতে নেহাৎ মন্দ নয় অর্থাৎ বাপের মত হয় নি। বয়স প্রায় দশের কাছাকাছি হল, এখন ওকে পাত্রস্থ করবার সময় হয়েছে। কোন্‌ লক্ষ্মীছাড়ার হাতে পড়বে এই ভেবে আমার ত রাত্রে ঘুম হয় না।

বিনয় কহিল—ব্যস্ত হচ্চেন কেন—এখনো সময় আছে।

মহিম। নিজের মেয়ে যদি থাকৃত ত বুঝ্‌তে কেন এত ব্যস্ত হচ্চি। বছর গেলেই বয়েস আপনি বাড়ে কিন্তু পাত্র ত আপনি আসে না! কাজেই দিন যত যায় মন ততই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এখন, তুমি যদি একটু আশ্বাস দাও তাহলে না হয় দু'দিন সবুর কর্‌তেও পারি।

বিনয়। আমার ত বেশি লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই—কলকাতার মধ্যে আপনাদের বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়ি জানিনে বল্লেই হয়—তবু আমি খোঁজ করে দেখ্‌ব।

মহিম। শশিমুখীর স্বভাবচরিত্র ত জান।

বিনয়। জানি বই কি। ওকে এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসচি লক্ষ্মী মেয়ে।

মহিম। তবে আর বেশি দূর খোঁজ করবার দরকার কি বাপু! ও মেয়ে তোমারি হাতে সমর্পণ করব।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল—বলেন কি?

মহিম। কেন, অন্যায় কি বলেছি! অবশ্য, কুলে তোমরা আমাদেব চেয়ে অনেক বড়—কিন্তু বিনয়, এত পড়াশুনো করে যদি তোমরা কুল মান্‌বে তবে হল কি!

বিনয়। না, না কুলের কথা হচ্চে না, কিন্তু বয়েস যে—

মহিম। বল কি! শশীর বয়েস কম কি হল! হিঁদুর ঘরের মেয়ে ত মেম সাহেব নয়—সমাজকে ত উড়িয়ে দিলে চলে না।

মহিম সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে—বিনয়কে তিনি অস্থির করিয়া তুলিলেন। অবশেষে বিনয় কহিল—আমাকে একটু ভাববার সময় দিন।

মহিম। আমি ত আজ রাত্রেই দিনস্থির করচিনে।

বিনয়। তবু বাড়ির লোকেদের—

মহিম। হাঁ সে ত বটেই। তাঁহাদের মত নিতে হবে বইকি। তোমার

খুড়োমশায় যখন বর্ত্তমান আছেন তাঁর অমতে ত কিছু হতে পারে না।

এই বলিয়া পকেট হইতে দ্বিতীয় পানের দোনা নিঃশেষ করিয়া যেন কথাটা পাকাপাকি হইয়া আসিয়াছে এইরূপ ভাব করিয়া মহিম চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আনন্দময়ী একবার শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহের প্রস্তাব আভাসে উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিনয় তাহা কানেও তোলে নাই। আজও প্রস্তাবটা যে বিশেষ সঙ্গত বোধ হইল তাহা নহে কিন্তু তবু কথাটা মনের মধ্যে একটুখানি যেন স্থান পাইল। বিনয়ের মনে হইল এই বিবাহ ঘটিলে আত্মীয়তা সম্বন্ধে গোরা তাহাকে কোনো দিন ঠেলিতে পারিবে না। বিবাহ ব্যাপারটাকে হৃদয়াবেগের সঙ্গে জড়িত করাকে ইংরাজিয়ানা বলিয়াই সে এত দিন পরিহাস করিয়া আসিয়াছে, তাই শশিমুখীকে বিবাহ করাটা তাহার কাছে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না। মহিমের এই প্রস্তাব লইয়া গোরার সঙ্গে পরামর্শ করিবার যে একটা উপলক্ষ জুটিল আপাতত ইহাতেই সে খুসি হইল। বিনয়ের ইচ্ছা গোরা এই লইয়া তাহাকে একটু পীড়াপীড়ি করে। মহিমকে সহজে সম্মতি না দিলে মহিম গোরাকে দিয়া তাহাকে অনুরোধ করাইবার চেষ্টা করিবে ইহাতে বিনয়ের সন্দেহ ছিল না।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বিনয়ের মনে অবসাদ কাটিয়া গেল। সে তখনি গোরার বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চাদর কাঁধে বাহির হইয়া পড়িল। অল্প একটু দূর যাইতেই পশ্চাৎ হইতে শুনিতে পাইল—"বিনয় বাবু!" পিছন ফিরিয়া দেখিল সতীশ তাহাকে ডাকিতেছে।

সতীশকে সঙ্গে লইয়া আবার বিনয় বাসায় প্রবেশ করিল। সতীশ পকেট হইতে রুমালের পুঁটুলি বাহির করিয়া কহিল—এর মধ্যে কি আছে বলুন দেখি!

বিনয় "মড়ার মাথা" "কুকুরের বাচ্ছা" প্রভৃতি নানা অসম্ভব জিনিষের নাম করিয়া সতীশের নিকট তর্জ্জন লাভ করিল। তখন সতীশ তাহার রুমাল খুলিয়া গোটাপাঁচেক কালো কালো ফল বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ কি বলুন্ দেখি ?

বিনয় যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। অবশেষে পরাভব স্বীকার করিলে সতীশ কহিল রেঙ্গুনে তাহার এক মামা আছেন তিনি সেখানকার এই ফল তাহার মার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন—মা তাহারই পাঁচটা বিনয় বাবুকে উপহার পাঠাইয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের ম্যাঙ্গোষ্টীন্ ফল তখনকার দিনে কলিকাতায় সুলভ ছিল না—তাই বিনয় ফলগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া টিপিয়া টুপিয়া কহিল—সতীশ বাবু, ফলগুলো খাব কি করে ?

সতীশ বিনয়ের এই অজ্ঞতায় হাসিয়া কহিল—দেখবেন, কামড়ে খাবেন না যেন—ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়।

সতীশ নিজেই এই ফল কামড় দিয়া খাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া আজ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আত্মীয়স্বজনদের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়াছে—সেই জন্য বিনয়ের অনভিজ্ঞতায় বিজ্ঞজনোচিত হাস্য করিয়া তাহার মনের বেদনা দূর হইল।

তাহার পরে দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে কিছুক্ষণ কৌতুকালাপ হইলে পর সতীশ কহিল—বিনয় বাবু, মা বলেছেন আপনার যদি সময় থাকে ত একবার আমাদের বাড়ী আসতে হবে—আজ লীলার জন্মদিন।

বিনয় বলিল—আজ, ভাই, আমার সময় হবে না, আজ আমি আর-এক জায়গায় যাচ্চি।

সতীশ। কোথায় যাচ্চেন ?

বিনয়। আমার বন্ধুর বাড়িতে।

সতীশ। আপনার সেই বন্ধু ?

বিনয়। হাঁ।

বন্ধুর বাড়ি যেতে পারেন অথচ আমাদের বাড়ি যাবেন না ইহার যৌক্তিকতা সতীশ বুঝিতে পারিল না—বিশেষত বিনয়ের এই বন্ধুকে সতীশের ভাল লাগে নাই ;—সে যেন ইস্কুলের হেডমাষ্টারের চেয়ে কড়া লোক, তাহাকে আগিন শুনাইয়া কেহ যশ লাভ করিবে সে এমন ব্যক্তিই নয় ;—এমন লোকের কাছে যাইবার জন্য বিনয় যে কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করিবে তাহা সতীশের কাছে ভালই লাগিল না। সে কহিল—না, বিনয় বাবু, আপনি আমাদের বাড়ি আস্থন।

হার মানিতে তাহার বেশিক্ষণ লাগিল না। দ্বিধা করিতে করিতে মনের মধ্যে আপত্তি করিতে করিতে অবশেষে বালকের হাত ধরিয়া সেই আটাত্তর নম্বরেরই পথে সে চলিল। বর্ম্মা হইতে আগত দুর্লভ ফলের এক অংশ বিনয়কে মনে করিয়া পাঠানোতে যে আত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে খাতির না করা বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব।

বিনয় পরেশ বাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিল পানু বাবু এবং আর কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি পরেশবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। লীলার জন্মদিনের মধ্যাহ্নভোজনে তাহারা নিমন্ত্রিত ছিল। পানুবাবু যেন বিনয়কে দেখিতে পান নাই এমনি ভাবে চলিয়া গেলেন।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই বিনয় খুব একটা হাসির ধ্বনি এবং দৌড়াদৌড়ির শব্দ শুনিতে পাইল। সুধীর লাবণ্যর চাবি চুরি করিয়াছে ; শুধু তাই নয়, দেরাজের মধ্যে লাবণ্যর খাতা আছে এবং সেই খাতার মধ্যে কবিযশঃপ্রার্থিনীর উপহাস্যতার উপকরণ আছে তাহাই এই দস্যু লোকসমাজে উদ্‌ঘাটন করিবে বলিয়া শাসাইতেছে ইহাই লইয়া উভয়পক্ষে যখন দ্বন্দ্ব চলিতেছে এমন সময়ে রঙ্গভূমিতে বিনয় প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া লাবণ্যর দল মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিল। সতীশ

তাহাদের কৌতুকের ভাগ লইবার জন্য তাহাদের পশ্চাতে ছুটিল। কিছুক্ষণ পরে সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, মা আপনাকে একটু বসতে বললেন, এখনি তিনি আসচেন। বাবা অনাথ বাবুদের বাড়ী গেছেন, তাঁরও আসতে দেরি হবে না।

সুচরিতা বিনয়ের সঙ্কোচ ভাঙিয়া দিবার জন্য গোরার কথা তুলিল। হাসিয়া কহিল, তিনি বোধ হয় আমাদের এখানে আর কখনো আস্‌বেন না?

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

সুচরিতা কহিল—আমরা পুরুষদের সাম্‌নে বেরই দেখে তিনি নিশ্চয় অবাক্ হয়ে গেছেন। ঘরকরনার মধ্যে ছাড়া মেয়েদের আর কোথাও দেখলে তিনি বোধ হয় তাদের শ্রদ্ধা করতে পারেন না।

বিনয় ইহার উত্তর দিতে কিছু মুস্কিলে পড়িয়া গেল। কথাটার প্রতিবাদ করিতে পারিলেই সে খুসি হইত কিন্তু মিথ্যা বলিবে কি করিয়া? বিনয় কহিল—গোরার মত এই যে, ঘরের কাজেই মেয়েরা সম্পূর্ণ মন না দিলে তাঁদের কর্ত্তব্যের একাগ্রতা নষ্ট হয়।

সুচরিতা কহিল—তাহলে মেয়েপুরুষে মিলে ঘরবাহিরকে একেবারে ভাগ করে নিলেই ত ভাল হত। পুরুষকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় বলে তাঁদের বাইরের কর্ত্তব্য হয়ত ভাল করে সম্পন্ন হয় না। আপনিও আপনার বন্ধুর মতে মত দেন না কি?

নারীনীতি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত ত বিনয় গোরার মতেই মত দিয়া আসিয়াছিল। ইহা লইয়া সে কাগজে লেখালেখিও করিয়াছে। কিন্তু সেইটেই যে বিনয়ের মত এখন তাহা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। সে কহিল—দেখুন, আসলে এ সকল বিষয়ে আমরা অভ্যাসের দাস। সেই জন্যেই মেয়েদের বাইরে বেরতে দেখলে মনে খট্‌কা লাগে—অন্যায় বা অকর্ত্তব্য বলে যে খারাপ লাগে সেটা কেবল আমরা জোর করে

প্রমাণ করতে চেষ্টা করি। যুক্তিটা এস্থলে উপলক্ষ মাত্র সংস্কারটাই আসল।

সুচরিতা একটু একটু করিয়া খোঁচা দিয়া দিয়া গোরার সম্বন্ধে আলোচনাকে নিবিতে দিল না। বিনয়ও গোরার পক্ষে তাহার যাহা কিছু বলিবার তাহা খুব ভাল করিয়াই বলিতে লাগিল। এমন যুক্তির কথা এমন দৃষ্টান্ত দিয়া এমন গুছাইয়া আর কখনো যেন সে বলে নাই; গোরাও তাহার নিজের মত এমন পরিষ্কার করিয়া এমন উজ্জ্বল করিয়া বলিতে পারিত কিনা সন্দেহ। বিনয়ের বুদ্ধি ও প্রকাশক্ষমতার এই অপূর্ব্ব উত্তেজনায় তাহার মনে একটা আনন্দ জন্মিতে লাগিল এবং সেই আনন্দে তাহার মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বিনয় কহিল—দেখুন শাস্ত্রে বলে আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জান। নইলে মুক্তি কিছুতেই নেই। আমি আপনাকে বলচি আমার বন্ধু গোরা ভারতবর্ষের সেই আত্মবোধের প্রকাশ রূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাকে আমি সামান্য লোক বলে মনে করতে পারিনে। আমাদের সকলের মন যখন তুচ্ছ আকর্ষণে "নূতনের প্রলোভনে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন ঐ একটি মাত্র লোক এই সমস্ত বিক্ষিপ্ততার মাঝখানে অটলভাবে দাঁড়িয়ে সিংহগর্জ্জনে সেই পুরাতন মন্ত্র বলচে—আত্মানং বিদ্ধি।

এই আলোচনা আরো অনেকক্ষণ চলিতে পারিত—সুচরিতাও ব্যগ্র হইয়া শুনিতেছিল—কিন্তু হঠাৎ পাশের একটা ঘর হইতে সতীশ চীৎকার করিয়া আবৃত্তি আরম্ভ করিল—

"বোলো না কাতর স্বরে না করি বিচার
জীবন স্বপনসম মায়ার সংসার।"

বেচারা সতীশ বাড়ির অতিথি অভ্যাগতদের সামনে বিদ্যা ফলাইবার কোনো অবকাশ পায় না। লীলা পর্য্যন্ত ইংরেজি কবিতা আওড়াইয়া সভা গরম করিয়া তোলে কিন্তু সতীশকে বরদাসুন্দরী ডাকেন না।

অথচ লীলার সঙ্গে সকল বিষয়েই সতীশের খুব একটা প্রতিযোগিতা আছে। কোনো মতে লীলার দর্প চূর্ণ করা সতীশের জীবনের প্রধান সুখ। বিনয়ের সম্মুখে কাল লীলার পরীক্ষা হইয়া গেছে। তখন অনাহূত সতীশ তাহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার কোনো চেষ্টা করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিলেও বরদাসুন্দরী তখনি তাহাকে দাবাইয়া দিতেন ;—তাই আজ পাশের ঘরে যেন আপন মনে উচ্চস্বরে কাব্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইল। শুনিয়া সুচরিতা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

এমন সময় লীলা তাহার মুক্ত বেণী দোলাইয়া ঘরে ঢুকিয়া সুচরিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কানে কানে কি একটা বলিল। অমনি সতীশ ছুটিয়া তাহার পিছনে আসিয়া কহিল—আচ্ছা লীলা, বল দেখি 'মনোযোগ' মানে কি ?

লীলা কহিল—বলব না।

সতীশ। ঈস্! বল্‌ব না! জান না তাই বল না!

বিনয় সতীশকে কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল—তুমি বল দেখি মনোযোগ মানে কি ?

সতীশ সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া কহিল—মনোযোগ মানে মনোনিবেশ।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, মনোনিবেশ বল্‌তে কি বোঝায় ?

আত্মীয় না হইলে আত্মীয়কে এমন বিপদে কে ফেলিতে পারে ? সতীশ প্রশ্নটা যেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভাবে লাফাইতে লাফাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনয় আজ পরেশ বাবুর বাড়ী হইতে সকাল সকাল বিদায় লইয়া গোরার কাছে যাইবে নিশ্চয় স্থির করিয়া আসিয়াছিল। বিশেষত গোরার কথা বলিতে বলিতে গোরার কাছে যাইবার উৎসাহও তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। তাই সে ঘড়িতে চারটে বাজিতে শুনিয়া তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

সুচরিতা কহিল, আপনি এখনি যাবেন? মা আপনার জন্য খাবার তৈরি করচেন। আর একটু পরে গেলে কি চল্‌বে না?

বিনয়ের পক্ষে এ ত প্রশ্ন নয়, এ হুকুম। সে তখনি বসিয়া পড়িল। লাবণ্য রঙীন রেশমের কাপড়ে সাজিয়া গুজিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—দিদি, খাবার তৈরি হয়েছে। মা ছাতে আস্‌তে বল্লেন।

ছাতে আসিয়া বিনয়কে আহারে প্রবৃত্ত হইতে হইল। বরদাসুন্দরী তাঁহার সব সন্তানদের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন। ললিতা সুচরিতাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। লাবণ্য একটা চৌকিতে বসিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দুই লোহার কাঠি লইয়া বুনানির কার্য্যে লাগিল —তাহাকে কবে একজন বলিয়াছিল বুনানির সময় তাহার কোমল আঙুলগুলির খেলা ভারি সুন্দর দেখায় সেই অবধি লোকের সাক্ষাতে বিনা প্রয়োজনে বুনানি করা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

পরেশ আসিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আজ রবিবারে উপাসনা-মন্দিরে যাইবার কথা। বরদাসুন্দরী বিনয়কে কহিলেন—যদি আপত্তি না থাকে আমাদের সঙ্গে সমাজে যাবেন?

ইহার পর কোনো ওজর আপত্তি করা চলে না। দুই গাড়িতে ভাগ করিয়া সকলে উপাসনালয়ে গেলেন। ফিরিবার সময় যখন গাড়িতে উঠিতেছেন তখন হঠাৎ সুচরিতা চমকিয়া উঠিয়া কহিল—ঐ যে গৌরমোহন বাবু যাচ্চেন।

গোরা যে এই দলকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহাতে কাহারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যেন দেখিতে পায় নাই এইরূপ ভাব করিয়া সে বেগে চলিয়া গেল। গোরার এই উদ্ধত অশিষ্টতায় বিনয় পরেশবাবুদের কাছে লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট করিল। কিন্তু সে মনে মনে স্পষ্ট বুঝিল বিনয়কেই এই দলের মধ্যে দেখিয়া গোরা এমন প্রবল বেগে বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণ তাহার মনের মধ্যে যে একটি আনন্দের

আলো জ্বলিতেছিল তাহা একেবারে নিবিয়া গেল। সুচরিতা বিনয়ের মনের ভাব ও তাহার কারণটা তখনি বুঝিতে পারিল, এবং বিনয়ের মত বন্ধুর প্রতি গোরার এই অবিচারে ও ব্রাহ্মদের প্রতি তাহার এই অন্যায় অশ্রদ্ধায় গোরার উপরে আবার তাহার রাগ হইল;—কোনো মতে গোরার পরাভব ঘটে এই সে মনে মনে ইচ্ছা করিল।

১৫

গোরা যখন মধ্যাহ্নে খাইতে বসিল—আনন্দময়ী আস্তে আস্তে কথা পাড়িলেন—আজ সকালে বিনয় এসেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি?

গোরা খাবার থালা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল—হাঁ হয়েছিল।

আনন্দময়ী অনেক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—তাহার পর কহিলেন—তাকে থাকতে বলেছিলুম কিন্তু সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে চলে গেল।

গোরা কোনো উত্তর করিল না। আনন্দময়ী কহিলেন—তার মনে কি একটা কষ্ট হয়েচে গোরা। আমি তাকে এমন কখনো দেখিনি। আমার মন বড় খারাপ হয়ে আছে।

গোরা চুপ করিয়া খাইতে লাগিল। আনন্দময়ী অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়াই গোরাকে মনে মনে একটু ভয় করিতেন। সে যখন নিজে তাঁহার কাছে মন না খুলিত তখন তিনি তাহাকে কোনো কথা লইয়া পীড়াপীড়ি করিতেন না। অন্যদিন হইলে এইখানেই চুপ করিয়া যাইতেন, কিন্তু আজ বিনয়ের জন্য তাঁহার মন বড় বেদনা পাইতেছিল বলিয়াই কহিলেন—দেখ, গোরা, একটি কথা বলি রাগ কোরো না। ভগবান অনেক মানুষ সৃষ্টি করেচেন কিন্তু সকলের জন্যে কেবল একটি-মাত্র পথ খুলে রাখেননি। বিনয় তোমাকে প্রাণের মত ভালবাসে তাই

সে তোমার কাছ থেকে সমস্তই সহ্য করে—কিন্তু তোমারই পথে তাকে চল্‌তে হবে এ জবরদস্তি করলে সেটা সুখের হবে না।

গোরা কহিল—মা, আর একটু দুধ এনে দাও!

কথাটা এইখানেই চুকিয়া গেল। আহারান্তে আনন্দময়ী তাঁহার তক্তপোষে চুপ করিয়া বসিয়া সেলাই করিতে লাগিলেন। লছমিয়া বাড়ির বিশেষ কোনো ভৃত্যের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধীয় আলোচনায় আনন্দময়ীকে টানিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল।

গোরা চিঠিপত্র লিখিয়া অনেকটা সময় কাটাইয়া দিল। গোরা তাহার উপর রাগ করিয়াছে বিনয় তাহা আজ সকালে স্পষ্ট দেখিয়া গেছে তবু যে সে এই রাগ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য গোরার কাছে আসিবে না ইহা হইতেই পারে না জানিয়া সে সকল কর্ম্মের মধ্যেই বিনয়ের পদশব্দের জন্য কান পাতিয়া রহিল।

বেলা বহিয়া গেল—বিনয় আসিল না। লেখা ছাড়িয়া গোরা উঠিবে মনে করিতেছে এমন সময় মহিম আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। আসিয়াই চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন—শশিমুখীর বিয়ের কথা কি ভাব্‌চ গোরা?

একথা গোরা একদিনের জন্যও ভাবে নাই সুতরাং অপরাধীর মত তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

বাজারে পাত্রের মূল্য যে কিরূপ চড়া এবং ঘরে অর্থের অবস্থা যে কিরূপ অসচ্ছল তাহা আলোচনা করিয়া গোরাকে একটা উপায় ভাবিতে বলিলেন। গোরা যখন ভাবিয়া কিনারা পাইল না তখন তিনি তাহাকে চিন্তাসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিনয়ের কথাটা পাড়িলেন। এত ঘোরফের করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মহিম গোরাকে মুখে যাই বলুন মনে মনে ভয় করিতেন।

এ প্রসঙ্গে বিনয়ের কথা যে উঠিতে পারে গোরা তাহা কখনো

স্বপ্নেও ভাবে নাই। বিশেষত গোরা এবং বিনয় স্থির করিয়াছিল তাহারা বিবাহ না করিয়া দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবে। গোরা তাই বলিল—বিনয় বিয়ে করবে কেন ?

মহিম কহিলেন—এই বুঝি তোমাদের হিঁদুয়ানি! হাজার টিকি রাখ আর ফোঁটা কাট সাহেবিয়ানা হাড়ের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। শাস্ত্রের মতে বিবাহটা যে ব্রাহ্মণের ছেলের একটা সংস্কার তা জান ?

মহিম এখনকার ছেলেদের মত আচারও লঙ্ঘন করেন না আবার শাস্ত্রের ধারও ধারেন না। হোটেলে খানা খাইয়া বাহাদুরী করাকেও তিনি বাড়াবাড়ি মনে করেন আবার গোরার মত সর্ব্বদা শ্রুতিস্মৃতি লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করাকেও তিনি প্রকৃতিস্থ লোকের লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন না। কিন্তু যস্মিন দেশে যদাচারঃ—গোরার কাছে শাস্ত্রের দোহাই পাড়িতে হইল।

এ প্রস্তাব যদি দুইদিন আগে আসিত তবে গোরা একেবারে কানেই লইত না। আজ তাহার মনে হইল কথাটা নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে। অন্তত এই প্রস্তাবটা লইয়া এখনি বিনয়ের বাসায় যাইবার একটা উপলক্ষ জুটিল।

গোরা শেষকালে বলিল—আচ্ছা, বিনয়ের ভাবখানা কি বুঝিয়া দেখি।

মহিম কহিলেন—সে আর বুঝ্‌তে হবে না। তোমার কথা সে কিছুতেই ঠেল্‌তে পারবে না। ও ঠিক হয়ে গেছে। তুমি বল্‌লেই হবে।

সেই সন্ধ্যার সময়েই গোরা বিনয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত। ঝড়ের মত তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই। বেহারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, বাবু আটাত্তর নম্বর বাড়িতে গিয়াছেন।

পরেশ বাবুর পরিবারদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে গোরার

অন্তঃকরণ একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে মনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বিদ্রোহ বহন করিয়া পরেশ বাবুর বাড়ির দিকে ছুটিল। ইচ্ছা ছিল সেখানে এমন সকল কথা উত্থাপন করিবে যাহা শুনিয়া এই ব্রাহ্ম পরিবারের হাড়ে জ্বালা ধরিবে এবং বিনয়েরও আরাম বোধ হইবে না।

পরেশ বাবুর বাসায় গিয়া শুনিল তাঁহারা কেহই বাড়িতে নাই, সকলেই উপাসনামন্দিরে গিয়াছেন। মুহূর্ত্ত কালের জন্য সংশয় হইল বিনয় হয়ত যায় নাই—সে হয়ত এই ক্ষণেই গোরার বাড়িতে গেছে।

থাকিতে পারিল না। গোরা তাহার স্বাভাবিক ঝড়ের গতিতে মন্দিরের দিকেই গেল। দ্বারের কাছে গিয়া দেখিল বিনয় বরদাসুন্দরীর অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের গাড়িতে উঠিতেছে ;—সমস্ত রাস্তার মাঝখানে নির্লজ্জের মত অন্য পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে এক গাড়িতে গিয়া বসিতেছে! মূঢ়! নাগপাশে এমনি করিয়াই ধরা দিতে হয়! এত সত্বর! এত সহজে! তবে বন্ধুত্বের আর ভদ্রস্থতা নাই। গোরা ঝড়ের মতই ছুটিয়া চলিয়া গেল—আর গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে বিনয় রাস্তার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বরদাসুন্দরী মনে করিলেন আচার্য্যের উপদেশ তাহার মনের মধ্যে কাজ করিতেছে—তিনি তাই কোনো কথা বলিলেন না।

১৬

রাত্রে গোরা বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকার ছাতের উপর বেড়াইতে লাগিল।

মহিম ছাতে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন—কহিলেন—মানুষের যখন ডানা নেই তখন এই তেতলা বাড়ি তৈরি করা কেন? ডাঙার মানুষ হয়ে আকাশে বাস করবার চেষ্টা করলে আকাশবিহারী দেবতার সয় না। বিনয়ের কাছে গিয়েছিলে?

গোরা তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল—বিনয়ের সঙ্গে শশিমুখীর বিয়ে হতে পারবে না।

মহিম। কেন বিনয়ের মত নেই না কি ?

গোরা। আমার মত নেই।

মহিম হাত উল্‌টাইয়া কহিলেন—বেশ এ আবার একটা নূতন ফ্যাসাদ্ দেখ্‌চি! তোমার মত নেই! কারণটা কি শুনি?

গোরা। আমি বেশ বুঝেছি বিনয়কে আমাদের সমাজে ধরে রাখা শক্ত হবে। ওর সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়ের বিবাহ চল্‌বে না।

মহিম। ঢের ঢের হিঁদুয়ানি দেখেচি কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখ্‌লুম না। কাশী ভাটপাড়া ছাড়িয়ে গেলে! তুমি যে দেখি ভবিষ্যৎ দেখে বিধান দাও। কোন্ দিন বল্‌বে স্বপ্নে দেখ্‌লুম খৃষ্টান হয়েছ, গোবর খেয়ে জাতে উঠ্‌তে হবে।

অনেক বকাবকির পর মহিম কহিলেন—মেয়েকে ত মূর্খর হাতে দিতে পারিনে! যে ছেলে লেখাপড়া শিখেছে যার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে সে ছেলে মাঝে মাঝে শাস্ত্র ডিঙিয়ে চল্‌বেই! সে জন্যে তার সঙ্গে তর্ক কর তাকে গাল দাও—কিন্তু তার বিয়ে বন্ধ করে মাঝে থেকে আমার মেয়েটাকে শাস্তি দাও কেন! তোমাদের সমস্তই উল্টো বিচার!

মহিম নীচে আসিয়া আনন্দময়ীকে কহিলেন—মা, তোমার গোরাকে তুমি ঠেকাও!

আনন্দময়ী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে?

মহিম। শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ আমি একরকম পাকা করেই এনেছিলুম। গোরাকেও কাল রাজি করেছিলুম, ইতিমধ্যে একরাত্রেই গোরা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেচে যে বিনয় যথেষ্ট পরিমাণে হিঁদু নয়—মনু পরাশরের সঙ্গে তার মতের একটু আধটু অনৈক্য হয়ে থাকে। তাই গোরা বেঁকে দাঁড়িয়েছে—গোরা বাঁক্‌লে কেমন বাঁকে সে ত জানই।

কলিযুগের জনক যদি পণ করতেন যে বাঁকা গোরাকে সোজা করলে তবে সীতা দেব তবে শ্রীরামচন্দ্র হার মেনে যেতেন এ আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি। মনু পরাশরের নীচেই পৃথিবীর মধ্যে সে একমাত্র তোমাকেই মানে। এখন তুমি যদি গতি করে দাও ত মেয়েটা তরে যায়। অমন পাত্র খুজলে পাওয়া যাবে না।

এই বলিয়া, গোরার সঙ্গে আজ ছাতে যা কথাবার্ত্তা হইয়াছে মহিম তাহা সমস্ত বিবৃত করিয়া কহিলেন। বিনয়ের সঙ্গে গোরার একটা বিরোধ যে ঘনাইয়া উঠিতেছে ইহা বুঝিতে পারিয়া আনন্দময়ীর মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী উপরে আসিয়া দেখিলেন গোরা ছাতে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ঘরে একটা চৌকির উপর বসিয়া আর একটা চৌকিতে পা তুলিয়া দিয়া বই পড়িতেছে। আনন্দময়ী তাহার কাছে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। গোরা সাম্‌নের চৌকি হইতে পা নামাইয়া খাড়া হইয়া বসিয়া আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিল।

আনন্দময়ী কহিলেন—বাবা গোরা, আমার একটি কথা রাখিস্‌—বিনয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস্‌নে। আমার কাছে তোরা দুজনে দুটি ভাই—তোদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘট্‌লে আমি সইতে পারব না।

গোরা কহিল—বন্ধু যদি বন্ধন কাট্‌তে চায় তবে তার পিছনে ছুটোছুটি করে আমি সময় নষ্ট করতে পারব না।

আনন্দময়ী কহিলেন—বাবা আমি জানিনে তোমাদের মধ্যে কি হয়েচে কিন্তু বিনয় তোমার বন্ধন কাটাতে চাচ্চে একথা যদি বিশ্বাস কর তবে তোমার বন্ধুত্বের জোর কোথায়?

গোরা। মা, আমি সোজা চল্‌তে ভালবাসি,—দুনৌকায় পা দেওয়া যার স্বভাব আমার নৌকো থেকে তাকে পা সরাতে হবে—এতে আমারই কষ্ট হোক্‌ আর তারই কষ্ট হোক্‌।

আনন্দময়ী। কি হয়েছে বল দেখি! ব্রাহ্মদের ঘরে সে যাওয়া আসা করে এই ত তার অপরাধ?

গোরা। সে অনেক কথা মা।

আনন্দময়ী। হোক্ অনেক কথা—কিন্তু আমি একটি কথা বলি। গোরা, সব বিষয়েই তোমার এত জেদ, যে তুমি যা ধর তা কেউ ছাড়াতে পারে না কিন্তু বিনয়ের বেলাই তুমি এমন আল্‌গা কেন? তোমার অবিনাশ যদি দল ছাড়তে চাইত তুমি কি তাকে সহজে ছাড়তে? তোমার বন্ধু বলেই কি ও তোমার সকলের চেয়ে কম?

গোরা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আনন্দময়ীর এই কথাতে সে নিজের মনটা পরিষ্কার দেখিতে পাইল। এতক্ষণ সে মনে করিতেছিল যে, সে কর্ত্তব্যের জন্য তাহার বন্ধুত্বকে বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছে এখন স্পষ্ট বুঝিল ঠিক তাহার উল্টা। তাহার বন্ধুত্বের অভিমানে বেদনা লাগিয়াছে বলিয়াই বিনয়কে বন্ধুত্বের চরম শাস্তি দিতে সে উদ্যত হইয়াছে। সে মনে জানিত বিনয়কে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বন্ধুত্বই যথেষ্ট—অন্য কোনো প্রকার চেষ্টা প্রণয়ের অসম্মান।

আনন্দময়ী যেই বুঝিলেন তাঁহার কথাটা গোরার মনে একটুখানি লাগিয়াছে অমনি তিনি আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিবার উপক্রম করিলেন। গোরাও হঠাৎ বেগে উঠিয়া পড়িয়া আলনা হইতে চাদর তুলিয়া কাঁধে ফেলিল।

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যাও গোরা? গোরা কহিল—আমি বিনয়ের বাড়ি যাচ্চি।

আনন্দময়ী। খাবার তৈরি আছে খেয়ে যাও।

গোরা। আমি বিনয়কে ধরে আন্‌চি সেও এখানে খাবে।

আনন্দময়ী আর কিছু না বলিয়া নীচের দিকে চলিলেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া হঠাৎ থামিয়া কহিলেন ঐ বিনয় আস্‌চে।

বলিতে বলিতে বিনয় আসিয়া পড়িল। আনন্দময়ীর চোখ ছল ছল করিয়া আসিল। তিনি স্নেহে বিনয়ের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন—বিনয়, বাবা, তুমি খেয়ে আসনি?

বিনয় কহিল—না, মা।

আনন্দময়ী। তোমাকে এইখানেই খেতে হবে।

বিনয় একবার গোরার মুখের দিকে চাহিল। গোরা কহিল—বিনয়, অনেকদিন বাঁচ্‌বে। তোমার ওখানেই যাচ্ছিলুম।

আনন্দময়ীর বুক হাল্‌কা হইয়া গেল—তিনি তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেলেন।

দুই বন্ধু ঘরে আসিয়া বসিলে গোরা যাহা তাহা একটা কথা তুলিল—কহিল, জান, আমাদের ছেলেদের জন্যে একজন বেশ ভাল জিম্‌নাষ্টিক্ মাষ্টার পেয়েছি। সে শেখাচ্চে বেশ।

মনের ভিতরের আসল কথাটা এখনো কেহ পাড়িতে সাহস করিল না।

দুই জনে যখন খাইতে বসিয়া গেল তখন আনন্দময়ী তাহাদের কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিলেন এখনো তাহাদের উভয়ের মধ্যে বাধো-বাধো রহিয়াছে—পর্দ্দা উঠিয়া যায় নাই। তিনি কহিলেন—বিনয়, রাত অনেক হয়েছে, তুমি আজ এই খানেই শুয়ো। আমি তোমার বাসায় খবর পাঠিয়ে দিচ্চি।

বিনয় চকিতের মধ্যে গোরার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ। খেয়ে রাস্তায় হাঁটা নিয়ম নয়। তাহলে এইখানেই শোয়া যাবে।

আহারান্তে দুই বন্ধু ছাতে আসিয়া মাদুর পাতিয়া বসিল। ভাদ্রমাস পড়িয়াছে; শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছে। হালকা পাতলা শাদা মেঘ ক্ষণিক ঘুমের ঘোরের মত মাঝে মাঝে চাঁদকে একটুখানি ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে উড়িয়া চলিতেছে।

চারিদিকে দিগন্ত পর্য্যন্ত নানা আয়তনের উঁচু নীচু ছাদের শ্রেণী ছায়াতে আলোতে এবং মাঝে মাঝে গাছের মাথার সঙ্গে মিশিয়া যেন সম্পূর্ণ প্রয়োজনহীন একটা প্রকাণ্ড অবাস্তব খেয়ালের মত পড়িয়া রহিয়াছে।

গির্জ্জার ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজিল; বরফওয়ালা তাহার শেষ হাঁক হাঁকিয়া চলিয়া গেল। গাড়ির শব্দ মন্দ হইয়া আসিয়াছে। গোরাদের গলিতে জাগরণের লক্ষণ নাই কেবল প্রতিবেশীর আস্তাবলে কাঠের মেঝের উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ এক একবার শোনা যাইতেছে এবং কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিতেছে।

দুই জনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে বিনয় প্রথমটা একটু দ্বিধা করিয়া অবশেষে পরিপূর্ণবেগে তাহার মনের কথাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। বিনয় কহিল—ভাই গোরা, আমার বুক ভরে উঠেছে। আমি জানি এ সব বিষয়ে তোমার মন নেই কিন্তু তোমাকে না বল্‌লে আমি বাঁচব না। আমি ভাল মন্দ কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে—কিন্তু এটা নিশ্চয় এর সঙ্গে কোনো চাতুরী খাটুবে না। বইয়েতে অনেক কথা পড়েছি এবং এত দিন মনে করে এসেছি সব জানি। ঠিক যেন ছবিতে জল দেখে মনে করতুম সাঁতার দেওয়া খুব সহজ—কিন্তু আজ জলের মধ্যে পড়ে এক মুহূর্ত্তে বুঝ্‌তে পেরেছি এ ত ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া বিনয় তাহার জীবনের এই আশ্চর্য্য আবির্ভাবকে একান্ত চেষ্টায় গোরার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিতে লাগিল।

বিনয় বলিতে লাগিল, আজকাল তাহার কাছে সমস্ত দিন ও রাত্রির মধ্যে কোথাও যেন কিছু ফাঁক নাই—সমস্ত আকাশের মধ্যে কোথাও যেন কোনো রন্ধ্র নাই, সমস্ত একেবারে নিবিড়ভাবে ভরিয়া গেছে—বসন্তকালের মৌচাক যেমন মধুতে ভরিয়া ফাটিয়া যাইতে চায় তেমনিতর। আজ সমস্তই তাহার সম্মুখে আসিতেছে, সমস্তই তাহাকে স্পর্শ করিতেছে, সমস্তই একটা নূতন অর্থে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে জানিত না পৃথিবীকে

সে এত ভালবাসে, আকাশ এমন আশ্চর্য্য, আলোক এমন অপূর্ব্ব, রাস্তার অপরিচিত পথিকের প্রবাহও এমন গভীরভাবে সত্য! তাহার ইচ্ছা করে সকলের জন্য সে একটা কিছু করে, তাহার সমস্ত শক্তিকে আকাশের সূর্য্যের মত সে জগতের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

বিনয় যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গে এই সমস্ত কথা বলিতেছে তাহা হঠাৎ মনে হয় না। সে যেন কাহারো নাম মুখে আনিতে পারে না—আভাস দিতে গেলেও কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। এই যে আলোচনা করিতেছে ইহার জন্য সে যেন কাহার প্রতি অপরাধ অনুভব করিতেছে। ইহা অন্যায়, ইহা অপমান—কিন্তু আজ এই নির্জ্জন রাত্রে নিস্তব্ধ আকাশে বন্ধুর পাশে বসিয়া এ অন্যায়টুকু সে কোনো মতেই কাটাইতে পারিল না।

সে কি মুখ! প্রাণের আভা তাহার কপালের কোমলতার মধ্যে কি সুকুমার ভাবে প্রকাশ পাইতেছে! হাসিতে তাহার অন্তঃকরণ কি আশ্চর্য্য আলোর মত ফুটিয়া পড়ে! ললাটে কি বুদ্ধি! এবং ঘন পল্লবের ছায়াতলে দুই চক্ষুর মধ্যে কি নিবিড় অনির্ব্বচনীয়তা! আর সেই দুটি হাত—সেবা এবং স্নেহকে সৌন্দর্য্যে সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, সে যেন কথা কহিতেছে! বিনয় নিজের জীবনকে যৌবনকে ধন্য জ্ঞান করিতেছে, এই আনন্দে তাহার বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যাহা না দেখিয়াই জীবন সাঙ্গ করে—বিনয় যে তাহাকে এমন করিয়া চোখের সামনে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাইবে ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

কিন্তু এ কি পাগ্‌লামি! এ কি অন্যায়! হোক্ অন্যায়, আর ত ঠেকাইয়া রাখা যায় না। এই স্রোতেই যদি কোনো একটা কূলে তুলিয়া দেয় ত ভাল, আর যদি ভাসাইয়া দেয়, যদি তলাইয়া লয় তবে উপায় কি! মুস্কিল এই যে, উদ্ধারের ইচ্ছাও হয় না—এতদিনকার সমস্ত সংস্কার সমস্ত স্থিতি হারাইয়া চলিয়া যাওয়াই যেন জীবনের সার্থক পরিণাম!

গোরা চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। এই ছাতে এমনি নির্জ্জন নিসুপ্ত জ্যোৎস্নারাত্রে আরো অনেক দিন দুই জনে অনেক কথা হইয়া গেছে—কত সাহিত্য, কত লোকচরিত্র, কত সমাজহিতের আলোচনা; ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে দুই জনের কত সংকল্প; কিন্তু এমন কথা ইহার পূর্ব্বে আর কোনো দিন হয় নাই। মানবহৃদয়ের এমন একটা সত্য পদার্থ, এমন একটা প্রবল প্রকাশ এমন করিয়া গোরার সাম্‌নে আসিয়া পড়ে নাই। এই সমস্ত ব্যাপারকে সে এত দিন কবিত্বের আবর্জ্জনা বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে—আজ সেই ইহাকে এত কাছে দেখিল যে ইহাকে আর অস্বীকার করিতে পারিল না। শুধু তাহাই নয় ইহার বেগ তাহার মনকে ঠেলা দিল, ইহার পুলক তাহার সমস্ত শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। তাহার যৌবনের একটা অগোচর অংশের পর্দ্দা মুহূর্ত্তের জন্য হাওয়ায় উড়িয়া গেল এবং সেই এত-দিনকার রুদ্ধ কক্ষে এই শরৎ নিশীথের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া একটা মায়া বিস্তার করিয়া দিল।

চন্দ্র কখন এক সময় ছাদগুলার নীচে নামিয়া গেল। পূর্ব্বদিকে তখন নিদ্রিত মুখের হাসির মত একটুখানি আলোকের আভাস দিয়াছে। এতক্ষণ পরে বিনয়ের মনটা হালকা হইয়া একটা সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমার এ সমস্ত কথা তোমার কাছে খুব ছোট। তুমি আমাকে হয়ত মনে মনে অবজ্ঞা করচ। কিন্তু কি করব বল— কখনো তোমার কাছে কিছু লুকোইনি—আজও লুকোলুম না, তুমি বোঝ আর না বোঝ।

গোরা বলিল—বিনয়, এ সব কথা আমি যে ঠিক বুঝি তা বলতে পারিনে। দু'দিন আগে তুমিও বুঝতে না। জীবনব্যাপারের মধ্যে এই সমস্ত আবেগ এবং আবেশ আমার কাছে যে আজ পর্য্যন্ত অত্যন্ত ছোট ঠেকেছে সে কথাও অস্বীকার করতে পারিনে। তাই বলে এটা যে

বাস্তবিকই ছোট তা হয় ত নয়—এর শক্তি, এর গভীরতা আমি প্রত্যক্ষ করিনি বলেই এটা আমার কাছে বস্তুহীন মায়ার মত ঠেকেছে—কিন্তু তোমার এত বড় উপলব্ধিকে আজ আমি মিথ্যা বলব কি করে? আসল কথা হচ্চে এই, যে লোক যে ক্ষেত্রে আছে সে ক্ষেত্রের বাইরের সত্য যদি তার কাছে ছোট হয়ে না থাকে তবে সে ব্যক্তি কাজ করতেই পারে না। এই জন্যই ঈশ্বর দূরের জিনিষকে মানুষের দৃষ্টির কাছে খাটো করে দিয়েছেন—সব সত্যকেই সমান প্রত্যক্ষ করিয়ে তাকে মহা বিপদে ফেলেননি। আমাদের একটা দিক বেছে নিতেই হবে, সব এক সঙ্গে আঁকড়ে ধরবার লোভ ছাড়তেই হবে, নইলে সত্যকেই পাব না। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আজ সত্যের যে মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করচ—আমি সেখানে সে মূর্ত্তিকে অভিবাদন করতে যেতে পারব না—তাহলে আমার জীবনের সত্যকে হারাতে হবে। হয় এদিক্ নয় ওদিক্।

বিনয় কহিল—হয় বিনয়, নয় গোরা। আমি নিজেকে ভরে নিতে দাঁড়িয়েছি, তুমি নিজেকে ত্যাগ করতে দাঁড়িয়েছ।

গোরা অসহিষ্ণু হইয়া কহিল—বিনয়, তুমি মুখে মুখে বই রচনা কোরো না। তোমার কথা শুনে আমি একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, তোমার জীবনে তুমি আজ একটা প্রবল সত্যের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ—তার সঙ্গে ফাঁকি চলে না। সত্যকে উপলব্ধি করলেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে—সে আর থাকবার জো নেই। আমি যে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছি সেই ক্ষেত্রের সত্যকেও অমনি করেই একদিন আমি উপলব্ধি করব এই আমার আকাঙ্ক্ষা। তুমি এতদিন বই-পড়া প্রেমের পরিচয়েই পরিতৃপ্ত ছিলে—আমিও বই-পড়া স্বদেশপ্রেমকেই জানি—প্রেম আজ তোমার কাছে যখনি প্রত্যক্ষ হল তখনি বুঝতে পেরেছ বইয়ের জিনিষের চেয়ে এ কত সত্য—এ তোমার সমস্ত জগৎ চরাচর অধিকার করে বসেছে—কোথাও তুমি এর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্চ না—স্বদেশপ্রেম যে দিন

আমার সম্মুখে এমনি সর্ব্বাঙ্গীণভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সে দিন আমারও আর রক্ষা নাই—সে দিন সে আমার ধন প্রাণ আমার অস্থি মজ্জা রক্ত আমার আকাশ আলোক আমার সমস্তই অনায়াসে আকর্ষণ করে নিতে পারবে ;—স্বদেশের সেই সত্য মূর্ত্তি যে কি আশ্চর্য্য অপরূপ, কি সুনিশ্চিত সুগোচর, তার আনন্দ তার বেদনা যে কি প্রচণ্ড প্রবল, যা বন্যার স্রোতের মত জীবন মৃত্যুকে এক মুহূর্ত্তে লঙ্ঘন করে যায় তা আজ তোমার কথা শুনে মনে মনে অল্প অল্প অনুভব করতে পারচি—তোমার জীবনের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে আজ আঘাত করেছে—তুমি যা পেয়েছ তা আমি কোনো দিন বুঝতে পারব কিনা জানি না—কিন্তু আমি যা পেতে চাই তার আস্বাদ যেন তোমার ভিতর দিয়েই আমি অনুভব করচি।

বলিতে বলিতে গোরা মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া ছাতে বেড়াইতে লাগিল। পূর্ব্বদিকের উষার আভাস তাহার কাছে যেন একটা বাক্যের মত বার্ত্তার মত প্রকাশ পাইল, যেন প্রাচীন তপোবনের একটা বেদমন্ত্রের মত উচ্চারিত হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিল—মুহূর্ত্তের জন্য সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, এবং ক্ষণকালের জন্য তাহার মনে হইল তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটি জ্যোতির্লেখা সূক্ষ্ম মৃণালের ন্যায় উঠিয়া একটি জ্যোতির্ম্ময় শতদলে সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিকশিত হইল—তাহার সমস্ত প্রাণ সমস্ত চেতনা সমস্ত শক্তি যেন ইহাতে একেবারে পরম আনন্দে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

গোরা যখন আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিল তখন সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—বিনয়, তোমার এ প্রেমকেও পার হয়ে আসতে হবে—আমি বলচি ওখানে থামলে চলবে না। আমাকে যে মহাশক্তি আহ্বান করচেন, তিনি যে কত বড় সত্য একদিন তোমাকে আমি তা দেখাব। আমার মনের মধ্যে আজ ভারি আনন্দ হচ্চে—তোমাকে আজ আমি আর কারো হাতে ছেড়ে দিতে পারব না।

বিনয় মাতুর ছাড়িয়া উঠিয়া গোরার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গোরা তাহাকে একটা অপূর্ব্ব উৎসাহে দুই হাত দিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল—কহিল—ভাই বিনয়, আমরা মরব, এক মরণে মরব—আমরা দুজনে এক, আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করবে না কেউ বাধা দিতে পারবে না।

গোরার এই গভীর উৎসাহের বেগ বিনয়েরও হৃদয়ের মধ্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল;—সে কোনো কথা না বলিয়া গোরার এই আকর্ষণে আপনাকে ছাড়িয়া দিল।

গোরা বিনয় দুই জনে নীরবে পাশাপাশি বেড়াইতে লাগিল। পূর্ব্বাকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। গোরা কহিল—ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্চি সে ত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে ফুল দিয়ে পূজো নয়, সেখানে প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে পূজো করতে হবে—আমার কাছে সেইটেই সব চেয়ে বড় আনন্দ মনে হচ্চে—সেখানে সুখ দিয়ে ভোলাবার কিছু নেই—সেখানে নিজের জোরে সম্পূর্ণ জাগতে হবে সম্পূর্ণ দিতে হবে—মাধুর্য্য নয়, এ একটা দুর্জ্জয় দুঃসহ আবির্ভাব—এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ঙ্কর—এর মধ্যে সেই কঠিন ঝঙ্কার আছে যাতে করে সপ্তসুর এক সঙ্গে বেজে উঠে তার ছিঁড়ে পড়ে যায়। মনে করলে আমার বুকের মধ্যে উল্লাস জেগে উঠে—আমার মনে হয় এই আনন্দই পুরুষের আনন্দ—এই হচ্চে জীবনের তাণ্ডব নৃত্য—পুরাতনের প্রলয়যজ্ঞের আগুনের শিখার উপরে নূতনের অপরূপ মূর্ত্তি দেখবার জন্যই পুরুষের সাধনা। রক্তবর্ণ আকাশক্ষেত্রে একটা বন্ধনমুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যৎকে দেখ্‌তে পাচ্চি—আজকেকার এই আসন্ন প্রভাতের মধ্যেই দেখ্‌তে পাচ্চি—দেখ আমার বুকের ভিতরে কে ডমরু বাজাচ্ছে।—বলিয়া বিনয়ের হাত লইয়া গোরা নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল।

বিনয় কহিল—ভাই গোরা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। কিন্তু আমি

তোমাকে বলচি আমাকে কোনো দিন তুমি দ্বিধা করতে দিয়ো না। একেবারে বিধাতার মত নির্দ্দয় হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যেয়ো। আমাদের দুই জনের এক পথ—কিন্তু আমাদের শক্তিত সমান নয়।

গোরা কহিল—আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ভেদ আছে, কিন্তু একটা মহৎ আনন্দে আমাদের ভিন্ন প্রকৃতিকে এক করে দেবে— তোমাতে আমাতে যে ভালবাসা আছে তার চেয়ে বড় প্রেমে আমাদের এক করে দেবে। সেই প্রেম যতক্ষণে সত্য না হবে ততক্ষণে আমাদের দুজনের মধ্যে পদে পদে অনেক আঘাত সংঘাত বিরোধ বিচ্ছেদ ঘটতে থাক্‌বে—তার পরে একদিন আমরা সমস্ত ভুলে গিয়ে আমাদের পার্থক্যকে, আমাদের বন্ধুত্বকেও ভুলে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড একটা প্রচণ্ড আত্মপরিহারের মধ্যে অটল বলে মিলে গিয়ে দাঁড়াতে পারব—সেই কঠিন আনন্দই আমাদের বন্ধুত্বের শেষ পরিণাম হবে।

বিনয় গোরার হাত ধরিয়া কহিল—তাই হোক্।

গোরা কহিল—ততদিন কিন্তু আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দেব। আমার সব অত্যাচার তোমাকে সইতে হবে—কেন না আমাদের বন্ধুত্বকেই জীবনের শেষ লক্ষ্য করে দেখ্‌তে পারব না—যেমন করে হোক্ তাকেই বাঁচিয়ে চল্‌বার চেষ্টা করে তার অসম্মান করব না। এতে যদি বন্ধুত্ব ভেঙে পড়ে তাহলে উপায় নেই কিন্তু যদি বেঁচে থাকে তাহলে বন্ধুত্ব সার্থক হবে।

এমন সময়ে দুইজনে পদশব্দে চমকিয়া উঠিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল আনন্দময়ী ছাতে আসিয়াছেন। তিনি দুই জনের হাত ধরিয়া ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া কহিলেন—চল শোবে চল।

দুই জনেই বলিল—আর ঘুম হবে না মা।

"হবে" বলিয়া আনন্দময়ী দুই বন্ধুকে জোর করিয়া বিছানায় পাশাপাশি শোয়াইয়া দিলেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দুজনের শিয়রে বসিয়া পাখা করিতে বসিলেন।

বিনয় কহিল—মা, তুমি পাখা করতে বসলে কিন্তু আমাদের ঘুম হবে না।

আনন্দময়ী কহিলেন—কেমন না হয় দেখ্‌ব। আমি চলে গেলেই তোমরা আবার কথা আরম্ভ করে দেবে সেটি হচ্চে না।

দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িলে আনন্দময়ী আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় দেখিলেন, মহিম উপরে উঠিয়া আসিতেছেন। আনন্দময়ী কহিলেন—এখন না—কাল সমস্তরাত ওরা ঘুমোয়নি। আমি এই মাত্র ওদের ঘুম পাড়িয়ে আস্‌চি।

মহিম কহিলেন—বাস্‌রে—একেই বলে বন্ধুত্ব! বিয়ের কথাটা উঠেছিল কি জান?

আনন্দময়ী। জানিনে।

মহিম। বোধ হয় একটা কিছু ঠিক হয়ে গেছে। ঘুম ভাঙ্‌বে কখন? শীঘ্র বিয়েটা না হলে বিঘ্ন অনেক আছে।

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন—ওরা ঘুমিয়ে পড়ার দরুণ বিঘ্ন হবে না—আজ দিনের মধ্যেই ঘুম ভাঙ্‌বে।

১৭

বরদাসুন্দরী কহিলেন—তুমি সুচরিতার বিয়ে দেবে না না কি?

পরেশ বাবু তাঁহার স্বাভাবিক শান্ত গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ পাকা দাড়িতে হাত বুলাইলেন—তার পর মৃদু স্বরে কহিলেন—পাত্র কোথায়?

বরদাসুন্দরী কহিলেন, কেন পানুবাবুর সঙ্গে ওর বিবাহের কথা ত ঠিক হয়েই আছে—অন্তত আমরা ত মনে মনে তাই জানি—সুচরিতাও জানে।

পরেশ কহিলেন—পানু বাবুকে রাধারাণীর ঠিক পছন্দ হয় বলে আমার মনে হচ্চে না।

বরদাসুন্দরী। দেখ, ঐ গুলো আমার ভালো লাগে না। সুচরিতাকে আমার আপন মেয়েদের থেকে কোনো দিন তফাৎ করে দেখিনে কিন্তু তাই বলে একথাও ত বলতে হয় উনিই বা কি এমন অসামান্য! পানু বাবুর মত বিদ্বান ধার্ম্মিক লোক যদি ওকে পছন্দ করে থাকে সেটা কি উড়িয়ে দেবার জিনিষ? তুমি যাই বল আমার লাবণ্যকে ত দেখ্‌তে ওর চেয়ে অনেক ভাল কিন্তু আমি তোমাকে বলে দিচ্চি আমরা যাকে পছন্দ করে দেব ও তাকেই বিয়ে করবে, কখনো "না" বল্‌বে না। তোমরা যদি সুচরিতার দেমাক্‌ বাড়িয়ে তোল তা হলে ওর পাত্র মেলাই ভার হবে।

পরেশ ইহার পরে আর কোনো কথাই বলিলেন না। বরদাসুন্দরীর সঙ্গে তিনি কোনো দিন তর্ক করিতেন না। বিশেষত সুচরিতার সম্বন্ধে।

সতীশকে জন্ম দিয়া যখন সুচরিতার মার মৃত্যু হয় তখন সুচরিতার বয়স সাত। তাহার পিতা রামশরণ হালদার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং পাড়ার লোকের অত্যাচারে গ্রাম ছাড়িয়া ঢাকায় আসিয়া আশ্রয় লন। সেখানে পোষ্ট আপিসের কাজে যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন পরেশের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। সুচরিতা তখন হইতে পরেশকে ঠিক নিজের পিতার মতই জানিত।

রামশরণের মৃত্যু হঠাৎ ঘটিয়াছিল। তাঁহার টাকা কড়ি যাহা কিছু ছিল তাহা তাঁহার ছেলে ও মেয়ের নামে দুই ভাগে দান করিয়া তিনি উইলপত্রে পরেশ বাবুকে ব্যবস্থা করিবার ভার দিয়াছিলেন। তখন হইতে সতীশ ও সুচরিতা পরেশের পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

পাঠকেরা পূর্ব্বেই পরিচয় পাইয়াছেন হারান বাবু অত্যন্ত উৎসাহী ব্রাহ্ম; ব্রাহ্মসমাজের সকল কাজেই তাঁহার হাত ছিল;—তিনি নৈশ স্কুলের শিক্ষক, কাগজের সম্পাদক, স্ত্রীবিদ্যালয়ের সেক্রেটারি—কিছুতেই

তাঁহার শ্রান্তি ছিল না। এই যুবকটিই যে একদিন ব্রাহ্মসমাজে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিবে সকলেরই মনে এই আশা ছিল। বিশেষত ইংরেজি ভাষায় তাঁহার অধিকার ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা সম্বন্ধে খ্যাতি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যোগে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল।

এই সকল নানা কারণে অন্যান্য সকল ব্রাহ্মের ন্যায় সুচরিতাও হারান বাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় হারান বাবুর সহিত পরিচয়ের জন্য তাহার মনের মধ্যে বিশেষ ঔৎসুক্যও জন্মিয়াছিল।

অবশেষে বিখ্যাত হারান বাবুর সঙ্গে শুধু যে পরিচয় হইল তাহা নহে অল্প দিনের মধ্যেই সুচরিতার প্রতি তাঁহার হৃদয়ের আকৃষ্টভাব প্রকাশ করিতে হারান বাবু সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। স্পষ্ট করিয়া তিনি যে সুচরিতার নিকট তাঁহার প্রণয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে—কিন্তু সুচরিতার সর্ব্বপ্রকার অসম্পূর্ণতা পূরণ, তাহার ত্রুটি সংশোধন, তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন, তাহার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি এমনি মনোযোগী হইয়া উঠিলেন যে এই কন্যাকে যে তিনি বিশেষভাবে আপনার উপযুক্ত সঙ্গিনী করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা সকলের কাছেই সুগোচর হইয়া উঠিল।

সুচরিতাও যখন বুঝিতে পারিল যে সে বিখ্যাত হারানবাবুর চিত্ত জয় করিয়াছে তখন মনের মধ্যে ভক্তিমিশ্রিত গর্ব্ব অনুভব করিল।

প্রধান পক্ষের নিকট হইতে কোনো প্রস্তাব উপস্থিত না হইলেও হারানবাবুর সঙ্গেই সুচরিতার বিবাহ নিশ্চয় বলিয়া সকলে যখন স্থির করিয়াছিল তখন সুচরিতাও মনে মনে তাহাতে সায় দিয়াছিল এবং হারান-বাবু ব্রাহ্মসমাজের যে সকল হিতসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন কিরূপ শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা সেও তাহার উপযুক্ত হইবে এই তাহার

এক বিশেষ উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিবাহের কল্পনা তাহার কাছে ভয়, সম্ভ্রম ও দুঃসাধ্য দায়িত্ববোধের দ্বারা রচিত একটা পাথরের কেল্লার মত বোধ হইতে লাগিল—তাহা যে কেবল সুখে বাস করিবার তাহা নহে তাহা লড়াই করিবার—তাহা পারিবারিক নহে তাহা ঐতিহাসিক।

এই অবস্থাতেই যদি বিবাহ হইয়া যাইত তবে অন্তত কন্যাপক্ষের সকলেই এই বিবাহকে বিশেষ একটা সৌভাগ্য বলিয়াই জ্ঞান করিত। কিন্তু হারানবাবু নিজের উৎসৃষ্ট মহৎ জীবনের দায়িত্বকে এতই বড় করিয়া দেখিতেন যে কেবল মাত্র ভাল লাগার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ করাকে তিনি নিজের অযোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন। এই বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজ কি পরিমাণে লাভবান হইবে তাহা সম্পূর্ণ বিচার না করিয়া তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। এই কারণে তিনি সেই দিক্ হইতে সুচরিতাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এরূপ ভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে পরীক্ষা দিতেও হয়। হারানবাবু পরেশবাবুর ঘরে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে তাঁহার বাড়ির লোকে যে পানু বলিয়া ডাকিত এ পরিবারেও তাঁহার সেই পানুবাবু নাম প্রচার হইল। এখন তাঁহাকে কেবলমাত্র ইংরেজি বিদ্যার ভাণ্ডার, তত্ত্বজ্ঞানের আধার ও ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের অবতাররূপে দেখা সম্ভবপর হইল না—তিনি যে মানুষ এই পরিচয়টাই সকলের চেয়ে নিকট হইয়া উঠিল। তখন তিনি কেবলমাত্র শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অধিকারী না হইয়া ভাললাগা মন্দলাগার আয়ত্তাধীন হইয়া আসিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হারানবাবুর যে ভাবটা পূর্ব্বে দূর হইতে সুচরিতার ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই ভাবটাই নিকটে আসিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর আছে হারানবাবু তাহার অভিভাবক স্বরূপ হইয়া তাহার

রক্ষকতার ভার লওয়াতে তাঁহাকে অত্যন্ত অসঙ্গতরূপে ছোট দেখিতে হইল। সত্যের সঙ্গে মানুষের যথার্থ সম্বন্ধ ভক্তির সম্বন্ধ—তাহাতে মানুষকে স্বভাবতই বিনয়ী করিয়া তোলে। তাহা না করিয়া যেখানে মানুষকে উদ্ধত ও অহঙ্কৃত করে সেখানে মানুষ আপনার ক্ষুদ্রতাকে সেই সত্যের তুলনাতেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে। এইখানে পরেশ-বাবুর সঙ্গে হারানের প্রভেদ সুচরিতা মনে মনে আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরেশবাবুর শান্ত মুখচ্ছবি দেখিলে, তিনি যে সত্যকে হৃদয়ে বহন করিতেছেন তাহারই মহত্ত্ব চোখে পড়ে কিন্তু হারান-বাবুর সেরূপ নহে—তাঁহার ব্রাহ্মত্ব বলিয়া একটা উগ্র আত্মপ্রকাশ অন্য সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সমস্ত কথায় ও কাজে অশোভনরূপে বাহির হইয়া থাকে।

হারানবাবু ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন বিচারে পরেশবাবুকেও অপরাধী করিতে ছাড়িতেন না তখনই সুচরিতা যেন আহত ফণিনীর মত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। সে সময়ে বাংলাদেশে ইংরাজিশিক্ষিতদলের মধ্যে ভগবদ্‌গীতা লইয়া আলোচনা ছিল না। কিন্তু পরেশবাবু সুচরিতাকে লইয়া মাঝে মাঝে গীতা পড়িতেন—কালীসিংহের মহাভারতও তিনি প্রায় সমস্তটা সুচরিতাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। হারান-বাবুর কাছে তাহা ভাল লাগে নাই। এ সমস্ত গ্রন্থ তিনি ব্রাহ্মপরিবার হইতে নির্ব্বাসিত করিবার পক্ষপাতী। তিনি নিজেও এগুলি পড়েন নাই। রামায়ণ মহাভারত ভগবদ্‌গীতাকে তিনি হিন্দুদের সামগ্রী বলিয়া স্বতন্ত্র রাখিতে চাহিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে বাইবল্‌ই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। পরেশবাবু যে তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চা এবং ছোটখাট নানা বিষয়ে ব্রাহ্ম অব্রাহ্মের সীমা রক্ষা করিয়া চলিতেন না, তাহাতে হারানের গায়ে যেন কাঁটা বিঁধিত। পরেশের আচরণে প্রকাশ্যে বা মনে মনে কেহ কোনো প্রকার দোষারোপ করিবে এমন স্পর্দ্ধা সুচরিতা কখনই সহিতে

পারে না। এবং এইরূপ স্পর্দ্ধা প্রকাশ হইয়া পড়াতেই হারান সুচরিতার কাছে খাটো হইয়া গেছেন।

হারানবাবুর সাম্প্রদায়িক উৎসাহের অত্যাচারে এবং সঙ্কীর্ণ নীরসতায় যদিও সুচরিতার মন ভিতরে ভিতরে প্রতিদিন তাঁহার উপর হইতে বিমুখ হইতেছিল তথাপি হারানবাবুর সঙ্গেই যে তাহার বিবাহ হইবে এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষের মনে কোনো তর্ক বা সন্দেহ ছিল না। ধর্ম্মসামাজিক দোকানে যে ব্যক্তি নিজের উপরে খুব বড় অক্ষরে উচ্চ মূল্যের টিকিট মারিয়া রাখে অন্য লোকেও ক্রমে ক্রমে তাহার দুর্ম্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লয়। এমন কি, পরেশবাবুও হারানবাবুর দাবী মনে মনে অগ্রাহ্য করেন নাই। সকলেই হারানবাবুকে ব্রাহ্মসমাজের ভাবী অবলম্বনস্বরূপ জ্ঞান করিত, তিনিও বিরুদ্ধ বিচার না করিয়া তাহাতে সায় দিতেন। এজন্য হারানবাবুর মত লোকের পক্ষে সুচরিতা যথেষ্ট হইবে কিনা ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল; সুচরিতার পক্ষে হারানবাবু কি পর্য্যন্ত উপাদেয় হইবে তাহা তাঁহার মনেও হয় নাই।

এই বিবাহপ্রস্তাবে কেহই যেমন সুচরিতার কথাটা ভাবা আবশ্যক বোধ করে নাই সুচরিতাও তেমনি নিজের কথা ভাবে নাই। ব্রাহ্মসমাজের সকল লোকেরই মতো সেও ধরিয়া লইয়াছিল যে হারানবাবু যেদিন বলিবেন আমি এই কন্যাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি সেই দিনই সে এই বিবাহরূপ তাহার মহৎকর্ত্তব্য স্বীকার করিয়া লইবে।

এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। এমন সময় সেদিন, গোরাকে উপলক্ষ করিয়া হারানবাবুর সঙ্গে সুচরিতার যে দুই চারিটি উষ্ণবাক্যের আদান প্রদান হইয়া গেল তাহার সুর শুনিয়াই পরেশের মনে সংশয় উপস্থিত হইল যে সুচরিতা হারানবাবুকে হয় ত যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে না—হয় ত উভয়ের স্বভাবের মধ্যে মিল না হইবার কারণ আছে। এই জন্যই বরদাসুন্দরী যখন বিবাহের জন্য তাগিদ দিতেছিলেন তখন পরেশ তাহাতে

পূর্ব্বের মত সায় দিতে পারিলেন না। সেই দিনই বরদাসুন্দরী সুচরিতাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন—তুমি যে তোমার বাবাকে ভাবিয়ে তুলেছ।

শুনিয়া সুচরিতা চমকিয়া উঠিল—সে যে ভুলিয়াও পরেশবাবুর উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিবে ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় তাহার পক্ষে কিছুই হইতে পারে না। সে মুখ বিবর্ণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন, আমি কি করেছি?

বরদাসুন্দরী। কি জানি বাছা! তাঁর মনে হয়েছে যে তুমি পানুবাবুকে পছন্দ কর না। ব্রাহ্মসমাজের সকল লোকেই জানে পানুবাবুর সঙ্গে তোমার বিবাহ এক রকম স্থির—এ অবস্থায় যদি তুমি—

সুচরিতা। কই, মা, আমি ত এসম্বন্ধে কোনো কথাই কাউকে বলিনি।

সুচরিতার আশ্চর্য্য হইবার কারণ ছিল। সে হারানবাবুর ব্যবহারে বরাবর বিরক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু বিবাহ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সে কোনো-দিন মনেও কোনো চিন্তা করে নাই। কারণ, এ বিবাহ যে সুখ দুঃখের দিক দিয়া বিচার্য্য নহে ইহাই সে জানিত।

তখন তাহার মনে পড়িল সেদিন পরেশবাবুর সামনেই পানুবাবুর প্রতি সে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাতেই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন মনে করিয়া তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। এমন অসংযম ত সে পূর্ব্বে কোনোদিন প্রকাশ করে নাই, পরেও কখনো করিবে না বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিল।

আজ হারান বাবু আসিতেই বরদাসুন্দরী তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন—আচ্ছা, পানুবাবু, আপনি আমাদের সুচরিতাকে বিবাহ করবেন এই কথা সকলেই বলে কিন্তু আপনার মুখ থেকে ত কোনো দিন কোনো কথা শুনতে পাইনে। যদি সত্যই আপনার এরকম অভিপ্রায় থাকে তাহলে স্পষ্ট করে বলেন না কেন?

হারান বাবু আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। এখন সুচরিতাকে তিনি কোনো মতে বন্দী করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হন—তাঁহার প্রতি ভক্তির ও ব্রাহ্মসমাজের হিতকল্পে যোগ্যতার পরীক্ষা পরে করিলেও চলিবে। হারান বাবু বরদাসুন্দরীকে কহিলেন—এ কথা বলা বাহুল্য বলেই বলিনি। সুচরিতার আঠারো বছর বয়সের জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেম।

বরদাসুন্দরী কহিলেন—আপনার আবার একটু বাড়াবাড়ি আছে। আমরাত চোদ্দ বছর হলেই যথেষ্ট মনে করি।

সে দিন চা খাইবার টেবিলে পরেশ বাবু সুচরিতার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সুচরিতা হারান বাবুকে এত যত্ন অভ্যর্থনা অনেক দিন করে নাই। এমন কি হারানবাবু যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন তখন তাহাকে লাবণ্যের নূতন একটা শিল্পকলার পরিচয় দিবার উপলক্ষে আরো একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

পরেশ বাবুর মন নিশ্চিন্ত হইল। তিনি ভাবিলেন তিনি ভুল করিয়াছেন। এমন কি, তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন। ভাবিলেন এই দুই জনের মধ্যে হয়ত নিগূঢ় একটা প্রণয়কলহ ঘটিয়াছিল, আবার সেটা মিটমাট হইয়া গেছে।

সেই দিন বিদায় হইবার সময় হারান পরেশবাবুর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাড়িলেন। জানাইলেন এ সম্বন্ধে বিলম্ব করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই।

পরেশ বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—কিন্তু আপনি যে আঠারো বছরের কমে মেয়েদের বিয়ে হওয়া অন্যায় বলেন। এমন কি, আপনি কাগজেও সে কথা লিখেছেন।

হারান বাবু কহিলেন—সুচরিতার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কারণ ওর মনের যে রকম পরিণতি হয়েছে অনেক বড় বয়সের মেয়েরও এমন দেখা যায় না।

পরেশবাবু প্রশান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কহিলেন—তা হোক্ 'পানু বাবু।

যখন বিশেষ কোনো অহিত দেখা যাচ্চে না তখন আপনার মত অনুসারে রাধারাণীর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

হারান বাবু নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হওয়ায় লজ্জিত হইয়া কহিলেন —নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। কেবল আমার ইচ্ছা এই যে এক দিন সকলকে ডেকে ঈশ্বরের নাম করে সম্বন্ধটা পাকা করা হোক্।

পরেশ বাবু কহিলেন—সে অতি উত্তম প্রস্তাব।

১৮

ঘণ্টা দুই তিন নিদ্রার পর যখন গোরা ঘুম ভাঙিয়া পাশে চাহিয়া দেখিল বিনয় ঘুমাইতেছে তখন তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। স্বপ্নে একটা প্রিয় জিনিষ হারাইয়া জাগিয়া উঠিয়া যখন দেখা যায় তাহা হারায় নাই তখন যেমন আরাম বোধ হয় গোরার সেইরূপ হইল। বিনয়কে ত্যাগ করিলে গোরার জীবন যে কতখানি পঙ্গু হইয়া পড়ে আজ নিদ্রাভঙ্গে বিনয়কে পাশে দেখিয়া তাহা সে অনুভব করিতে পারিল। এই আনন্দের আঘাতে চঞ্চল হইয়া গোরা ঠেলাঠেলি করিয়া বিনয়কে জাগাইয়া দিল এবং কহিল, চল, একটা কাজ আছে।

গোরার প্রত্যহ সকালবেলায় একটা নিয়মিত কাজ ছিল। সে পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরে যাতায়াত করিত। তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবার জন্য নহে—নিতান্তই তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্যই যাইত। শিক্ষিত দলের মধ্যে তাহার এরূপ যাতায়াতের সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। গোরাকে ইহারা দাদাঠাকুর বলিত এবং কড়িবাঁধা হুঁকা দিয়া অভ্যর্থনা করিত। কেবলমাত্র ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্যই গোরা জোর করিয়া তামাক খাওয়া ধরিয়াছিল।

এই দলের মধ্যে নন্দ গোরার সর্ব্বপ্রধান ভক্ত ছিল। নন্দ ছুতারের

ছেলে। বয়স বাইস। সে তাহার বাপের দোকানে কাঠের বাক্স তৈয়ারি করিত। ধাপার মাঠে শিকারীর দলে নন্দর মত অব্যর্থ বন্দুকের লক্ষ্য কাহারো ছিল না। ক্রিকেট খেলায় গোলা ছুঁড়িতেও সে অদ্বিতীয় ছিল।

গোরা তাহার শিকার ও ক্রিকেটের দলে ভদ্র ছাত্রদের সঙ্গে এই সকল ছুতার কামারের ছেলেদের একসঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছিল। এই মিশ্রিত দলের মধ্যে নন্দ সকল প্রকার খেলায় ও ব্যায়ামে সকলের সেরা ছিল। ভদ্র ছাত্ররা কেহ কেহ তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল কিন্তু গোরার শাসনে সকলেরই তাহাকে দলপতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইত।

এই নন্দর পায়ে কয়েকদিন হইল একটা বাটালি পড়িয়া গিয়া ক্ষত হওয়ায় সে খেলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। বিনয়কে লইয়া এই কয়দিন গোরার মন বিকল ছিল। সে তাহাদের বাড়িতে যাইতে পারে নাই। আজ প্রভাতেই বিনয়কে সঙ্গে করিয়া সে ছুতার পাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।

নন্দদের দোতলা খোলার ঘরের দ্বারের কাছে আসিতেই ভিতর হইতে মেয়েদের কান্নার শব্দ শোনা গেল। নন্দর বাপ বা অন্য পুরুষ অভিভাবক বাড়িতে নাই। পাশে একটি তামাকের দোকান ছিল তাহার কর্ত্তা আসিয়া কহিল—নন্দ আজ ভোরবেলায় মারা পড়িয়াছে তাহাকে দাহ করিতে লইয়া গেছে।

নন্দ মারা গিয়াছে! এমন স্বাস্থ্য, এমন শক্তি, এমন তেজ, এমন হৃদয়, এত অল্প বয়স—সেই নন্দ আজ ভোর বেলায় মারা গিয়াছে। সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া গোরা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নন্দ একজন সামান্য ছুতারের ছেলে—তাহার অভাবে ক্ষণকালের জন্য সংসারে যেটুকু ফাঁক পড়িল তাহা অতি অল্প লোকেরই চোখে পড়িবে কিন্তু আজ গোরার

কাছে নন্দর মৃত্যু নিদারুণরূপে অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া ঠেকিল। গোরা যে দেখিয়াছে তাহার প্রাণ ছিল—এত লোক ত বাঁচিয়া আছে কিন্তু তাহার মত এত প্রচুর প্রাণ কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়!

কি করিয়া তাহার মৃত্যু হইল খবর লইতে গিয়া শোনা গেল যে তাহার ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছিল। নন্দর বাপ ডাক্তার আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু নন্দর মা জোর করিয়া বলিল তাহার ছেলেকে ভূতে পাইয়াছে। ভূতের ওঝা কাল সমস্ত রাত তাহার গায়ে ছেঁকা দিয়াছে, তাহাকে মারিয়াছে এবং মন্ত্র পড়িয়াছে। ব্যামোর আরম্ভে গোরাকে খবর দিবার জন্য নন্দ একবার অনুরোধ করিয়াছিল—কিন্তু পাছে গোরা আসিয়া ডাক্তারী মতে চিকিৎসা করিবার জন্য জেদ করে এই ভয়ে নন্দর মা কিছুতেই গোরাকে খবর পাঠাইতে দেয় নাই।

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় বিনয় কহিল—কি মূঢ়তা, আর তার কি ভয়ানক শাস্তি!

গোরা কহিল—এই মূঢ়তাকে একপাশে সরিয়ে রেখে তুমি নিজে এর বাইরে আছ মনে করে সান্ত্বনালাভ কোরো না বিনয়! এই মূঢ়তা যে কত বড়, আর এর শাস্তি যে কতখানি তা যদি স্পষ্ট করে দেখতে পেতে তা হলে ঐ একটা আক্ষেপোক্তি মাত্র প্রকাশ করে ব্যাপারটাকে নিজের কাছ থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে না!

মনের উত্তেজনার সঙ্গে গোরার পদক্ষেপ ক্রমশই দ্রুত হইতে লাগিল। বিনয় তাহার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া তাহার সঙ্গে সমান পা রাখিয়া চলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

গোরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—না বিনয়, এ আমি কিছুতেই সহজে সহ্য করতে পারব না। ঐযে ভূতের ওঝা এসে আমার নন্দকে মেরে গেছে তার মার আমাকে লাগ্‌চে, আমার সমস্ত

দেশকে লাগচে। আমি এই সব ব্যাপারকে এক একটা ছোট এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে কোন মতেই দেখতে পারিনে।

তথাপি বিনয়কে নিরুত্তর দেখিয়া গোরা গর্জ্জিয়া উঠিল—বিনয়, আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি মনে মনে কি ভাব্‌চ! তুমি ভাব্‌চ এর প্রতিকার নেই কিম্বা প্রতিকারের সময় উপস্থিত হতে অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু আমি এরকম করে ভাবতে পারিনে; যদি ভাবতুম তা হলে বাঁচতে পারতুম না। যা কিছু আমার দেশকে আঘাত করচে তার প্রতিকার আছেই তা সে যত বড় প্রবল হোক—এবং একমাত্র আমাদের হাতেই তার প্রতিকার আছে এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে বলেই আমি চারিদিকের এত দুঃখ দুর্গতি অপমান সহ্য করতে পারচি।

বিনয় কহিল—এত বড় দেশজোড়া প্রকাণ্ড দুর্গতির সাম্‌নে বিশ্বাসকে খাড়া করে রাখতে আমার সাহসই হয় না।

গোরা কহিল—দুর্গতি চিরস্থায়ী হতে পারে একথা আমি কোনো ক্রমেই বিশ্বাস করতে পারিনে—সমস্ত বিশ্বের জ্ঞানশক্তি প্রাণশক্তি তাকে ভিতরে বাহিরে কেবলি আঘাত করচে। বিনয়, আমি তোমাকে বারবার বলছি একথা এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নেও অসম্ভব বলে মনে করো না যে আমাদের এই দেশ মুক্ত হবেই। এই কথা মনে দৃঢ় রেখে প্রতিদিনই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার জন্য ভবিষ্যতের কোন্ এক তারিখে লড়াই আরম্ভ হবে তোমরা তারই উপর বরাৎ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ। আমি বল্‌চি লড়াই আরম্ভ হয়েছে প্রতি মুহূর্ত্তে লড়াই চলচে, এ সময়ে যদি তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পার তাহলে তার চেয়ে কাপুরুষতা তোমাদের কিছুই হতে পারে না।

বিনয় কহিল—দেখ গোরা, তোমার সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ আমি এই দেখতে পাই যে, পথে ঘাটে আমাদের দেশে প্রতিদিন যা

ঘট্‌চে এবং অনেকদিন ধরেই যা ঘটে আস্‌চে তুমি প্রত্যহই তাকে যেন নূতন চোখে দেখতে পাও। নিজের নিশ্বাস প্রশ্বাসকে আমরা যেমন ভুলে থাকি এগুলোও আমাদের কাছে তেমনি—এতে আমাদের আশাও দেয় না, হতাশও করে না, এতে আমাদের আনন্দ নেই দুঃখও নেই—দিনের পর দিন অত্যন্ত শূন্য ভাবে চলে যাচ্ছে, চারিদিকের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের দেশকে অনুভবমাত্র করচিনে।

হঠাৎ গোরার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া তাহার কপালের শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিল—সে দুই হাত মুঠা করিয়া রাস্তার মাঝখানে এক জুড়ি গাড়ির পিছনে ছুটিতে লাগিল—এবং বজ্রগর্জ্জনে সমস্ত রাস্তার লোককে চকিত করিয়া চীৎকার করিল—থামাও গাড়ি! একটা মোটা ঘড়ির চেনপরা বাবু গাড়ি হাঁকাইতেছিল সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া দুই তেজস্বী ঘোড়াকে চাবুক কসাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক ঝাঁকা ফল সবজি আণ্ডা রুটি মাখন প্রভৃতি আহার্য্য সামগ্রী লইয়া কোনো ইংরেজ প্রভুর পাকশালার অভিমুখে চলিতেছিল। চেনপরা বাবুটি তাহাকে গাড়ির সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য হাঁকিয়াছিল, বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়াতে গাড়ি প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। কোনোমতে তাহার প্রাণ বাঁচিল কিন্তু ঝাঁকাসমেত জিনিষগুলা রাস্তায় গড়াগড়ি গেল এবং ক্রুদ্ধ বাবু কোচবাক্স হইতে ফিরিয়া তাহাকে ড্যাম শুয়ার বলিয়া গালি দিয়া তাহার মুখের উপর সপাং করিয়া চাবুক বসাইয়া দিতে তাহার কপালে রক্তের রেখা দেখা দিল। বৃদ্ধ আল্লা বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া যে জিনিষগুলা নষ্ট হয় নাই তাহাই বাছিয়া ঝাঁকায় তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। গোরা ফিরিয়া আসিয়া বিকীর্ণ জিনিষগুলা নিজে কুড়াইয়া তাহার ঝাঁকায় উঠাইতে লাগিল। মুসলমান মুটে ভদ্রলোক পথিকের এই ব্যবহারে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—আপনি কেন কষ্ট করচেন বাবু, এ আর কোনো কাজে লাগবে

না। গোরা এ কাজের অনাবশ্যকতা জানিত এবং সে ইহাও জানিত যাহার সাহায্য করা হইতেছে সে লজ্জা অনুভব করিতেছে—বস্তুত সাহায্য হিসাবে এরূপ কাজের বিশেষ মূল্য নাই—কিন্তু এক ভদ্রলোক যাহাকে অন্যায় অপমান করিয়াছে আর এক ভদ্রলোক সেই অপমানিতের সঙ্গে নিজেকে সমান করিয়া ধর্ম্মের ক্ষুব্ধ ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনিতে চেষ্টা করিতেছে একথা রাস্তার লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। ঝাঁকা ভর্ত্তি হইলে গোরা তাহাকে বলিল, যা লোকসান গেছে সে ত তোমার সইবে না। চল আমাদের বাড়ি চল, আমি সমস্ত পূরো দাম দিয়ে কিনে নেব। কিন্তু বাবা একটা কথা তোমাকে বলি তুমি কথাটি না বলে যে অপমান সহ্য করলে আল্লা তোমাকে এজন্য মাপ করবেন না।

মুসলমান কহিল—যে দোষী, আল্লা তাকেই শাস্তি দেবেন আমাকে কেন দেবেন?

গোরা কহিল—যে অন্যায় সহ্য করে সেও দোষী, কেন না সে জগতে অন্যায়ের সৃষ্টি করে। আমার কথা বুঝবে না কিন্তু তবু মনে রেখো ভালমানুষী ধর্ম্ম নয়, তাতে দুষ্ট মানুষকে বাড়িয়ে তোলে, তোমাদের মহম্মদ সে কথা বুঝতেন তাই তিনি ভালমানুষ সেজে ধর্ম্মপ্রচার করেন নি।

সেখান হইতে গোরাদের বাড়ি নিকট নয় বলিয়া গোরা সেই মুসলমানকে বিনয়ের বাসায় লইয়া গেল। বিনয়ের দেরাজের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বিনয়কে কহিল—টাকা বের কর।

বিনয় কহিল—তুমি ব্যস্ত হচ্চ কেন, বোসগে না, আমি দিচ্চি। বলিয়া হঠাৎ চাবি খুঁজিয়া পাইল না। অধীর গোরা এক টান দিতেই দুর্ব্বল দেরাজ বদ্ধ চাবির বাধা না মানিয়া খুলিয়া গেল।

দেরাজ খুলিতেই পরেশবাবুর পরিবারের সকলে একত্রে তোলা একটা বড় ফোটোগ্রাফ সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িল। এটি বিনয় তাহার বালক বন্ধু সতীশের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল।

টাকা সংগ্রহ করিয়া গোরা সেই মুসলমানকে বিদায় করিল কিন্তু ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিল না। গোরাকে এ সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিনয়ও কোনো কথা তুলিতে পারিল না— অথচ দুই চারিটা কথা হইয়া গেলে বিনয়ের মন সুস্থ হইত।

গোরা হঠাৎ বলিল—চল্লুম।

বিনয় কহিল—বাঃ, তুমি একলা যাবে কি! মা যে আমাকে তোমাদের ওখানে খেতে বলেছেন। অতএব আমিও চল্লুম।

দুইজনে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বাকি পথ গোরা আর কোনো কথা কহিল না। ডেস্কের মধ্যে ঐ ছবিখানি দেখিয়া গোরাকে আবার সহসা স্মরণ করাইয়া দিল যে বিনয়ের চিত্তের একটা প্রধান ধারা এমন একটা পথে চলিয়াছে, যে পথের সঙ্গে গোরার জীবনের কোনো সম্পর্ক নাই।

গোরা যে কেন চুপ করিয়া গেল বিনয় তাহা বুঝিল। কিন্তু এই নীরবতার বেড়া গায়ে পড়িয়া ঠেলিয়া ভাঙিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইল। গোরার মনটা যে জায়গায় আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে একটা সত্যকার ব্যবধান আছে ইহা বিনয় নিজেও অনুভব করে।

বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিতেই দেখা গেল মহিম পথের দিকে চাহিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দুই বন্ধুকে দেখিয়া তিনি কহিলেন— ব্যাপারখানা কি! কাল ত তোমাদের সমস্ত রাত না ঘুমিয়েই কেটেছে —আমি ভাবছিলুম দুজনে বুঝি বা ফুটপাথের উপরে কোথাও আরামে ঘুমিয়ে পড়েছ! বেলা ত কম হয় নি। যাও বিনয় নাইতে যাও।

বিনয়কে তাগিদ করিয়া নাহিতে পাঠাইয়া মহিম গোরাকে লইয়া পড়িলেন—কহিলেন, দেখ গোরা, তোমাকে যে কথাটা বলেছিলুম সেটা একটু বিবেচনা করে দেখো। বিনয়কে যদি তোমার অনাচারী বলে সন্দেহ হয় তাহলে আজকালকার বাজারে হিন্দু পাত্র পাব কোথায়? শুধু

হিঁদুয়ানি হলেও ত চল্‌বে না—লেখাপড়াও ত চাই! ঐ লেখাপড়াতে হিঁদুয়ানিতে মিল্‌লে যে পদার্থটা হয় সেটা আমাদের হিন্দুমতে ঠিক শাস্ত্রীয় জিনিষ নয় বটে কিন্তু মন্দ জিনিষও নয়। যদি তোমার মেয়ে থাক্‌ত তা হলে এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তোমার মতের ঠিক মিল হয়ে যেত।

গোরা কহিল—তা বেশ ত—বিনয় বোধ হয় আপত্তি করবে না।

মহিম কহিল—শোন একবার! বিনয়ের আপত্তির জন্যে কে ভাব্‌চে! তোমার আপত্তিকেই ত ডরাই! তুমি নিজের মুখে একবার বিনয়কে অনুরোধ কর; আমি আর কিছু চাইনে—তাতে যদি ফল না হয় ত না হবে।

গোরা কহিল—আচ্ছা।

মহিম মনে মনে কহিল—এইবার ময়রার দোকানে সন্দেশ এবং গয়লার দোকানে দই ক্ষীর ফরমাস দিতে পারি!

গোরা অবসরক্রমে বিনয়কে কহিল—শশিমুখীর সঙ্গে তোমার বিবাহের জন্য দাদা ভারি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেচেন। এখন তুমি কি বল?

বিনয়। আগে তোমার কি ইচ্ছা সেইটে বল।

গোরা। আমি ত বলি মন্দ কি!

বিনয়। আগে ত তুমি মন্দই বল্‌তে! আমরা দুজনের কেউ বিয়ে করব না এ ত একরকম ঠিক হয়েই ছিল।

গোরা। এখন ঠিক করা গেল তুমি বিয়ে করবে আর আমি করব না।

বিনয়। কেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?

গোরা। পৃথক ফল হবার ভয়েই এই ব্যবস্থা করা যাচ্চে। বিধাতা কোনো কোনো মানুষকে সহজেই বেশি ভারগ্রস্ত করে গড়ে থাকেন, কেউবা সহজেই দিব্য ভারহীন—এই উভয় জীবকে একত্রে জুড়ে চালাতে

গেলে এদের একটির উপর বাইরে থেকে বোঝা চাপিয়ে দুজনের ওজন সমান করে নিতে হয়। তুমি বিবাহ করে একটু দায়গ্রস্ত হলে পর তোমাতে আমাতে সমান চালে চল্‌তে পারব।

বিনয় একটু হাসিল এবং কহিল,—যদি সেই মৎলব হয় তবে এই দিকেই বাট্‌খারাটি চাপাও!

গোরা। বাট্‌খারাটি সম্বন্ধে আপত্তি নেই ত?

বিনয়। ওজন সমান করবার জন্যে যা হাতের কাছে আসে তাতেই কাজ চালানো যেতে পারে। ও পাথর হলেও হয়, ঢ্যালা হলেও হয়, যা খুসি।

গোরা যে বিবাহ প্রস্তাবে কেন উৎসাহ প্রকাশ করিল তাহা বিনয়ের বুঝিতে বাকি রহিল না। পাছে বিনয় পরেশবাবুর পরিবারের মধ্যে বিবাহ করিয়া বসে গোরার মনে এই সন্দেহ হইয়াছে অনুমান করিয়া বিনয় মনে মনে হাসিল। মধ্যাহ্নে আহারান্তে রাত্রের নিদ্রার ঋণশোধ করিতে দিন কাটিয়া গেল। সেদিন দুই বন্ধুর মধ্যে আর কোনো কথা হইল না কেবল জগতের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারের পর্দ্দা পড়িলে প্রণয়ীদের মধ্যে যখন মনের পর্দ্দা উঠিয়া যায় সেই সময় বিনয় ছাতের উপর বসিয়া সিধা আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল—দেখ, গোরা, একটা কথা আমি তোমাকে বলতে চাই। আমার মনে হয় আমাদের স্বদেশপ্রেমের মধ্যে একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। আমরা ভারতবর্ষকে আধখানা করে দেখি।

গোরা। কেন বল দেখি?

বিনয়। আমরা ভারতবর্ষকে কেবল পুরুষের দেশ বলেই দেখি, মেয়েদের একেবারেই দেখিনে।

গোরা। তুমি ইংরেজদের মত মেয়েদের বুঝি ঘরে বাইরে, জলে স্থলে শূন্যে, আহারে আমোদে কর্ম্মে সর্ব্বত্রই দেখ্‌তে চাও—তাতে ফল

হবে এই যে পুরুষের চেয়ে মেয়েকেই বেশি করে দেখ্‌তে থাকবে—তাতেও দৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট হবে।

বিনয়। না, না, তুমি আমার কথাটাকে ও রকম করে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না। ইংরেজের মত করে দেখ্‌ব কি না দেখ্‌ব সে কথা কেন তুলচ! আমি বল্‌চি এটা সত্য যে স্বদেশের মধ্যে মেয়েদের অংশকে আমাদের চিন্তার মধ্যে আমরা যথাপরিমাণে আনিনে। তোমার কথাই আমি বল্‌তে পারি তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে এক মুহূর্ত্তও ভাব না—দেশকে তুমি যেন নারীহীন করে জান—সে রকম জানা কখনই সত্য জানা নয়।

গোরা। আমি যখন আমার মাকে দেখেচি, মাকে জেনেছি তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রীলোককে সেই এক জায়গায় দেখেছি এবং জেনেছি।

বিনয়। ওটা তুমি নিজেকে ভোলাবার জন্যে একটা সাজিয়ে কথা বল্লে মাত্র। ঘরের কাজের মধ্যে ঘরের লোকে ঘরের মেয়েদের অতিপরিচিত ভাবে দেখ্‌লে তাতে যথার্থ দেখাই হয় না। জানি ইংরেজের সমাজের সঙ্গে কোনো রকম তুলনা করতে গেলেই তুমি আগুন হয়ে উঠ্‌বে—আমি তা করতে চাইনে—আমি জানিনে ঠিক কতটা পরিমাণে এবং কি রকম ভাবে আমাদের মেয়েরা সমাজে প্রকাশ পেলে তাদের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না হয় কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে মেয়েরা প্রচ্ছন্ন থাকাতে আমাদের স্বদেশ আমাদের কাছে অর্দ্ধ-সত্য হয়ে আছে—আমাদের হৃদয়ে পূর্ণপ্রেম এবং পূর্ণশক্তি দিতে পারচে না।

গোরা। দিন আর রাত্রি—সময়ের এই যেমন দুটো ভাগ—পুরুষ এবং মেয়েও তেমনি সমাজের দুই অংশ। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতই প্রচ্ছন্ন—তার সমস্ত কাজ নিগূঢ় এবং নিভৃত। যেখানে সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থা সেখানে রাতকে জোর করে দিন করে তোলে—সেখানে গ্যাস জ্বালিয়ে কল চালানো হয়, বাতি জ্বালিয়ে

সমস্ত রাত নাচ গান হয়—তাতে ফল কি হয়! ফল এই হয় যে, রাত্রির যে স্বাভাবিক নিভৃত কাজ তা নষ্ট হয়ে যায়, ক্লান্তি বাড়তে থাকে, ক্ষতিপূরণ হয় না, মানুষ উন্মত্ত হয়ে উঠে। মেয়েদেরও যদি তেমনি আমরা প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে টেনে আনি তাহলে তাদের নিগূঢ় কর্ম্মের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়—তাতে সমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তিভঙ্গ হয়, সমাজে একটা মত্ততা প্রবেশ করে। সেই মত্ততাকে হঠাৎ শক্তি বলে ভ্রম হয়, কিন্তু সে শক্তি বিনাশ করবারই শক্তি। নরনারী সমাজ-শক্তির দুই দিক ;—পুরুষই ব্যক্ত, কিন্তু ব্যক্ত বলেই যে মস্ত তা নয়—নারী অব্যক্ত, এই অব্যক্ত শক্তিকে যদি কেবলি ব্যক্ত করবার চেষ্টা করা হয় তাহলে সমস্ত মূলধন খরচ করে ফেলে সমাজকে দ্রুতবেগে দেউলে করবার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই জন্যে বল্‌চি আমরা পুরুষরা যদি থাকি যজ্ঞের ক্ষেত্রে আর মেয়েরা যদি থাকেন ভাঁড়ার আগ্‌লে তাহলেই মেয়েরা অদৃশ্য থাক্‌লেও যজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে। সব শক্তিকেই একই দিকে একই জায়গায় একই রকমে খরচ করতে চায় যারা তারা উন্মত্ত।

বিনয়। গোরা, তুমি যা বল্লে আমি তার প্রতিবাদ কর্‌তে চাইনে—কিন্তু আমি যা বল্‌ছিলুম তুমিও তার প্রতিবাদ করনি। আসল কথা—

গোরা। দেখ বিনয় এর পরে একথাটা নিয়ে আর অধিক যদি বকাবকি করা যায় তা হলে সেটা নিতান্ত তর্ক হয়ে দাঁড়াবে। আমি স্বীকার করচি তুমি সম্প্রতি মেয়েদের সম্বন্ধে যতটা সচেতন হয়ে উঠেচ আমি ততটা হইনি—সুতরাং তুমি যা অনুভব করচ আমাকেও তাই অনুভব করবার চেষ্টা করা কখনো সফল হবে না। অতএব এ সম্বন্ধে আপাতত আমাদের মতভেদ রইল বলেই মেনে নেওয়া যাক্‌না।

গোরা কথাটাকে উড়াইয়া দিল। কিন্তু বীজকে উড়াইয়া দিলেও সে মাটিতে পড়ে এবং মাটিতে পড়িলে সুযোগমত অঙ্কুরিত হইতে বাধা থাকে না। এ পর্য্যন্ত জীবনের ক্ষেত্র হইতে গোরা স্ত্রীলোককে

একেবারেই সরাইয়া রাখিয়াছিল—সেটাকে একটা অভাব বা ক্ষতি বলিয়া সে কখনো স্বপ্নেও অনুভব করে নাই। আজ বিনয়ের অবস্থান্তর দেখিয়া সংসারে স্ত্রীজাতির বিশেষ সত্তা ও প্রভাব তাহার কাছে গোচর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার স্থান কোথায়, ইহার প্রয়োজন কি, তাহা সে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই, এই জন্য বিনয়ের সঙ্গে একথা লইয়া তর্ক করিতে তাহার ভাল লাগে না। বিষয়টাকে সে অস্বীকার করিতেও পারে না, আয়ত্ত করিতেও পারিতেছে না; এই জন্য ইহাকে আলোচনার বাহিরে রাখিতে চায়।

রাত্রে বিনয় যখন বাসায় ফিরিতেছিল, তখন আনন্দময়ী তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—শশিমুখীর সঙ্গে বিনয় তোর বিবাহ নাকি ঠিক হয়ে গেছে?

বিনয় সলজ্জ হাস্যের সহিত কহিল—হাঁ, মা,—গোরা এই শুভ কর্ম্মের ঘটক।

আনন্দময়ী কহিল—শশিমুখী মেয়েটি ভাল কিন্তু বাছা ছেলেমানুষি কোরোনা। আমি তোমার মন জানি বিনয়—একটু দোমনা হয়েছ বলেই তাড়াতাড়ি এ কাজ করে ফেলচ। এখনো বিবেচনা করে দেখবার সময় আছে;—তোমার বয়স হয়েছে বাবা—এত বড় একটা কাজ অশ্রদ্ধা করে কোরো না।—বলিয়া বিনয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। বিনয় কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

১৯

বিনয় আনন্দময়ীর কথা কয়টি ভাবিতে ভাবিতে বাসায় গেল। আনন্দময়ীর মুখের একটি কথাও এ পর্য্যন্ত বিনয়ের কাছে কোনোদিন উপেক্ষিত হয় নাই। সে রাত্রে তাহার মনের মধ্যে একটা ভার চাপিয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে যেন একটা মুক্তির ভাব অনুভব করিল। তাহার মনে হইল গোরার বন্ধুত্বকে সে একটা খুব বড় দাম দিয়া চুকাইয়া দিয়াছে। একদিকে শশিমুখীকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়া সে জীবন-ব্যাপী যে একটা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে ইহার পরিবর্ত্তে আর একদিকে তাহার বন্ধন আল্‌গা দিবার অধিকার হইয়াছে। বিনয় সমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করিবার জন্য লুব্ধ হইয়াছে গোরা তাহার প্রতি এই যে অত্যন্ত অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিল—এই মিথ্যা সন্দেহের কাছে সে শশিমুখীর বিবাহকে চিরন্তন জামিন স্বরূপে রাখিয়া নিজেকে খালাস করিয়া লইল। ইহার পরে বিনয় পরেশের বাড়ীতে নিঃসঙ্কোচে এবং ঘন ঘন যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল।

যাহাদিগকে ভাল লাগে তাহাদের ঘরের লোকের মত হইয়া উঠা বিনয়ের পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত নহে। সে যেই গোরার দিকের সঙ্কোচ তাহার মন হইতে দূর করিয়া দিল অমনি দেখিতে দেখিতে অল্পকালের মধ্যেই পরেশ বাবুর ঘরের সকলের কাছেই যেন বহুদিনের আত্মীয়ের মত হইয়া উঠিল।

কেবল ললিতার মনে যে কয়দিন সন্দেহ ছিল যে সুচরিতার মন হয় ত বা বিনয়ের দিকে কিছু ঝুঁকিয়াছে সেই কয়দিন বিনয়ের বিরুদ্ধে তাহার মন যেন অস্ত্রধারণ করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন সে স্পষ্ট বুঝিল যে সুচরিতা তাহার প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতী নহে তখন তাহার মনের বিদ্রোহ দূর হইয়া সে ভারি আরাম বোধ করিল এবং বিনয় বাবুকে আসামান্য ভাল লোক বলিয়া মনে করিতে তাহার কোনো বাধা রহিল না।

হারান বাবুও বিনয়ের প্রতি বিমুখ হইলেন না—তিনি একটু যেন বেশি করিয়া স্বীকার করিলেন যে বিনয়ের ভদ্রতাজ্ঞান আছে। গোরার যে সেটা নাই ইহাই এই স্বীকারোক্তির ইঙ্গিত।

বিনয় কখনো হারান বাবুর সম্মুখে কোনো তর্কের বিষয় তুলিত না এবং সুচরিতারও চেষ্টা ছিল যাহাতে না তোলা হয়—এই জন্য বিনয়ের দ্বারা ইতিমধ্যে চায়ের টেবিলের শান্তিভঙ্গ হইতে পায় নাই।

কিন্তু হারানের অনুপস্থিতিতে সুচরিতা নিজে চেষ্টা করিয়া বিনয়কে তাহার সামাজিক মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত করিত। গোরা এবং বিনয়ের মত শিক্ষিত লোক কেমন করিয়া যে দেশের প্রাচীন কুসংস্কারগুলি সমর্থন করিতে পারে ইহা জানিবার কৌতূহল কিছুতেই তাহার নিবৃত্ত হইত না। গোরা ও বিনয়কে সে যদি না জানিত তবে এ সকল মত কেহ স্বীকার করে জানিলে সুচরিতা দ্বিতীয় কোনো কথা না শুনিয়া তাহাকে অবজ্ঞার যোগ্য বলিয়া স্থির করিত। কিন্তু গোরাকে দেখিয়া অবধি গোরাকে সে কোনোমতে মন হইতে অশ্রদ্ধা করিয়া দূর করিতে পারিতেছে না। তাই সুযোগ পাইলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বিনয়ের সঙ্গে সে গোরার মত ও জীবনের আলোচনা উত্থাপন করে এবং প্রতিবাদের দ্বারা সকল কথা শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিতে থাকে। পরেশ সুচরিতাকে সকল সম্প্রদায়ের মত শুনিতে দেওয়াই তাহার সুশিক্ষার উপায় বলিয়া জানিতেন। এইজন্য তিনি এ সকল তর্কে কোনোদিন শঙ্কা অনুভব বা বাধা প্রদান করেন নাই।

একদিন সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, গৌরমোহন বাবু কি সত্যই জাতিভেদ মানেন, না ওটা দেশানুরাগের একটা বাড়াবাড়ি?

বিনয় কহিল—আপনি কি সিঁড়ির ধাপগুলোকে মানেন? ওগুলোও ত সব বিভাগ—কোনোটা উপরে কোনোটা নীচে।

সুচরিতা। নীচে থেকে উপরে উঠ্‌তে হয় বলেই মানি—নইলে মানবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সমান জায়গায় সিঁড়িকে না মান্‌লেও চলে।

বিনয়। ঠিক বলেচেন—আমাদের সমাজ একটা সিঁড়ি—এর মধ্যে

একটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্চে নীচে থেকে উপরে উঠিয়ে দেওয়া—মানব জীবনের একটা পরিণামে নিয়ে যাওয়া। যদি সমাজকে সংসারকেই পরিণাম বলে জানতুম তাহলে কোনো বিভাগ ব্যবস্থার প্রয়োজনই ছিল না—তাহলে য়ুরোপীয় সমাজের মত প্রত্যেকে অন্যের চেয়ে বেশি দখল করবার জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারি করে চল্‌তুম।

সুচরিতা। আমি যে আপনার কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে পারচি তা নয়। আমার প্রশ্ন এই যে, যে উদ্দেশ্যে সমাজে বর্ণভেদ প্রচলিত হয়েচে আপনি বল্‌চেন, সে উদ্দেশ্য কি সফল হয়েচে দেখ্‌তে পাচ্চেন?

বিনয়। পৃথিবীতে সফলতার চেহারা দেখতে পাওয়া বড় শক্ত। ভারতবর্ষ যে জাতিভেদ বলে সামাজিক সমস্যার একটা বড় উত্তর দিয়েছিলেন—সে উত্তরটা এখনো মরে নি—সেটা এখনো পৃথিবীর সাম্‌নে রয়েছে। য়ুরোপও সামাজিক সমস্যার অন্য কোনো সদুত্তর এখনো দিতে পারে নি, সেখানে কেবলি ঠেলাঠেলি হাতাহাতি চল্‌চে—ভারতবর্ষের এই উত্তরটা মানবসমাজে এখনো সফলতার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে।

সুচরিতা সঙ্কুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি রাগ করবেন না কিন্তু সত্যি করে বলুন, এ সমস্ত কথা কি আপনি গৌরমোহন বাবুর প্রতিধ্বনির মত বল্‌চেন, না এ আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেচেন?

বিনয় হাসিয়া কহিল—আপনাকে সত্য করেই বলচি গোরার মতো আমার বিশ্বাসের জোর নেই। জাতিভেদের আবর্জ্জনা ও সমাজের বিকারগুলো যখন দেখতে পাই তখন আমি অনেক সন্দেহ প্রকাশ করে থাকি—কিন্তু গোরা বলে বড় জিনিষকে ছোট করে দেখলেই সন্দেহ জন্মে—গাছের ভাঙা ডাল ও শুক্‌নো পাতাকেই গাছের চরম প্রকৃতি বলে দেখা বুদ্ধির অসহিষ্ণুতা—ভাঙা ডালকে প্রশংসা করতে বলিনে কিন্তু বনস্পতিকে দেখ এবং তার তাৎপর্য্য বুঝতে চেষ্টা কর।

সুচরিতা। গাছের শুক্‌নো পাতাটা না হয় নাই ধরা গেল কিন্তু

গাছের ফলটা ত দেখতে হবে। জাতিভেদের ফলটা আমাদের দেশের পক্ষে কি রকম ?

বিনয়। যাকে জাতিভেদের ফল বল্‌চেন সেটা অবস্থার ফল, শুধু জাতিভেদের নয়। নড়া দাঁত দিয়ে চিবতে গেলে ব্যথা লাগে সেটা দাঁতের অপরাধ নয় নড়া দাঁতের অপরাধ। নানা কারণে আমাদের মধ্যে বিকার ও দুর্ব্বলতা ঘটেছে বলেই ভারতবর্ষের আইডিয়াকে আমরা সফল না করে বিকৃত করচি। গোরা সেই জন্যে বার বার বলে—সুস্থ হও সবল হও।

সুচরিতা। আচ্ছা তাহলে আপনি ব্রাহ্মণ জাতকে নর-দেবতা বলে মান্‌তে বলেন ? আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলোয় মানুষ পবিত্র হয় ?

বিনয়। পৃথিবীতে অনেক সম্মানই ত আমাদের নিজের সৃষ্টি। ব্রাহ্মণকে যদি যথার্থভাবে ব্রাহ্মণ করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে সে কি সমাজের পক্ষে সামান্য লাভ! আমরা নরদেবতা চাই—আমরা নর-দেবতাকে যদি যথার্থই সমস্ত অন্তরের সঙ্গে বুদ্ধিপূর্ব্বক চাই তাহলে নর-দেবতাকে পাব—আর যদি মূঢ়ের মত চাই তাহলে যে সমস্ত অপদেবতা সকল রকম দুষ্কর্ম্ম করে থাকে এবং আমাদের মাথার উপরে পায়ের ধূলো দেওয়া যাদের জীবিকার উপায় তাদের দল বাড়িয়ে ধরণীর ভার বৃদ্ধি করা হবে।

সুচরিতা। আপনার সেই নরদেবতা কি কোথাও আছে ?

বিনয়। বীজের মধ্যে যেমন গাছ আছে তেমনি আছে, ভারতবর্ষের আন্তরিক অভিপ্রায় এবং প্রয়োজনের মধ্যে আছে। অন্য দেশ ওয়েলিংটনের মত সেনাপতি, নিউটনের মত বৈজ্ঞানিক, রথচাইল্ডের মত লক্ষপতি চায়, আমাদের দেশ ব্রাহ্মণকে চায়। ব্রাহ্মণ, যার ভয় নেই, লোভকে যে ঘৃণা করে, দুঃখকে যে জয় করে, অভাবকে যে লক্ষ্য করে না, যার পরমে

ব্রহ্মণি যোজিত চিত্তঃ; যে অটল, যে শান্ত, যে মুক্ত সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ চায়—সেই ব্রাহ্মণকে যথার্থভাবে পেলে তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আমরা কি রাজার কাছে মাথা হেঁট করি, অত্যাচারীর বন্ধন গলায় পরি? নিজের ভয়ের কাছে আমাদের মাথা নত, নিজের লোভের জালে আমরা জড়িয়ে আছি, নিজের মূঢ়তার কাছে আমরা দাসানুদাস—ব্রাহ্মণ তপস্যা করুন, সেই ভয় থেকে, লোভ থেকে, মূঢ়তা থেকে আমাদের মুক্ত করুন—আমরা তাঁদের কাছ থেকে যুদ্ধ চাইনে, বাণিজ্য চাইনে, আর কোনো প্রয়োজন চাইনে।

পরেশ বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—ভারতবর্ষকে যে আমি জানি তা বল্‌তে পারিনে এবং ভারতবর্ষ যে কি চেয়েছিলেন এবং কোনো দিন তা পেয়েছিলেন কি না তা আমি নিশ্চয় জানিনে কিন্তু যে দিন চলে গেছে সেই দিনে কি কখনো ফিরে যাওয়া যায়? বর্ত্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়—অতীতের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে সময় নষ্ট করলে কি কোনো কাজ হবে?

বিনয় কহিল—আপনি যেমন বলচেন আমিও ঐ রকম করে ভেবেচি এবং অনেকবার বলেওচি—গোরা বলে যে, অতীতকে অতীত বলে বরখাস্ত করে বসে আছি বলেই কি সে অতীত? কোনো সত্য কোনো দিনই অতীত হতে পারে না।

সুচরিতা কহিল—আপনি যে রকম করে এ সব কথা বলচেন ঠিক সাধারণ লোকে এ রকম করে বলে না—সেই জন্য আপনাদের মতকে সমস্ত দেশের জিনিষ বলে ধরে নিতে মনে সংশয় হয়।

বিনয় কহিল, আমাদের দেশে সাধারণত যে সকল লোক নিজেকে পরম হিন্দু বলে অভিমান করে আমার বন্ধু গোরাকে আপনি সে দলের লোক বলে মনে করবেন না। সে হিন্দুধর্ম্মকে ভিতরের দিক থেকে এবং খুব বড় রকম করে দেখে, সে কোনো দিন মনেও করে না যে হিন্দুধর্ম্মের

প্রাণ নিতান্ত সৌখীন প্রাণ—অল্প একটু ছোঁয়াছুঁয়িতেই শুকিয়ে যায় ঠেকাঠেকিতেই মারা পড়ে।

সুচরিতা। কিন্তু তিনি ত খুব সাবধানে ছোঁয়াছুয়ি মেনে চলেন বলেই মনে হয়।

বিনয়। তার ঐ সতর্কটা একটা অদ্ভুত জিনিষ। তাকে যদি প্রশ্ন করা যায় সে তখনি বলে হাঁ আমি এ সমস্তই মানি— ছুঁলে জাত যায়, খেলে পাপ হয়, এ সমস্তই অভ্রান্ত সত্য; কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এ কেবল ওর গায়ের জোরের কথা—এসব কথা যতই অসঙ্গত হয় ততই ও যেন সকলকে শুনিয়ে উচ্চস্বরে বলে। পাছে বর্ত্তমান হিন্দুয়ানির সামান্য কথাটাকেও অস্বীকার করলে অন্য মূঢ় লোকের কাছে হিন্দুয়ানির বড় জিনিষেরও অসম্মান ঘটে এবং যারা হিন্দুয়ানিকে অশ্রদ্ধা করে তারা সেটাকে নিজের জিত বলে গণ্য করে এই জন্যে গোরা নির্ব্বিচারে সমস্তই মেনে চলতে চায়—আমার কাছেও এসম্বন্ধে কোনো শৈথিল্য প্রকাশ করতে চায় না।

পরেশ বাবু কহিলেন—ব্রাহ্মদের মধ্যেও এরকম লোক অনেক আছে। তারা হিন্দুয়ানির সমস্ত সংস্রবই নির্ব্বিচারে পরিহার করতে চায়, পাছে বাহিরের কোনো লোক ভুল করে যে তারা হিন্দুধর্ম্মের কুপ্রথাকেও স্বীকার করে। এ সকল লোক পৃথিবীতে বেশ সহজভাবে চল্‌তে পারে না—এরা হয় ভান করে নয় বাড়াবাড়ি করে, মনে করে সত্য দুর্ব্বল, এবং সত্যকে কেবল কৌশল করে কিম্বা জোর করে রক্ষা করা যেন কর্ত্তব্যের অঙ্গ। আমার উপরে সত্য নির্ভর করচে, সত্যের উপরে আমি নির্ভর করচিনে এই রকম যাদের ধারণা তাদেরই বলে গোঁড়া। আমি ঈশ্বরের কাছে সর্ব্বদাই এই প্রার্থনা করি যে ব্রাহ্মের সভাতেই হোক আর হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপেই হোক আমি যেন সত্যকে সর্ব্বত্রই নতশিরে অতি সহজেই বিনা বিদ্রোহে প্রণাম করতে

পারি—বাইরে কোনো বাধা আমাকে যেন আটক করে না রাখ্‌তে পারে।

এই বলিয়া পরেশ বাবু স্তব্ধ হইয়া আপনার মনকে যেন আপনার অন্তরে ক্ষণকালের জন্য সমাধান করিলেন। পরেশ বাবু মৃদুস্বরে এই যে কয়টি কথা বলিলেন তাহা এতক্ষণের সমস্ত আলোচনার উপরে যেন একটা বড় সুর আনিয়া দিল—সে সুর যে ঐ কয়টি কথার সুর তাহা নহে তাহা পরেশ বাবুর নিজের জীবনের একটি প্রশান্ত গভীরতার সুর। সুচরিতা এবং ললিতার মুখে একটি আনন্দিত ভক্তির দীপ্তি আলো ফেলিয়া গেল। বিনয় চুপ করিয়া রহিল। সেও মনে মনে জানিত গোরার মধ্যে একটা প্রচণ্ড জবরদস্তি আছে—সত্যের বাহকদের বাক্যে মনে ও কর্ম্মে যে একটি সহজ ও সরল শান্তি থাকা উচিত তাহা গোরার নাই—পরেশ বাবুর কথা শুনিয়া সেকথা তাহার মনে যেন আরো স্পষ্ট করিয়া আঘাত করিল।

সুচরিতা রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলে পর ললিতা তাহার খাটের একধারে আসিয়া বসিল। সুচরিতা বুঝিল ললিতার মনের ভিতর একটা কোনো কথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কথাটা যে বিনয়ের সম্বন্ধে তাহাও সুচরিতা বুঝিয়াছিল।

সেইজন্য সুচরিতা আপনি কথা পাড়িল—বিনয় বাবুকে কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগে।

ললিতা কহিল—তিনি কি না কেবলি গৌর বাবুর কথাই বলেন সেই জন্যে তোমার ভাল লাগে।

সুচরিতা এ কথাটার ভিতরকার ইঙ্গিতটা বুঝিয়াও বুঝিল না। সে একটা সরলভাব ধারণ করিয়া কহিল—তা সত্যি, ওঁর মুখ থেকে গৌর বাবুর কথা শুনতে আমার ভারি আনন্দ হয়। আমি যেন তাঁকে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

ললিতা কহিল—আমার ত কিছু ভাল লাগে না—আমার রাগ ধরে।

সুচরিতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন?

ললিতা কহিল—গোরা, গোরা, গোরা, দিনরাত্রি কেবল গোরা! ওঁর বন্ধু গোরা হয় ত খুব মস্ত লোক, বেশ ত ভালই ত—কিন্তু উনিও ত মানুষ।

সুচরিতা হাসিয়া কহিল—তা ত বটেই কিন্তু তার ব্যাঘাত কি হয়েছে।

ললিতা। ওঁর বন্ধু ওঁকে এমনি ঢেকে ফেলেচেন যে উনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারচেন না। যেন কাঁচপোকায় তেলাপোকাকে ধরেচে—ওরকম অবস্থায় কাঁচপোকার উপরেও আমার রাগ ধরে, তেলাপোকার উপরেও আমার শ্রদ্ধা হয় না।

ললিতার কথার ঝাঁজ দেখিয়া সুচরিতা কিছু না বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ললিতা কহিল, দিদি তুমি হাস্‌চ কিন্তু আমি তোমাকে বলচি আমাকে যদি কেউ ওরকম করে চাপা দিতে চেষ্টা করত আমি তাকে একদিনের জন্যেও সহ্য করতে পারতুম না। এই মনে কর তুমি—লোকে যাই মনে করুক তুমি আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখনি—তোমার সে রকম প্রকৃতিই নয়—সেই জন্যেই আমি তোমাকে এত ভালবাসি। আসল, বাবার কাছে থেকে তোমার ঐ শিক্ষা হয়েছে—তিনি সব লোককেই তার জায়গাটুকু ছেড়ে দেন।

এই পরিবারের মধ্যে সুচরিতা এবং ললিতা পরেশবাবুর পরম ভক্ত—বাবা বলিতেই তাদের হৃদয় যেন স্ফীত হইয়া উঠে।

সুচরিতা কহিল—বাবার সঙ্গে কি আর কারো তুলনা হয়? কিন্তু যাই বল ভাই বিনয়বাবু ভারি চমৎকার করে বল্‌তে পারেন।

ললিতা। ওগুলো ওঁর মনের কথা নয় বলেই অত চমৎকার

করে বলেন। যদি নিজের কথা বল্‌তেন তাহলে বেশ দিব্যি সহজ কথা হত, মনে হত না যে, ভেবে ভেবে বানিয়ে বানিয়ে বল্‌চেন। চমৎকার কথার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল লাগে।

সুচরিতা। তা রাগ করিস্‌ কেন ভাই। গৌরমোহন বাবুর কথাগুলো ওঁর নিজেরই কথা হয়ে গেছে।

ললিতা। তা যদি হয় ত সে ভারি বিশ্রী—ঈশ্বর কি বুদ্ধি দিয়েছেন পরের কথা ব্যাখ্যা করবার, আর মুখ দিয়েছেন পরের কথা চমৎকার করে বলবার জন্যে? অমন চমৎকার কথায় কাজ নেই।

সুচরিতা। কিন্তু এটা তুই বুঝচিস্‌নে কেন যে বিনয়বাবু গৌরমোহন-বাবুকে ভালবাসেন—তাঁর সঙ্গে ওঁর মনের সত্যিকার মিল আছে।

ললিতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল—না, না, না, সম্পূর্ণ মিল নেই। গৌরমোহন বাবুকে মেনে চলা ওঁর অভ্যাস হয়ে গেছে—সেটা দাসত্ব, সে ভালবাসা নয়। অথচ উনি জোর করে মনে করতে চান যে তাঁর সঙ্গে ওঁর ঠিক্ এক মত; ভালবাসা থাক্‌লে মতের সঙ্গে না মিল্‌লেও মানা যেতে পারে—অন্ধ না হয়েও নিজেকে ছেড়ে দেওয়া যায়—ওঁর ত তা নয়—উনি গৌরমোহন বাবুকে মান্‌চেন হয় ত ভালবাসা থেকে অথচ কিছুতে সেটা স্বীকার করতে পারচেন না। ওঁর কথা শুন্‌লেই সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। আচ্ছা দিদি, তুমি বোঝনি, সত্যি বল!

সুচরিতা ললিতার মত একথা এমন করিয়া ভাবেই নাই। কারণ গোরাকে সম্পূর্ণরূপে জানিবার জন্যই তাহার কৌতূহল ব্যগ্র হইয়াছিল—বিনয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার জন্য তাহার আগ্রহই ছিল না। সুচরিতা ললিতার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়া কহিল—আচ্ছা, বেশ, তোর কথাই মেনে নেওয়া গেল—তা কি করতে হবে বল!

ললিতা। আমার ইচ্ছা করে ওঁর বন্ধুর বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁকে স্বাধীন করে দিতে।

সুচরিতা। চেষ্টা করে দেখ্ না ভাই।

ললিতা। আমার চেষ্টায় হবে না—তুমি একটু মনে করলেই হয়।

সুচরিতা যদিও ভিতরে ভিতরে বুঝিয়াছিল যে, বিনয় তাহার প্রতি অনুরক্ত তবু সে ললিতার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

ললিতা কহিল—গৌরমোহন বাবুর শাসন কাটিয়েও উনি যে তোমার কাছে এমন করে ধরা দিতে আসচেন তাতেই আমার ওঁকে ভাল লাগে;—ওঁর অবস্থার কেউ হলে ব্রাহ্ম-মেয়েদের গাল দিয়ে নাটক লিখত—ওঁর মন এখনো খোলসা আছে, তোমাকে ভালবাসেন আর বাবাকে ভক্তি করেন এই তার প্রমাণ। বিনয়বাবুকে ওঁর নিজের ভাবে খাড়া করিয়ে দিতে হবেই দিদি। উনি যে কেবলি গৌরমোহন বাবুকে প্রচার করতে থাকেন সে আমার অসহ্য বোধ হয়।

এমন সময় দিদি দিদি করিয়া সতীশ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিনয় তাহাকে আজ গড়ের মাঠে সার্কাস দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। যদিও অনেক রাত্রি হইয়াছিল তবু তাহার এই প্রথম সার্কাস দেখার উৎসাহ সে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। সার্কাসের বর্ণনা করিয়া সে কহিল—বিনয়বাবুকে আজ আমার বিছানায় ধরে আনছিলুম। তিনি বাড়িতে ঢুকেছিলেন তার পরে আবার চলে গেলেন। বল্লেন কাল আসবেন। দিদি, আমি তাঁকে বলেছি তোমাদের একদিন সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতে।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল—তিনি তাতে কি বল্লেন?

সতীশ কহিল—তিনি বল্লেন মেয়েরা বাঘ দেখলে ভয় করবে। আমার কিন্তু কিছু ভয় হয়নি। বলিয়া সতীশ পৌরুষ অভিমানে বুক ফুলাইয়া বসিল।

ললিতা কহিল—তা বই কি! তোমার বন্ধু বিনয়বাবুর সাহস যে কত বড় তা বেশ বুঝতে পারচি! না ভাই দিদি, আমাদের সঙ্গে করে ওঁকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতেই হবে।

সতীশ কহিল—কাল যে দিনের বেলায় সার্কাস হবে।

ললিতা কহিল—সেই ত ভাল। দিনের বেলাতেই যাব।

পরদিন বিনয় আসিতেই ললিতা বলিয়া উঠিল এই যে ঠিক সময়েই বিনয়বাবু এসেচেন! চলুন।

বিনয়। কোথায় যেতে হবে?

ললিতা। সার্কাসে।

সার্কাসে! দিনের বেলায় এক তাঁবু লোকের সামনে মেয়েদের লইয়া সার্কাসে যাওয়া! বিনয় ত হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

ললিতা কহিল—গৌরমোহন বাবু বুঝি রাগ করবেন?

ললিতার এই প্রশ্নে বিনয় একটু চকিত হইয়া উঠিল।

ললিতা আবার কহিল—সার্কাসে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে গৌরমোহন বাবুর একটা মত আছে?

বিনয় কহিল—নিশ্চয় আছে।

ললিতা। সেটা কি রকম আপনি ব্যাখ্যা করে বলুন। আমি দিদিকে ডেকে নিয়ে আসি তিনিও শুনবেন!

বিনয় খোঁচা খাইয়া হাসিল। ললিতা কহিল, হাসচেন কেন বিনয়বাবু! আপনি কাল সতীশকে বলেছিলেন মেয়েরা বাঘকে ভয় করে—আপনি কাউকে ভয় করেন না না কি?

ইহার পরে সেদিন মেয়েদের লইয়া বিনয় সার্কাসে গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, গোরার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটা ললিতার এবং সম্ভবত এবাড়ীর অন্য মেয়েদের কাছে কিরূপ ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে সেকথাটাও বার বার তাহার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

তাহার পরে যে দিন বিনয়ের সঙ্গে দেখা হইল ললিতা যেন নিরীহ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—গৌরমোহন বাবুকে সেদিনকার সার্কাসের গল্প বলেচেন?

এ প্রশ্নের খোঁচা বিনয়কে গভীর করিয়া বাজিল—কেননা তাহাকে কর্ণমূল রক্তবর্ণ করিয়া বলিতে হইল—না, এখনো বলা হয়নি।

লাবণ্য আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল—বিনয়বাবু আসুন না।

ললিতা কহিল—কোথায়? সার্কাসে না কি?

লাবণ্য কহিল—বাঃ আজ আবার সার্কাস কোথায়? আমি ডাকচি আমার রুমালে চার ধারে পেন্সিল দিয়ে একটা পাড় এঁকে দিতে—আমি সেলাই করব। বিনয়বাবু কি সুন্দর আঁকতে পারেন!

লাবণ্য বিনয়কে ধরিয়া লইয়া গেল।

২০

সকাল বেলায় গোরা কাজ করিতেছিল। বিনয় খামখা আসিয়া অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে কহিল—সেদিন পরেশ বাবুর মেয়েদের নিয়ে আমি সার্কাস দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।

গোরা লিখতে লিখতেই বলিল—শুনেছি।

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল—তুমি কার কাছে শুন্‌লে?

গোরা। অবিনাশের কাছে। সেও সেদিন সার্কাস দেখ্‌তে গিয়েছিল।

গোরা আর কিছু না বলিয়া লিখিতে লাগিল। গোরা এ খবরটা আগেই শুনিয়াছে—সেও আবার অবিনাশের কাছ হইতে শুনিয়াছে, সুতরাং তাহাতে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার কোনো অভাব ঘটে নাই—ইহাতে তাহার চিরসংস্কারবশত বিনয় মনের মধ্যে ভারি একটা সঙ্কোচ বোধ করিল। সার্কাসে যাওয়া এবং এ কথাটা এমন করিয়া লোকসমাজে না উঠিলেই সে খুসি হইত।

এমন সময়ে তাহার মনে পড়িয়া গেল কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত না ঘুমাইয়া সে মনে মনে ললিতার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে। ললিতা মনে

করে সে গোরাকে ভয় করে এবং ছোট ছেলে যেমন করিয়া মাষ্টারকে মানে তেম্‌নি করিয়াই সে গোরাকে মানিয়া চলে। এমন অন্যায় করিয়াও মানুষকে মানুষ ভুল বুঝিতে পারে! গোরা-বিনয় যে একাত্মা; অসামান্যতাগুণে গোরার উপরে তাহার একটা ভক্তি আছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া ললিতা যে রকমটা মনে করিয়াছে সেটা গোরার প্রতিও অন্যায় বিনয়ের প্রতিও অন্যায়। বিনয় নাবালক নয় এবং গোরাও নাবালকের অছি নহে।

গোরা নিঃশব্দে লিখিয়া যাইতে লাগিল আর ললিতার মুখের সেই তীক্ষ্ণাগ্র গুটি দুই তিন প্রশ্ন বারবার বিনয়ের মনে পড়িল। বিনয় তাহাকে সহজে বরখাস্ত করিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের মনে একটা বিদ্রোহ মাথা তুলিয়া উঠিল। সার্কাস দেখিতে গিয়াছি ত কি হইয়াছে, অবিনাশ কে, যে, সে সেই কথা লইয়া গোরার সঙ্গে আলোচনা করিতে আসে—এবং গোরাই বা কেন আমার গতিবিধি সম্বন্ধে সেই অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয়! আমি কি গোরার নজরবন্দি! কাহার সঙ্গে মিশিব, কোথায় যাইব, গোরার কাছে তাহার জবাবদিহি করিতে হইবে! বন্ধুত্বের প্রতি এ যে বিষম উপদ্রব!

গোরা ও অবিনাশের উপর বিনয়ের এত রাগ হইত না যদি সে নিজের ভীরুতাকে নিজের মধ্যে সহসা স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি না করিত। গোরার কাছে যে সে কোনো কথা ক্ষণকালের জন্যও ঢাকাঢাকি করিতে বাধ্য হইয়াছে সেজন্য সে আজ মনে মনে যেন গোরাকেই অপরাধী করিতে চেষ্টা করিতেছে। সার্কাসে যাওয়া লইয়া গোরা যদি বিনয়ের সঙ্গে দুটো ঝগড়ার কথা বলিত তাহা হইলেও সেটাতে বন্ধুত্বের সাম্য রক্ষিত হইত এবং বিনয় সান্ত্বনা পাইত—কিন্তু গোরা যে গম্ভীর হইয়া মস্ত বিচারক সাজিয়া মৌনের দ্বারা বিনয়কে অবজ্ঞা

করিবে ইহাতে ললিতার কথার কাঁটা তাহাকে পুনঃপুনঃ বিঁধিতে লাগিল।

এই সময় মহিম হুঁকা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডিবা হইতে ভিজা ন্যাকড়ার আবরণ তুলিয়া একটা পান বিনয়ের হাতে দিয়া কহিলেন—বাবা বিনয়, এদিকে ত সমস্ত ঠিক—এখন তোমার খুড়োমশায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেই যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাঁকে তুমি চিঠি লিখেছ ত?

এই বিবাহের তাগিদ আজ বিনয়কে অত্যন্ত খারাপ লাগিল, অথচ সে জানিত মহিমের কোনো দোষ নাই—তাঁহাকে কথা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই কথা দেওয়ার মধ্যে সে একটা দীনতা অনুভব করিল। আনন্দময়ী ত তাহাকে এক প্রকার বারণ করিয়াছিলেন—তাহার নিজেরও ত এ বিবাহের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না—তবে গোলেমালে ক্ষণকালের মধ্যেই এ কথাটা পাকিয়া উঠিল কি করিয়া? গোরা যে ঠিক তাড়া লাগাইয়াছিল তাহা ত বলা যায় না। বিনয় যদি একটু মনের সঙ্গে আপত্তি করিত তাহা হইলেও যে গোরা পীড়াপীড়ি করিত তাহা নহে কিন্তু তবু! সেই তবুটুকুর উপরেই ললিতার খোঁচা আসিয়া বিঁধিতে লাগিল। সেদিনকার কোনো বিশেষ ঘটনা নহে কিন্তু অনেকদিনের প্রভুত্ব ইহার পশ্চাতে আছে। বিনয় নিতান্তই কেবল ভালবাসিয়া এবং একান্তই ভালমানুষি বশত গোরার আধিপত্য অনায়াসে সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সেই জন্যই এই প্রভুত্বর সম্বন্ধই বন্ধুত্বর মাথার উপর চড়িয়া বসিয়াছে। এতদিন বিনয় ইহা অনুভব করে নাই কিন্তু আর ত ইহাকে অস্বীকার করিয়া চলে না। তবে শশিমুখীকে কি বিবাহ করিতেই হইবে।

বিনয় কহিল—না খুড়োমশায়কে এখনো চিঠি লেখা হয়নি।

মহিম কহিলেন—ওটা আমারই ভুল হয়েছে। এ চিঠি ত তোমার

লেখবার কথা নয়—ও আমিই লিখব। তাঁর পূরো নামটা কি বলত বাবা।

বিনয় কহিল—আপনি ব্যস্ত হচ্চেন কেন? আশ্বিন কার্ত্তিকে ত বিবাহ হতে পারবে না। এক অগ্রান মাস—কিন্তু তাতেও গোল আছে। আমাদের পরিবারের ইতিহাসে বহুপূর্ব্বে অগ্রান মাসে কবে কার কি দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেই অবধি আমাদের বংশে অগ্রানে বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্ম্ম বন্ধ আছে।

মহিম হুঁকোটা ঘরের কোণের দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া কহিলেন—বিনয়, তোমরা যদি এ সমস্ত মানবে তবে লেখা পড়া শেখাটা কি কেবল পড়া মুখস্থ করে মরা? একে ত পোড়া দেশে শুভ দিন খুঁজেই পাওয়া যায় না তার পরে আবার ঘরে ঘরে প্রাইভেট্ পাঁজি খুলে বস্‌লে কাজকর্ম্ম চল্‌বে কি করে?

বিনয় কহিল—আপনি ভাদ্র আশ্বিন মাসই বা মানেন কেন?

মহিম কহিলেন—আমি মানি বুঝি! কোনো কালেই না। কি করব বাবা—এমুলুকে ভগবানকে না মান্‌লেও বেশ চলে যায় কিন্তু ভাদ্র আশ্বিন বৃহস্পতি শনি তিথিনক্ষত্র না মান্‌লে কোনো মতে ঘরে টিঁক্‌তে দেয় না। আবার তাও বলি—মানিনে বল্‌চি বটে কিন্তু কাজ করবার বেলা দিনক্ষণের অন্যথা হলেই মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে—দেশের হাওয়ায় যেমন ম্যালেরিয়া হয় তেমনি ভয়ও হয় ওটা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না।

বিনয়। আমাদের বংশে অগ্রানের ভয়টাও কাট্‌বেনা। অন্তত খুড়িমা কিছুতেই রাজি হবেন না।

এমন করিয়া সেদিনকার মত বিনয় কোনোমতে কথাটা চাপা দিয়া রাখিল।

বিনয়ের কথার সুর শুনিয়া গোরা বুঝিল বিনয়ের মনে একটা দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন হইতে বিনয়ের দেখাই পাওয়া যাইতেছিল

না। গোরা বুঝিয়াছিল বিনয় পরেশ বাবুর বাড়ি পূর্ব্বের চেয়েও আরো ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পরে আজ এই বিবাহের প্রস্তাবে পাশ কাটাইবার চেষ্টায় গোরার মনে খট্‌কা বাধিল।

গোরা তাহার লেখা ছাড়িয়া মুখ তুলিয়া কহিল—বিনয়, একবার যখন তুমি দাদাকে কথা দিয়েছ তখন কেন ওঁকে অনিশ্চিতের মধ্যে রেখে মিথ্যে কষ্ট দিচ্চ?

বিনয় হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল—আমি কথা দিয়েছি—না তাড়াতাড়ি আমার কাছে থেকে কথা কেড়ে নেওয়া হয়েচে?

গোরা বিনয়ের এই অকস্মাৎ বিদ্রোহের লক্ষণ দেখিয়া বিস্মিত এবং কঠিন হইয়া উঠিয়া কহিল—কথা কে কেড়ে নিয়েছিল?

বিনয় কহিল—তুমি।

গোরা। আমি! তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার পাঁচ সাতটার বেশি কথাই হয়নি—তাকে বলে কথা কেড়ে নেওয়া!

বস্তুতঃ বিনয়ের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ কিছুই ছিলনা—গোরা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য—কথা অল্পই হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে এমন কিছু বেশি তাগিদ ছিল না যাহাকে পীড়াপীড়ি বলা চলে—তবু একথা সত্য, গোরাই বিনয়ের কাছ হইতে তাহার সম্মতি যেন লুঠ করিয়া লইয়াছিল। যে কথার বাহ্য প্রমাণ অল্প সেই অভিযোগ সম্বন্ধে মানুষের ক্ষোভও কিছু বেশি হইয়া থাকে। তাই বিনয় কিছু অসঙ্গত রাগের সুরে বলিল—কেড়ে নিতে বেশি কথার দরকার করে না।

গোরা টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—নাও তোমার কথা ফিরিয়ে নাও। তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে করেই নেব বা দস্যুবৃত্তি করেই নেব এত বড় মহামূল্য কথা এটা নয়।

পাশের ঘরেই মহিম ছিলেন—গোরা বজ্রস্বরে তাঁহাকে ডাকিল—দাদা।

মহিম শশব্যস্ত হইয়া ঘরে আসিতেই গোরা কহিল—দাদা, আমি

তোমাকে গোড়াতেই বলিনি যে শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ হতে পারে না—আমার তাতে মত নেই!

মহিম। নিশ্চয় বলেছিলে! তুমি ছাড়া এমন কথা আর কেউ বল্‌তে পারত না। অন্য কোনো ভাই হলে ভাইঝির বিবাহ প্রস্তাবে প্রথম থেকেই উৎসাহ প্রকাশ করত।

গোরা। তুমি কেন আমাকে দিয়ে বিনয়ের কাছে অনুরোধ করালে?

মহিম। মনে করেছিলুম তাতে কাজ পাওয়া যাবে, আর কোনো কারণ নেই।

গোরা মুখ লাল করিয়া বলিল—আমি এ সবের মধ্যে নেই। বিবাহের ঘট্‌কালি করা আমার ব্যবসায় নয়, আমার অন্য কাজ আছে।

এই বলিয়া গোরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হতবুদ্ধি মহিম বিনয়কে এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সেও একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। মহিম দেয়ালের কোণ হইতে হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া টান দিতে লাগিলেন।

গোরার সঙ্গে বিনয়ের ইতিপূর্ব্বে অনেক দিন অনেক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে কিন্তু এমন আকস্মিক প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের মত ব্যাপার আর কখনো হয় নাই। বিনয় নিজের কৃতকর্ম্মে প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার পরে বাড়ি গিয়া তাহার বুকের মধ্যে শেল বিঁধিতে লাগিল। এই ক্ষণকালের মধ্যেই গোরাকে সে যে কত বড় একটা আঘাত দিয়াছে তাহা মনে করিয়া তাহার আহারে বিশ্রামে রুচি রহিল না। বিশেষতঃ এ ঘটনায় গোরাকে দোষী করা যে নিতান্তই অদ্ভুত ও অসঙ্গত হইয়াছে ইহাই তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল,—সে বরাবর বলিল,—অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়।

বেলা দুইটার সময় আনন্দময়ী সবে যখন আহার সারিয়া সেলাই লইয়া বসিয়াছেন এমন সময় বিনয় আসিয়া তাঁহার কাছে বসিল।

আজ সকাল বেলাকার কতকটা খবর তিনি মহিমের কাছ হইতে পাইয়াছিলেন। আহারের সময় গোরার মুখ দেখিয়াও তিনি বুঝিয়াছিলেন একটা ঝড় হইয়া গেছে।

বিনয় আসিয়াই কহিল—মা আমি অন্যায় করেছি। শশিমুখীর সঙ্গে বিবাহের কথা নিয়ে আমি আজ সকালে গোরাকে যা বলেছি তার কোনো মানে নেই!

আনন্দময়ী কহিলেন—তা হোক্ বিনয়—মনের মধ্যে কোনো একটা ব্যথা চাপ্‌তে গেলে ঐ রকম করেই বেরিয়ে পড়ে। ও ভালই হয়েছে। এ ঝগড়ার কথা দুদিন পরে তুমিও ভুল্‌বে গোরাও ভুলে যাবে।

বিনয়। কিন্তু, মা, শশিমুখীর সঙ্গে আমার বিবাহে কোনো আপত্তি নেই সেই কথা আমি তোমাকে জানাতে এসেছি।

আনন্দময়ী। বাছা তাড়াতাড়ি ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার একটা ঝঞ্ঝাটে পোড়ো না। বিবাহটা চিরকালের জিনিষ, ঝগড়া দুদিনের।

বিনয় কোনো মতেই শুনিল না। সে এ প্রস্তাব লইয়া এখনি গোরার কাছে যাইতে পারিল না। মহিমকে গিয়া জানাইল—বিবাহের প্রস্তাবে কোনো বিঘ্ন নাই—মাঘমাসেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে—খুড়োমহাশয়ের যাহাতে কোনো অমত না হয় সে ভার বিনয় নিজেই লইবে।

মহিম কহিলেন—পাণপত্রটা হয়ে যাক্‌না।

বিনয় কহিল—তা বেশ, সেটা গোরার সঙ্গে পরামর্শ করে করবেন।

মহিম ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—আবার গোরার সঙ্গে পরামর্শ!

বিনয় কহিল—না, তা না হলে চলবেনা।

মহিম কহিলেন—না যদি চলে তা হলে ত কথাই নেই—কিন্তু—বলিয়া একটা পান লইয়া মুখে পুরিলেন।

২১

মহিম সেদিন গোরাকে কিছু না বলিয়া তাহার পরের দিন তাহার ঘরে গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন গোরাকে পুনর্ব্বার রাজি করাইতে বিস্তর লড়ালড়ি করিতে হইবে। কিন্তু তিনি যেই আসিয়া বলিলেন যে বিনয় কাল বিকালে আসিয়া বিবাহ সম্বন্ধে পাকা কথা দিয়া গেছে ও পাণপত্র সম্বন্ধে গোরার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছে, গোরা তখনি নিজের সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল—বেশত। পাণপত্র হয়ে যাক্ না!

মহিম আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—এখন ত বলচ বেশত। এর পরে আবার বাগ্‌ড়া দেবে না ত।

গোরা কহিল,—আমি ত বাধা দিয়ে বাগ্‌ড়া দিইনি, অনুরোধ করেই বাগ্‌ড়া দিয়েছি।

মহিম। অতএব তোমার কাছে আমার মিনতি এই যে তুমি বাধাও দিয়ো না অনুরোধও করো না। কুরুপক্ষে নারায়ণী সেনাতেও আমার কাজ নেই আর পাণ্ডবপক্ষে নারায়ণেও আমার দরকার দেখিনে। আমি একলা যা পারি সেই ভাল—ভুল করেছিলুম—তোমার সহায়তাও যে এমন বিপরীত তা আমি পূর্ব্বে জানতুম না। যা হোক্ কাজটা হয় এটাতে তোমার ইচ্ছা আছে ত?

গোরা। হাঁ, ইচ্ছা আছে।

মহিম। তা হলে ইচ্ছাই থাক্ কিন্তু চেষ্টায় কাজ নেই।

গোরা এবার বুঝিয়াছে দূর হইতে বিনয়কে টানিয়া রাখা শক্ত হইবে—বিপদের ক্ষেত্র যেখানে সেইখানেই পাহারা দেওয়া চাই। গোরা মনে ভাবিল আমি যদি পরেশ বাবুদের বাড়িতে সর্ব্বদা যাতায়াত রাখি তাহা হইলে বিনয়কে ঠিক গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিব।

সেই দিনই অর্থাৎ ঝগড়ার পরদিন অপরাহ্ণে গোরা বিনয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজই গোরা আসিবে বিনয় কোনো মতেই এমন আশা করে নাই। সেই জন্য সে মনে মনে যেমন খুসি তেমনি আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল।

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় গোরা পরেশবাবুদের মেয়েদের কথাই পাড়িল অথচ তাহার মধ্যে কিছুমাত্র বিরূপতা ছিল না। এই আলোচনায় বিনয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে বেশি চেষ্টার প্রয়োজন করে না।

সেদিন দুই বন্ধুতে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি পরেশবাবুর মেয়েদের কথা হইতে হইতে রাত হইয়া গেল।

গোরা একলা বাড়ি ফিরিবার পথে ঐ সকল কথাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ ঘুম না আসিল পরেশবাবুর মেয়েদের কথা মন হইতে তাড়াইতে পারিল না। গোরার জীবনে এ উপসর্গ কোনো কালেই ছিল না, মেয়েদের কথা সে কোনোদিন চিন্তামাত্রই করে নাই। জগদ্ব্যাপারে এটাও যে একটা কথার মধ্যে এবার বিনয় তাহা প্রমাণ করিয়া দিল। ইহাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না, ইহার সঙ্গে হয় আপোষ নয় লড়াই করিতে হইবে।

পরদিন বিনয় যখন গোরাকে কহিল—পরেশ বাবুর বাড়িতে একবার চলই না—অনেক দিন যাওনি,—তিনি তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন—তখন গোরা বিনা আপত্তিতে রাজি হইল। শুধু রাজি হওয়া নহে, তাহার মনের মধ্যে পূর্ব্বের মত নিরুৎসুক ভাব ছিল না। প্রথমে সুচরিতা ও পরেশবাবুর কন্যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গোরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, তাহার পরে মধ্যে অবজ্ঞাপূর্ণ বিরুদ্ধভাব তাহার মনে জন্মিয়াছিল, এখন তাহার মনে একটা কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছে। বিনয়ের চিত্তকে কিসে যে এত করিয়া আকর্ষণ করিতেছে তাহা জানিবার জন্য তাহার মনে একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে।

উভয়ে যখন পরেশ বাবুর বাড়ি গিয়া পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দোতলার ঘরে একটা তেলের সেজ জ্বালাইয়া হারান তাঁহার একটা ইংরেজি লেখা পরেশ বাবুকে শুনাইতেছিলেন। এ স্থলে পরেশ বাবু বস্তুত উপলক্ষ মাত্র ছিলেন—সুচরিতাকে শোনানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুচরিতা টেবিলের দূরপ্রান্তে চোখের উপর হইতে আলো আড়াল করিবার জন্য মুখের সাম্‌নে একটা তালপাতার পাখা তুলিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে আপন স্বাভাবিক বাধ্যতাবশত প্রবন্ধটি শুনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার মন কেবলি অন্য দিকে যাইতেছিল।

এমন সময় চাকর আসিয়া যখন গোরা ও বিনয়ের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল, তখন সুচরিতা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। সে চৌকি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই পরেশ বাবু কহিলেন—রাধে, যাচ্চ কোথায়? আর কেউ নয় আমাদের বিনয় আর গৌর এসেচে।

সুচরিতা সঙ্কুচিত হইয়া আবার বসিল। হারানের সুদীর্ঘ ইংরেজি রচনা পাঠে ভঙ্গ ঘটাতে সুচরিতার আরাম বোধ হইল; গোরা আসিয়াছে শুনিয়া তাহার মনে যে একটা উত্তেজনা হয় নাই তাহাও নহে কিন্তু হারান বাবুর সম্মুখে গোরার আগমনে তাহার মনের মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তি এবং সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। দু'জনে পাছে বিরোধ বাধে এই মনে করিয়া অথবা কি যে তাহার কারণ তাহা বলা শক্ত।

গৌরের নাম শুনিয়াই হারানবাবুর মনের ভিতরটা একবারে বিমুখ হইয়া উঠিল। গৌরের নমস্কারে কোনোমতে প্রতিনমস্কার করিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। হারানকে দেখিবামাত্র গোরার সংগ্রাম করিবার প্রবৃত্তি সশস্ত্রে উদ্যত হইয়া উঠিল।

বরদাসুন্দরী তাঁহার তিন মেয়েকে লইয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; কথা ছিল সন্ধ্যার সময় পরেশ বাবু গিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন।

পরেশ বাবুর যাইবার সময় হইয়াছে। এমন সময় গোরা ও বিনয় আসিয়া পড়াতে তাঁহার বাধা পড়িল। কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না জানিয়া তিনি হারান ও সুচরিতাকে কানে কানে বলিয়া গেলেন —তোমরা এঁদের নিয়ে একটু বোস, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আস্‌চি।

দেখিতে দেখিতে গোরা এবং হারান বাবুর মধ্যে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। যে প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক তাহা এই :—কলিকাতার অনতিদূরবর্ত্তী কোন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ব্রাউন্‌লো সাহেবের সহিত ঢাকায় থাকিতে পরেশবাবুদের আলাপ হইয়াছিল। পরেশবাবুর স্ত্রী কন্যারা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেন বলিয়া সাহেব এবং তাঁহার স্ত্রী ইঁহাদিগকে বিশেষ খাতির করিতেন। সাহেব তাঁহার জন্মদিনে প্রতিবৎসরে কৃষিপ্রদর্শনী মেলা করিয়া থাকেন। এবারে বরদাসুন্দরী ব্রাউন্‌লো সাহেবের স্ত্রীর সহিত দেখা করিবার সময় ইংরেজি কাব্য সাহিত্য প্রভৃতিতে নিজের কন্যাদের বিশেষ পারদর্শিতার কথা উত্থাপন করাতে মেম সাহেব সহসা কহিলেন, এবার মেলায় লেপ্টেনাণ্ট্‌ গবর্ণর সস্ত্রীক আসিবেন, আপনার মেয়েরা যদি তাঁহাদের সম্মুখে একটা ছোটখাট ইংরেজি কাব্য নাট্য অভিনয় করেন ত বড় ভাল হয়।—এই প্রস্তাবে বরদাসুন্দরী অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। আজ তিনি মেয়েদের রিহার্সাল্‌ দেওয়াইবার জন্যই কোনো বন্ধুর বাড়িতে লইয়া গিয়াছেন! এই মেলায় গোরার উপস্থিত থাকা সম্ভবপর হইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় গোরা কিছু অনাবশ্যক উগ্রতার সহিত বলিয়াছিল—না। এই প্রসঙ্গে এ দেশে ইংরেজ বাঙালীর সম্বন্ধ ও পরস্পর সামাজিক সম্মিলনে বাধা লইয়া দুই তরফে রীতিমত বিতণ্ডা উপস্থিত হইল।

হারান কহিলেন—বাঙালীরই দোষ। আমাদের এত কুসংস্কার ও কুপ্রথা, যে, আমরা ইংরেজের সঙ্গে মেলবার যোগ্যই নই।

গোরা কহিল,—যদি তাই সত্য হয় তবে সেই অযোগ্যতা সত্ত্বেও ইংরেজের সঙ্গে মেলবার জন্য লালায়িত হয়ে বেড়ানো আমাদের পক্ষে লজ্জাকর।

হারান কহিলেন—কিন্তু যাঁরা যোগ্য হয়েচেন তাঁরা ইংরেজের কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়ে থাকেন—যেমন এঁরা সকলে।

গোরা। একজনের সমাদরের দ্বারা অন্য সকলের অনাদরটা যেখানে বেশি করে ফুটে ওঠে সেখানে এরকম সমাদরকে আমি অপমান বলে গণ্য করি।

দেখিতে দেখিতে হারান বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং গোরা তাঁহাকে রহিয়া রহিয়া বাক্যশেলে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

দুই পক্ষে এইরূপে যখন তর্ক চলিতেছে সুচরিতা টেবিলের প্রান্তে বসিয়া পাখার আড়াল হইতে গোরাকে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে-ছিল। কি কথা হইতেছে তাহা তাহার কানে আসিতেছিল বটে কিন্তু তাহাতে তাহার মন ছিল না। সুচরিতা যে গোরাকে অনিমেষনেত্রে দেখিতেছে সে সম্বন্ধে তাহার নিজের যদি চেতনা থাকিত তবে সে লজ্জিত হইত কিন্তু সে যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া গোরাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। গোরা তাহার বলিষ্ঠ দুই বাহু টেবিলের উপরে রাখিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল; তাহার প্রশস্ত শুভ্র ললাটের উপর বাতির আলো পড়িয়াছে; তাহার মুখে কখনো অবজ্ঞার হাস্য কখনো বা ঘৃণার ভ্রূকুটি তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে; তাহার মুখের প্রত্যেক ভাবলীলায় একটা আত্মমর্য্যাদার গৌরব লক্ষিত হইতেছে; সে যাহা বলিতেছে তাহা যে কেবলমাত্র সাময়িক বিতর্ক বা আক্ষেপের কথা নহে, প্রত্যেক কথা যে তাহার অনেক দিনের চিন্তা এবং ব্যবহারের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার মধ্যে যে কোনো প্রকার দ্বিধা দুর্ব্বলতা বা আকস্মিকতা নাই তাহা কেবল তাহার কণ্ঠস্বরে নহে, তাহার মুখে এবং

তাহার সমস্ত শরীরেই যেন সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সুচরিতা তাহাকে বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল। সুচরিতা তাহার জীবনে এতদিন পরে এই প্রথম একজনকে একটি বিশেষ মানুষ একটি বিশেষ পুরুষ বলিয়া যেন দেখিতে পাইল। তাহাকে আর দশ-জনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারিল না। এই গোরার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া হারান বাবু অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরের এবং মুখের আকৃতি, তাঁহার হাব ভাব ভঙ্গী, এমন কি, তাঁহার জামা এবং চাদরখানা পর্য্যন্ত যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। এতদিন বারম্বার বিনয়ের সঙ্গে গোরার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সুচরিতা গোরাকে একটা বিশেষ দলের একটা বিশেষ মতের অসামান্য লোক বলিয়া মনে করিয়াছিল তাহার দ্বারা দেশের একটা কোনো বিশেষ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে এইমাত্র সে কল্পনা করিয়াছিল—আজ সুচরিতা তাহার মুখের দিকে একমনে চাহিতে চাহিতে সমস্ত দল, সমস্ত মত, সমস্ত উদ্দেশ্য হইতে পৃথক করিয়া গোরাকে কেবল গোরা বলিয়াই যেন দেখিতে লাগিল। চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দ্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কি, মানুষের আত্মা কি, সুচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।

হারান বাবু সুচরিতার এই তদ্গত ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার তর্কের যুক্তিগুলি জোর পাইতেছিল না। অবশেষে একসময় নিতান্ত অধীর হইয়া তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং সুচরিতাকে নিতান্ত আত্মীয়ের মত ডাকিয়া কহিলেন—সুচরিতা, একবার এ ঘরে এস, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

সুচরিতা একেবারে চমকিয়া উঠিল। তাহাকে কে যেন মারিল। হারানবাবুর সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে তিনি যে কখনো তাহাকে এরূপ আহ্বান করিতে পারেন না তাহা নহে। অন্য সময় হইলে সে কিছু মনেই করিত না; কিন্তু আজ গোরা ও বিনয়ের সম্মুখে সে নিজেকে অপমানিত বোধ করিল। বিশেষতঃ গোরা তাহার মুখের দিকে এমন এক রকম করিয়া চাহিল যে সে হারান বাবুকে ক্ষমা করিতে পারিল না। প্রথমটা, সে যেন কিছুই শুনিতে পায় নাই এমনি-ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হারান বাবু তখন কণ্ঠস্বরে একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন—শুনচ সুচরিতা, আমার একটা কথা আছে, একবার এ ঘরে আস্‌তে হবে!

সুচরিতা তাঁহার মুখের দিকে না তাকাইয়া কহিল—এখন থাক্—বাবা আসুন, তারপর হবে।

বিনয় উঠিয়া কহিল—আমরা না হয় যাচ্চি।

সুচরিতা তাড়াতাড়ি কহিল—না বিনয় বাবু, উঠবেন না। বাবা আপনাদের থাকতে বলেচেন। তিনি এলেন বলে!—তাহার কণ্ঠস্বরে একটা ব্যাকুল অনুনয়ের ভাব প্রকাশ পাইল। হরিণীকে যেন ব্যাধের হাতে ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

আমি আর থাক্‌তে পারচিনে, আমি তবে চল্লুম, বলিয়া হারান বাবু দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। রাগের মাথায় বাহির হইয়া আসিয়া পরক্ষণেই তাঁহার অনুতাপ হইতে লাগিল কিন্তু তখন ফিরিবার আর কোনো উপলক্ষ খুঁজিয়া পাইলেন না।

হারান বাবু চলিয়া গেলে সুচরিতা একটা কোন্ সুগভীর লজ্জায় মুখ যখন রক্তিম ও নত করিয়া বসিয়াছিল, কি করিবে কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না—সেই সময়ে গোরা তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া লইবার অবকাশ পাইয়াছিল। গোরা শিক্ষিত মেয়েদের

মধ্যে যে ঔদ্ধত্য যে প্রগল্‌ভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়? তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কি সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে! মুখের ডৌলটি কি সুকুমার! ভ্রূযুগলের উপরে ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ! ঠোঁট দুটি চুপ করিয়া আছে কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মত রহিয়াছে! নবীনা রমণীর বেশভূষার প্রতি গোরা পূর্ব্বে কোনো দিন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই এবং না দেখিয়াই সে সমস্তের প্রতি তাহার একটা ধিক্কার ভাব ছিল—আজ সুচরিতার দেহে তাহার নূতন ধরণের শাড়ি পরার ভঙ্গী তাহার একটু বিশেষভাবে ভাল লাগিল;—সুচরিতার একটি হাত টেবিলের উপরে ছিল—তাহার জামার আস্তিনের কুঞ্চিত প্রান্ত হইতে সেই হাতখানি আজ গোরার চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণ বাণীর মত বোধ হইল। দীপালোকিত শান্ত সন্ধ্যায় সুচরিতাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত ঘরটি তাহার আলো, তাহার দেয়ালের ছবি, তাহার গৃহসজ্জা, তাহার পারিপাট্য লইয়া একটি যেন বিশেষ অখণ্ড রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিল। তাহা যে গৃহ, তাহা যে সেবাকুশলা নারীর যত্নে স্নেহে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত, তাহা যে দেয়াল ও কড়ি বরগা ছাদের চেয়ে অনেক বেশি—ইহা আজ গোরার কাছে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ক্রমশই সুচরিতার কপালের ভ্রষ্ট কেশ হইতে তাহার পায়ের কাছে শাড়ির পাড়টুকু পর্য্যন্ত অত্যন্ত সত্য এবং অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল। একইকালে সমগ্রভাবে সুচরিতা, এবং সুচরিতার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্রভাবে গোরার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কেহ কোনো কথা কহিতে না পারিয়া সকলেই একপ্রকার

কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তখন বিনয় সুচরিতার দিকে চাহিয়া কহিল—সেদিন আমাদের কথা হচ্ছিল বলিয়া একটা কথা উত্থাপন করিয়া দিল।

সে কহিল—আপনাকে ত বলেইচি আমার এমন একদিন ছিল যখন আমার মনে বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশের জন্যে সমাজের জন্যে আমাদের কিছু আশা করবার নেই—চিরদিনই আমরা নাবালকের মত কাটাব এবং ইংরেজ আমাদের অছি নিযুক্ত হয়ে থাকবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই এই রকম মনের ভাব। এমন অবস্থায় মানুষ, হয় নিজের স্বার্থ নিয়েই থাকে, নয় উদাসীনভাবে কাটায়। আমিও এক সময়ে ঠিক করেছিলুম গোরার বাবাকে মুরুব্বি ধরে একটা চাকরির জোগাড় করে নেব। এমন সময় গোরা আমাকে বল্‌লে—না গবর্মেণ্টের চাক্‌রি তুমি কোনো মতেই করতে পারবে না।

গোরা এই কথায় সুচরিতার মুখে একটুখানি বিস্ময়ের আভাস দেখিয়া কহিল আপনি, মনে করবেন না গবর্মেণ্টের উপর রাগ করে আমি এমন কথা বলচি। গবর্মেণ্টের কাজ যারা করে তারা গবর্মেণ্টের শক্তিকে নিজের শক্তি বলে একটা গর্ব্ব বোধ করে এবং দেশের লোকের থেকে একটা ভিন্ন শ্রেণীর হয়ে ওঠে—যত দিন যাচ্চে আমাদের এই ভাবটা ততই বেড়ে উঠ্‌চে। আমি জানি আমার একটি আত্মীয় সাবেক কালের ডেপুটি ছিলেন—এখন তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। তাঁকে ডিষ্টিক্ট্‌ ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাবু তোমার বিচারে এত বেশি লোক খালাস পায় কেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, সাহেব তার একটি কারণ আছে; তুমি যাদের জেলে দাও তারা তোমার পক্ষে কুকুর বিড়াল মাত্র আর আমি যাদের জেলে দিই তারা যে আমার ভাই হয়।—এতবড় কথা বলতে পারে এমন ডেপুটি তখনো ছিল এবং শুন্‌তে পারে এমন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটেরও অভাব ছিল না। কিন্তু যতই দিন যাচ্চে চাক্‌রির দড়াদড়ি অঙ্গের ভূষণ হয়ে উঠ্‌চে এবং এখনকার ডেপুটির কাছে তাঁর

দেশের লোক ক্রমেই কুকুর বিড়াল হয়ে দাঁড়াচ্চে; এবং এমনি করে পদের উন্নতি হতে হতে তাঁদের যে কেবলি অধোগতি হচ্চে একথার অনুভূতি পর্য্যন্ত তাঁদের চলে যাচ্চে। পরের কাঁধে ভর দিয়ে নিজের লোকদের নীচু করে দেখ্‌ব এবং নীচু করে দেখবামাত্রই তাদের প্রতি অবিচার করতে বাধ্য হব, এতে কোনো মঙ্গল হতে পারে না। বলিয়া গোরা টেবিলে একটা মুষ্টি আঘাত করিল; তেলের সেজটা কাঁপিয়া উঠিল।

বিনয় কহিল—গোরা, এ টেবিলটা গবর্মেণ্টের নয়, আর এই সেজটা পরেশবাবুদের।

শুনিয়া গোরা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাস্যের প্রবল ধ্বনিতে সমস্ত বাড়িটা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঠাট্টা শুনিয়া গোরা যে ছেলেমানুষের মত এমন প্রচুরভাবে হাসিয়া উঠিতে পারে ইহাতে সুচরিতা আশ্চর্য্য বোধ করিল এবং তাহার মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দ হইল। যাহারা বড় কথার চিন্তা করে তাহারা যে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে একথা তাহার যেন জানা ছিল না।

গোরা সেদিন অনেক কথাই বলিল। সুচরিতা যদিও চুপ করিয়া ছিল কিন্তু তাহার মুখের ভাবে গোরা এমন একটা সায় পাইল যে উৎসাহে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। শেষকালে সুচরিতাকেই যেন বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া কহিল—দেখুন একটি কথা মনে রাখবেন;—যদি এমন ভুল সংস্কার আমাদের হয় যে ইংরেজরা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন আমরাও ঠিক ইংরেজটি না হলে কোনো মতে প্রবল হতে পারব না তা হলে সে অসম্ভব কোনো দিন সম্ভব হবে না এবং কেবলি নকল করতে করতে আমরা দুয়ের বা'র হয়ে যাব। আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ, আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এর সমস্ত ভাল মন্দের মাঝখানেই নেবে দাঁড়ান,—যদি বিকৃতি থাকে, তবে ভিতরে থেকে

সংশোধন করে তুলুন, কিন্তু একে দেখুন, বুঝুন, ভাবুন, এর দিকে মুখ ফেরান্, এক সঙ্গে এক হোন্, এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে, খৃষ্টানী সংস্কারে বাল্যকাল হতে অস্থি মজ্জায় দীক্ষিত হয়ে এ'কে আপনি বুঝতেই পারবেন না, এ'কে কেবলি আঘাত করতেই থাক্‌বেন, এর কোনো কাজেই লাগ্‌বেন না।

গোরা বলিল বটে—আমার অনুরোধ—কিন্তু এ ত অনুরোধ নয়, এ যেন আদেশ। কথার মধ্যে এমন একটা প্রচণ্ড জোর যে, তাহা অন্যের সম্মতির অপেক্ষাই করে না। সুচরিতা মুখ নত করিয়াই সমস্ত শুনিল। এমন একটা প্রবল আগ্রহের সঙ্গে গোরা যে তাহাকেই বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া এই কথা কয়টি কহিল তাহাতে সুচরিতার মনের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া দিল। সুচরিতা তাহার সমস্ত সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়া অত্যন্ত সহজ বিনয়ের সহিত কহিল—আমি দেশের কথা কখনো এমন করে বড় করে সত্য করে ভাবিনি। কিন্তু একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি—ধর্ম্মের সঙ্গে দেশের যোগ কি? ধর্ম্ম কি দেশের অতীত নয়?

গোরার কানে সুচরিতার মৃদু কণ্ঠের এই প্রশ্ন বড় মধুর লাগিল। সুচরিতার বড় বড় দুইটি চোখের মধ্যে এই প্রশ্নটি আরো মধুর করিয়া দেখা দিল। গোরা কহিল—দেশের অতীত যা,' দেশের চেয়ে যা' অনেক বড় তাই দেশের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর এম্‌নি বিচিত্র ভাবে আপনার অনন্ত স্বরূপকেই ব্যক্ত করচেন। যাঁরা বলেন সত্য এক, অতএব কেবলি একটি ধর্ম্মের সত্য, ধর্ম্মের একটিমাত্র রূপই সত্য—তাঁরা, সত্য যে এক, কেবল এই সত্যটিই মানেন, আর সত্য যে অন্তহীন সে সত্যটা মান্‌তে চান না। অন্তহীন এক অন্তহীন অনেকে আপনাকে প্রকাশ করেন। আমি আপনাকে নিশ্চয় বলচি ভারতবর্ষের খোলা জান্‌লা দিয়ে আপনি সূর্য্যকে দেখতে পাবেন—সে জন্যে

সমুদ্রপারে গিয়ে খৃষ্টান গির্জ্জার জালনায় বসবার কোনো দরকার হবে না।

সুচরিতা কহিল—আপনি বলতে চান ভারতবর্ষের ধর্ম্মতন্ত্র একটি বিশেষ পথ দিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। সেই বিশেষত্বটি কি?

গোরা কহিল—সেটা হচ্চে এই যে ব্রহ্ম, যিনি নির্ব্বিশেষ, তিনি বিশেষের মধ্যেই ব্যক্ত। যিনি নিরাকার তাঁর আকারের অন্ত নেই—হ্রস্ব দীর্ঘ স্থূল সূক্ষ্মের অনন্ত প্রবাহই তাঁর।—যিনি অনন্ত বিশেষ তিনিই নির্ব্বিশেষ, যিনি অনন্তরূপ তিনিই অরূপ। অন্যান্য দেশে ঈশ্বরকে ন্যূনাধিক পরিমাণে কোনো একটি মাত্র বিশেষের মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করেচে—ভারতবর্ষেও ঈশ্বরকে বিশেষের মধ্যে দেখবার চেষ্টা আছে বটে কিন্তু সেই বিশেষকেই ভারতবর্ষ একমাত্র ও চূড়ান্ত বলে গণ্য করে না। ঈশ্বর যে সেই বিশেষকেও অনন্তগুণে অতিক্রম করে আছেন এ কথা ভারতবর্ষের কোনো ভক্ত কোনোদিন অস্বীকার করেন না।

সুচরিতা কহিল—জ্ঞানী করেন না কিন্তু অজ্ঞানী?

গোরা কহিল, আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি অজ্ঞানী সকল দেশেই সকল সত্যকেই বিকৃত করবে।

সুচরিতা কহিল—কিন্তু আমাদের দেশে সেই বিকার কি বেশি দূর পর্য্যন্ত পৌঁছায়নি?

গোরা কহিল—তা হতে পারে। কিন্তু তার কারণ, ধর্ম্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম, অন্তর ও বাহির, শরীর ও আত্মা এই দুটো অঙ্গকেই ভারতবর্ষ পূর্ণভাবে স্বীকার করতে চায় বলেই যারা সূক্ষ্মকে গ্রহণ করতে পারে না তারা স্থূলটাকেই নেয় এবং অজ্ঞানের দ্বারা সেই স্থূলের মধ্যে নানা অদ্ভুত বিকার ঘটাতে থাকে। কিন্তু যিনি রূপেও সত্য, অরূপেও সত্য, স্থূলেও সত্য, সূক্ষ্মেও সত্য, ধ্যানেও সত্য, প্রত্যক্ষেও সত্য, তাঁকে ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে দেহে মনে কর্ম্মে উপলব্ধি করবার যে আশ্চর্য্য,

বিচিত্র ও প্রকাণ্ড চেষ্টা করেচে তাকে আমরা মূঢ়ের মত অশ্রদ্ধা করে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর নাস্তিকতায়-আস্তিকতায় মিশ্রিত একটা সঙ্কীর্ণ নীরস অঙ্গহীন ধর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করব এ হতেই পারে না।

সুচরিতা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া গোরা কহিল—আমাকে আপনি একটা গোঁড়া ব্যক্তি বলে মনে করবেন না। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে গোঁড়া লোকেরা, বিশেষতঃ যারা হঠাৎ নতুন গোঁড়া হয়ে উঠেছে তারা যে ভাবে কথা কয় আমার কথা সে ভাবে গ্রহণ করবেন না। ভারতবর্ষের নানা প্রকার প্রকাশে, এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে এক দলে মিশে ধূলায় গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না। ভারতবর্ষের এই বাণী কেউবা বোঝে কেউবা বোঝে না—তা নাই হল—আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক—তারা আমার সকলেই আপন—তাদের সকলের মধ্যেই চিরন্তন ভারতবর্ষের নিগূঢ় আবির্ভাব নিয়ত কাজ করচে সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই।

গোরার প্রবলকণ্ঠের এই কথাগুলি ঘরের দেয়ালে টেবিলে, সমস্ত আস্‌বাব পত্রেও যেন কাঁপিতে লাগিল।

এ সমস্ত কথা সুচরিতার পক্ষে খুব স্পষ্ট বুঝিবার কথা নহে—কিন্তু অনুভূতির প্রথম অস্পষ্ট সঞ্চারের বেগ অত্যন্ত প্রবল। জীবনটা যে নিতান্তই চারটে দেয়ালের মধ্যে বা একটা দলের মধ্যে বদ্ধ নহে এই উপলব্ধিটা সুচরিতাকে যেন পীড়া দিতে লাগিল।

এমন সময় সিঁড়ির কাছ হইতে মেয়েদের উচ্চহাস্যমিশ্রিত দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। বরদাসুন্দরী ও মেয়েদের লইয়া পরেশ বাবু,

ফিরিয়াছেন। সুধীর সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় মেয়েদের উপর কি একটা উৎপাত করিতেছে তাহাই লইয়া এই হাস্যধ্বনির সৃষ্টি।

লাবণ্য, ললিতা ও সতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই গোরাকে দেখিয়া সংযত হইয়া দাঁড়াইল। লাবণ্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—সতীশ বিনয়ের চৌকির পাশে দাঁড়াইয়া কানে কানে তাহার সহিত বিশ্রম্ভালাপ সুরু করিয়া দিল। ললিতা সুচরিতার পশ্চাতে চৌকি টানিয়া তাহার আড়ালে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া বসিল।

পরেশ আসিয়া কহিলেন—আমার ফিরতে বড় দেরি হয়ে গেল। পানু বাবু বুঝি চলে গেছেন?

সুচরিতা তাহার কোনো উত্তর দিল না—বিনয় কহিল—হাঁ, তিনি থাকৃতে পারলেন না।

গোরা উঠিয়া কহিল—আজ আমরাও আসি।—বলিয়া পরেশ বাবুকে নত হইয়া নমস্কার করিল।

পরেশ বাবু কহিলেন—আজ আর তোমাদের সঙ্গে আলাপ করবার সময় পেলুম না। বাবা, যখন তোমাদের অবকাশ হবে মাঝে মাঝে এস।

গোরা ও বিনয় ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া পড়িলেন। উভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিল। তিনি কহিলেন, আপনারা এখন যাচ্চেন না কি?

গোরা কহিল—হাঁ।

বরদাসুন্দরী বিনয়কে কহিলেন—কিন্তু বিনয় বাবু আপনি যেতে পারচেন না—আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে। আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে।

সতীশ লাফাইয়া উঠিয়া বিনয়ের হাত ধরিল এবং কহিল—হাঁ, মা, বিনয় বাবুকে যেতে দিয়ো না, উনি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে থাকৃবেন।

বিনয় কিছু কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর দিতে পারিতেছিল না দেখিয়া বরদা-

সুন্দরী গোরাকে কহিলেন—বিনয় বাবুকে কি আপনি নিয়ে যেতে চান? ওঁকে আপনার দরকার আছে?

গোরা কহিল—কিছু না। বিনয় তুমি থাক না—আমি আস্‌চি। বলিয়া গোরা দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিনয়ের থাকা সম্বন্ধে বরদাসুন্দরী যখনি গোরার সম্মতি লইলেন সেই মুহূর্ত্তেই বিনয় ললিতার মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না। ললিতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

ললিতার এই ছোট খাট হাসি বিদ্রূপের সঙ্গে বিনয় ঝগড়া করিতেও পারে না—অথচ ইহা তাহাকে কাঁটার মত বেঁধে। বিনয় ঘরে আসিয়া বসিতেই ললিতা কহিল—বিনয় বাবু, আজ আপনি পালালেই ভাল করতেন।

বিনয় কহিল—কেন?

ললিতা। মা আপনাকে বিপদে ফেলবার মৎলব করচেন। ম্যাজি-ষ্ট্রেটের মেলায় যে অভিনয় হবে তাতে একজন লোক কম পড়চে—মা আপনাকে ঠিক করেচেন।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল—কি সর্ব্বনাশ। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।

ললিতা হাসিয়া কহিল—সে আমি মাকে আগেই বলেচি। এ অভিনয়ে আপনার বন্ধু কখনই আপনাকে যোগ দিতে দেবেন না।

বিনয় খোঁচা খাইয়া কহিল—বন্ধুর কথা রেখে দিন। আমি সাত জন্মে কখনো অভিনয় করিনি—আমাকে কেন?

ললিতা কহিল—আমরাই বুঝি জন্মজন্মান্তর অভিনয় করে আস্‌চি?

এই সময় বরদাসুন্দরী ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। ললিতা কহিল—মা, তুমি অভিনয়ে বিনয় বাবুকে মিথ্যা ডাক্‌চ। আগে ওঁর বন্ধুকে যদি রাজি করাতে পার তা হলে—

বিনয় কাতর হইয়া কহিল—বন্ধুর রাজি হওয়া নিয়ে কথাই হচ্চে না। অভিনয় ত করলেই হয় না—আমার সে ক্ষমতাই নেই।

বরদাসুন্দরী কহিলেন—সে জন্যে ভাববেন না—আমরা আপনাকে শিখিয়ে ঠিক করে নিতে পারব। ছোট ছোট মেয়েরা পারবে আর আপনি পারবেন না?

বিনয়ের উদ্ধারের কোনো উপায় রহিল না।

২২

গোরা তাহার স্বাভাবিক দ্রুতগতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে বাড়ি চলিল। বাড়ি যাইবার সহজপথ ছাড়িয়া সে অনেকটা ঘুরিয়া গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিল। তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বণিক্‌সভ্যতার লাভ-লোলুপ কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রিজের বেড়ি পরে নাই। তখনকার শীতসন্ধ্যায় নগরের নিঃশ্বাসকালিমা আকাশকে এমন নিবিড় করিয়া আচ্ছন্ন করিত না। নদী তখন বহুদূর হিমালয়ের নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গ হইতে কলিকাতার ধূলিলিপ্ত ব্যস্ততার মাঝখানে শান্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিত।

প্রকৃতি কোনো দিন গোরার মনকে আকর্ষণ করিবার অবকাশ পায় নাই। তাহার মন নিজের সচেষ্টতার বেগে নিজে কেবলই তরঙ্গিত হইয়া ছিল;—যে জল স্থল আকাশ অব্যবহিতভাবে তাহার চেষ্টার ক্ষেত্র নহে তাহাকে সে লক্ষ্যই করে নাই।

আজ কিন্তু নদীর উপরকার ঐ আকাশ আপনার নক্ষত্রালোকে অভিষিক্ত অন্ধকার দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারম্বার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ; কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে, আর, কতকগুলি দীপহীন নিস্তব্ধ। ওপারের নিবিড় গাছগুলির মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই ঊর্দ্ধে বৃহস্পতিগ্রহ

অন্ধকারের অন্তর্যামীর মত তিমিরভেদী অনিমেষদৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।

আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট্ অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি এতকাল ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির হইয়া ছিল—আজ গোরার অন্তঃকরণের কোন্ দ্বারটা খোলা পাইয়া সে মুহূর্ত্তের মধ্যে এই অসতর্ক দুর্গটিকে আপনার করিয়া লইল। এতদিন নিজের বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তা ও কর্ম্ম লইয়া গোরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল—আজ কি হইল? আজ কোন্‌খানে সে প্রকৃতিকে স্বীকার করিল এবং করিবামাত্রই এই গভীর কালো জল, এই নিবিড় কালো তট, ঐ উদার কালো আকাশ তাহাকে বরণ করিয়া লইল। আজ প্রকৃতির কাছে কেমন করিয়া গোরা ধরা পড়িয়া গেছে।

পথের ধারে সদাগরের আপিসের বাগানে কোন্ বিলাতী লতা হইতে একটা অপরিচিত ফুলের মৃদুকোমল গন্ধ গোরার ব্যাকুল হৃদয়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। নদী তাহাকে লোকালয়ের অশ্রান্ত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে কোন্ অনির্দ্দেশ্য সুদূরের দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল;—সেখানে নির্জ্জন জলের ধারে গাছগুলি শাখা মিলাইয়া কি ফুল ফুটাইয়াছে—কি ছায়া ফেলিয়াছে!—সেখানে নির্ম্মল নীলাকাশের নীচে দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া। চারিদিক হইতে মাধুর্য্যের আবর্ত্ত আসিয়া হঠাৎ গোরাকে যে একটা অতলস্পর্শ অনাদি শক্তির আকর্ষণে টানিয়া লইয়া চলিল পূর্ব্বে কোনো দিন সে তাহার কোনো পরিচয় জানিত না। ইহা একই কালে ব্যথায় এবং হর্ষে তাহার সমস্ত মনকে একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে অভিহত করিতে লাগিল। আজ এই হেমন্তের রাতে, নদীর তীরে, নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের

অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল ;—এই মহারাণীকে সে এতদিন নতমস্তকে স্বীকার করে নাই বলিয়াই আজ অকস্মাৎ তাহার শাসনের ইন্দ্রজাল আপন সহস্রবর্ণের সূত্রে গোরাকে জলস্থল আকাশের সঙ্গে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া ফেলিল। গোরা নিজের সম্বন্ধে নিজেই বিস্মিত হইয়া নদীর জনশূন্য ঘাটের একটা পঁইঠায় বসিয়া পড়িল। বারবার সে নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল যে, তাহার জীবনে এ কিসের আবির্ভাব এবং ইহার কি প্রয়োজন! যে সংকল্প দ্বারা সে আপনার জীবনকে আগাগোড়া বিধিবদ্ধ করিয়া মনে মনে সাজাইয়া লইয়াছিল তাহার মধ্যে ইহার স্থান কোথায়? ইহা কি তাহার বিরুদ্ধ? সংগ্রাম করিয়া ইহাকে কি পরাস্ত করিতে হইবে? এই বলিয়া গোরা মুষ্টি দৃঢ় করিয়া যখনি বদ্ধ করিল অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নম্রতায় কোমল, কোন্ দুইটি স্নিগ্ধ চক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল—কোন্ অনিন্দ্যসুন্দর হাতখানির আঙুলগুলি স্পর্শসৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল; গোরার সমস্ত শরীরে পুলকের বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিল। একাকী অন্ধকারের মধ্যে এই প্রগাঢ় অনুভূতি তাহার সমস্ত প্রশ্নকে সমস্ত দ্বিধাকে একেবারে নিরস্ত করিয়া দিল; সে তাহার নূতন অনুভূতিকে সমস্ত দেহ মন দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল—ইহাকে ছাড়িয়া সে উঠিতে ইচ্ছা করিল না।

অনেক রাত্রে যখন গোরা বাড়ি গেল তখন আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন এত রাত করলে যে বাবা, তোমার খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

গোরা কহিল—কি জানি মা, আজ কি মনে হল, অনেকক্ষণ গঙ্গার ঘাটে বসে ছিলুম।

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনয় সঙ্গে ছিল বুঝি?

গোরা কহিল—না, আমি একলাই ছিলুম।

আনন্দময়ী মনে মনে কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। বিনা প্রয়োজনে গোরা যে এত রাত পর্য্যন্ত গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ভাবিবে এমন ঘটনা কখনই হয় নি। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবা তার স্বভাবই নহে গোরা যখন অন্যমনস্ক হইয়া খাইতেছিল আনন্দময়ী লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন তাহার মুখে যেন একটা কেমনতর উতলা ভাবের উদ্দীপনা।

আনন্দময়ী কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ বুঝি বিনয়ের বাড়ি গিয়েছিলে?

গোরা কহিল—না, আজ আমরা দুজনেই পরেশ বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম।

শুনিয়া আনন্দময়ী চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—ওঁদের সকলের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?

গোরা কহিল—হাঁ হয়েছে।

আনন্দময়ী। ওঁদের মেয়েরা বুঝি সকলের সাক্ষাতেই বেরন?

গোরা। হাঁ, ওঁদের কোনো বাধা নেই।

অন্য সময় হইলে এরূপ উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তেজনা প্রকাশ পাইত, আজ তাহার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া আনন্দময়ী আবার চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া গোরা অন্যদিনের মত অবিলম্বে মুখ ধুইয়া দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে গেল না। সে অন্যমনস্কভাবে তাহার শোবার ঘরের পূর্ব্বদিকের দরজা খুলিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের গলিটা পূর্ব্বের দিকে একটা বড় রাস্তায় পড়িয়াছে; সেই বড়রাস্তার পূর্ব্বপ্রান্তে একটা ইস্কুল আছে; সেই ইস্কুলের সংলগ্ন জমিতে একটা পুরাতন জাম গাছের মাথার উপরে পাৎলা একখণ্ড শাদা কুয়াসা ভাসিতেছিল এবং তাহার পশ্চাতে আসন্ন সূর্য্যোদয়ের অরুণ রেখা ঝাপসা হইয়া

দেখা দিতেছিল। গোরা চুপ করিয়া অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সেই ক্ষীণ কুয়াসাটুকু মিশিয়া গেল, উজ্জ্বল রৌদ্র গাছের শাখার ভিতর দিয়া যেন অনেক গুলো ঝক্‌ঝকে সঙিনের মত বিঁধিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং দেখিতে দেখিতে কলিকাতার রাস্তা জনতায় ও কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ গলির মোড়ে অবিনাশের সঙ্গে আর কয়েকটি ছাত্রকে তাহার বাড়ির দিকে আসিতে দেখিয়া গোরা তাহার এই আবেশের জালকে যেন এক প্রবল টানে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সে নিজের মনকে একটা প্রচণ্ড আঘাত করিয়া বলিল, না এসব কিছু নয়; এ কোনো মতেই চলিবে না।—বলিয়া দ্রুতবেগে শোবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গোরার বাড়িতে তাহার দলবল আসিয়াছে অথচ গোরা তাহার অনেক পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া নাই এমন ঘটনা ইহার পূর্ব্বে আর একদিনও ঘটিতে পায় নাই। এই সামান্য ত্রুটিতেই গোরাকে ভারি একটা ধিক্কার দিল। সে মনে মনে স্থির করিল আর সে পরেশবাবুর বাড়ি যাইবে না এবং বিনয়ের সঙ্গেও যাহাতে কিছুদিন দেখা না হইয়া এই সমস্ত আলোচনা বন্ধ থাকে সেইরূপ চেষ্টা করিবে।

সে দিন নীচে গিয়া এই পরামর্শ হইল যে গোরা তাহার দলের দুই তিন জনকে সঙ্গে করিয়া পায়ে হাঁটিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া ভ্রমণে বাহির হইবে; পথের মধ্যে গৃহস্থবাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিবে, সঙ্গে টাকাকড়ি কিছুই লইবে না।

এই অপূর্ব্ব সংকল্প মনে লইয়া গোরা হঠাৎ কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া এইরূপ খোলা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িবার একটা প্রবল আনন্দ তাহাকে পাইয়া বসিল। ভিতরে ভিতরে তাহার হৃদয় যে একটা জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে, এই বাহির হইবার কল্পনাতেই, সেটা যেন ছিন্ন হইয়া গেল বলিয়া তাহার মনে

হইল। এই সমস্ত ভাবের আবেশ যে মায়ামাত্র এবং কর্ম্মই যে সত্য সেই কথাটা খুব জোরের সহিত নিজের মনের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইবার জন্য, ইস্কুল-ছুটির বালকের মত গোরা তাহার একতলার বসিবার ঘর ছাড়িয়া প্রায় ছুটিয়া বাহির হইল। সেই সময় কৃষ্ণদয়াল গঙ্গাস্নান সারিয়া ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া নামাবলী গায়ে দিয়া মনে মনে মন্ত্র জপ করিতে করিতে ঘরে চলিয়াছিলেন। গোরা একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল। লজ্জিত হইয়া গোরা তাড়াতাড়ি তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। তিনি শশব্যস্ত হইয়া থাক্ থাক্ বলিয়া সসঙ্কোচে চলিয়া গেলেন। পূজায় বসিবার পূর্ব্বে গোরার স্পর্শে তাঁহার গাঙ্গাস্নানের ফল মাটি হইল। কৃষ্ণদয়াল যে গোরার সংস্পর্শই বিশেষ করিয়া এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন গোরা তাহা ঠিক বুঝিত না; সে মনে করিত শুচিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া চলাই অহরহ তাঁহার সতর্কতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল; আনন্দময়ীকে ত তিনি ম্লেচ্ছ বলিয়া দূরে পরিহার করিতেন,—মহিম কাজের লোক, মহিমের সঙ্গে তাঁহার দেখা সাক্ষাতেরই অবকাশ ঘটিত না। সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল মহিমের কন্যা শশিমুখীকে তিনি কাছে লইয়া তাহাকে সংস্কৃত স্তোত্র মুখস্থ করাইতেন এবং পূজার্চ্চনাবিধিতে দীক্ষিত করিতেন।

কৃষ্ণদয়াল গোরাকর্ত্তৃক তাঁহার পাদস্পর্শে ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিলে পর তাঁহার সঙ্কোচের কারণ সম্বন্ধে গোরার চেতনা হইল এবং সে মনে মনে হাসিল। এইরূপে পিতার সহিত গোরার সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং মাতার অনাচারকে সে যতই নিন্দা করুক এই আচারদ্রোহিনী মাকেই গোরা তাহার জীবনের সমস্ত ভক্তি সমর্পণ করিয়া পূজা করিত।

আহারান্তে গোরা একটি ছোট পুঁটলিতে গোটাকয়েক কাপড় লইয়া

সেটা বিলাতী পর্য্যটকদের মত পিঠে বাঁধিয়া মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল—মা, আমি কিছুদিনের মত বেরব।

আনন্দময়ী কহিলেন, কোথায় যাবে বাবা? গোরা কহিল, সেটা আমি ঠিক বলতে পারচি নে। আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনো কাজ আছে? গোরা কহিল—কাজ বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছু নয়—এই যাওয়াটাই একটা কাজ!

আনন্দময়ীকে একটু খানি চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া গোরা কহিল—মা, দোহাই তোমার, আমাকে বারণ করতে পারবে না। তুমি ত আমাকে জানই, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব এমন ভয় নেই। আমি মাকে ছেড়ে বেশি দিন কোথাও থাক্‌তে পারিনে।

মার প্রতি তাহার ভালবাসা গোরা কোনোদিন মুখে এমন করিয়া বলে নাই—তাই আজ কথাটা বলিয়াই সে লজ্জিত হইল।

পুলকিত আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি তাহার লজ্জাটা চাপা দিয়া কহিলেন—বিনয় সঙ্গে যাবে বুঝি?

গোরা ব্যস্ত হইয়া কহিল—না, মা, বিনয় যাবে না। ঐ দেখ, অমনি মার মনে ভাবনা হচ্চে, বিনয় না গেলে তাঁর গোরাকে পথে ঘাটে রক্ষা কর্‌বে কে? বিনয়কে যদি তুমি আমার রক্ষক মনে কর সেটা তোমার একটা কুসংস্কার—এবার নিরাপদে ফিরে এলে ঐ সংস্কারটা তোমার ঘুচ্‌বে।

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, মাঝে মাঝে খবর পাব ত?

গোরা কহিল, খবর পাবে না বলেই ঠিক করে রাখ—তার পরে যদি পাও ত খুসি হবে। ভয় কিছুই নেই; তোমার গোরাকে কেউ নেবে না। মা,—তুমি আমার যতটা মূল্য কল্পনা কর আর কেউ ততটা করে না। তবে এই বোঁচ্‌কাটির উপর যদি কারো লোভ হয় তবে এটি তাকে দান করে দিয়ে চলে আসব; এটা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দান করব না—সে নিশ্চয়!

গোরা আনন্দময়ীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল, তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া হাত চুম্বন করিলেন—কোন প্রকার নিষেধ মাত্র করিলেন না। নিজের কষ্ট হইবে বলিয়া অথবা কল্পনায় অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া আনন্দময়ী কখনো কাহাকেও নিষেধ করিতেন না। নিজের জীবনে তিনি অনেক বাধা বিপদের মধ্যে দিয়া আসিয়াছেন, বাহিরের পৃথিবী তাঁহার কাছে অপরিচিত নহে; তাঁহার মনে ভয় বলিয়া কিছু ছিল না। গোরা যে কোনো বিপদে পড়িবে সে ভয় তিনি মনে আনেন নাই—কিন্তু গোরার মনের মধ্যে যে কি একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে সেই কথাই তিনি কাল হইতে ভাবিতেছেন। আজ হঠাৎ গোরা অকারণে ভ্রমণ করিতে চলিল শুনিয়া তাঁহার সেই ভাবনা আরো বাড়িয়া উঠিয়াছে।

গোরা পিঠে বোঁচকা বাঁধিয়া রাস্তায় যেই পা দিয়াছে এমন সময় হাতে ঘনরক্ত বসোরা গোলাপযুগল সযত্নে লইয়া বিনয় তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোরা কহিল—বিনয়,তোমার দর্শনে অযাত্রা কি সুযাত্রা এবারে তার পরীক্ষা হবে।

বিনয় কহিল—বেরচ্চ না কি ?

গোরা কহিল—হাঁ।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় ?

গোরা কহিল—প্রতিধ্বনি উত্তর করিল কোথায়।

বিনয়। প্রতিধ্বনির চেয়ে কি ভাল উত্তর নেই না কি ?

গোরা। না। তুমি মার কাছে যাও, সব শুনতে পাবে। আমি চল্লুম।—বলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

বিনয় অন্তঃপুরে গিয়া আনন্দময়ীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের পরে গোলাপফুল দুইটি রাখিল।

আনন্দময়ী ফুল তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কোথায় পেলে বিনয় ?

বিনয় তাহার ঠিক স্পষ্ট উত্তরটি না দিয়া কহিল—ভাল জিনিষটি পেলেই আগে মায়ের পূজোর জন্যে সেটি দিতে ইচ্ছা করে।

তার পরে আনন্দময়ীর তক্তপোষের উপর বসিয়া বিনয় কহিল—মা, কিন্তু অন্যমনস্ক আছ।

আনন্দময়ী কহিলেন—কেন বল দেখি ?

বিনয় কহিল, আজ আমার বরাদ্দ পানটা দেবার কথা ভুলেই গেছ।

আনন্দময়ী লজ্জিত হইয়া বিনয়কে পান আনিয়া দিলেন।

তাহার পরে সমস্ত দুপর বেলা ধরিয়া দুইজনে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। গোরার নিরুদ্দেশ ভ্রমণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে বিনয় কোনো পরিষ্কার খবর বলিতে পারিল না।

আনন্দময়ী কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন কাল বুঝি তুমি গোরাকে নিয়ে পরেশবাবুর ওখানে গিয়েছিলে ?

বিনয় গত কল্যকার সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল। আনন্দময়ী প্রত্যেক কথাটি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শুনিলেন।

যাইবার সময় বিনয় কহিল, মা, পূজা ত সাঙ্গ হল, এবার তোমার চরণের প্রসাদী ফুল দুটো মাথায় করে নিয়ে যেতে পারি ?

আনন্দময়ী হাসিয়া গোলাপ ফুল দুইটি বিনয়ের হাতে দিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন এ গোলাপ দুইটি যে কেবল সৌন্দর্য্যের জন্যই আদর পাইতেছে তাহা নহে—নিশ্চয়ই উদ্ভিদতত্ত্বের অতীত আরো অনেক গভীর তত্ত্ব ইহার মধ্যে আছে।

বিকাল বেলায় বিনয় চলিয়া গেলে তিনি কতই ভাবিতে লাগিলেন। ভগবানকে ডাকিয়া বারবার প্রার্থনা করিলেন—গোরাকে যেন অসুখী হইতে না হয় এবং বিনয়ের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদের যেন কোনো কারণ না ঘটে।

২৩

গোলাপ ফুলের একটু ইতিহাস আছে।

কাল রাত্রে গোরা ত পরেশবাবুর বাড়ি হইতে চলিয়া আসিল—কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়িতে সেই অভিনয়ে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব লইয়া বিনয়কে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

এই অভিনয়ে ললিতার যে কোনো উৎসাহ ছিল তাহা নহে—সে বরঞ্চ এসব ব্যাপার ভালই বাসিত না। কিন্তু কোনো মতে বিনয়কে এই অভিনয়ে জড়িত করিবার জন্য তাহার মনের মধ্যে যেন একটা জেদ চাপিয়া গিয়াছিল। যে সমস্ত কাজ গোরার মতবিরুদ্ধ, বিনয়কে দিয়া তাহা সাধন করাইবার জন্য তাহার একটা রোখ জন্মিয়াছিল। বিনয় যে গোরার অনুবর্ত্তী, ইহা ললিতার কাছে কেন এত অসহ্য হইয়াছিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। যেমন করিয়া হোক্ সমস্ত বন্ধন কাটিয়া বিনয়কে স্বাধীন করিয়া দিতে পারিলে সে যেন বাঁচে এমনি হইয়া উঠিয়াছে।

ললিতা তাহার বেণী দুলাইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল—কেন মশায়, অভিনয়ে দোষটা কি ?

বিনয় কহিল—অভিনয়ে দোষ না থাকৃতে পারে কিন্তু ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়িতে অভিনয় কর্ত্তে যাওয়া আমার মনে ভাল লাগ্‌চে না।

ললিতা। আপনি নিজের মনের কথা বল্‌চেন, না আর কারো ?

বিনয়। অন্যের মনের কথা বলবার ভার আমার উপরে নেই—বলাও শক্ত। আপনি হয় ত বিশ্বাস করেন না, আমি নিজের মনের কথাটাই বলে থাকি—কখনো নিজের জবানীতে, কখনো বা অন্যের জবানীতে।

ললিতা একথার কোনো জবাব না দিয়া একটুখানি মুচ্‌কিয়া হাসিল

মাত্র। একটু পরে কহিল—আপনার বন্ধু গৌরবাবু বোধ হয় মনে করেন ম্যাজিষ্ট্রের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলেই খুব একটা বীরত্ব হয়—ওতেই ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করার ফল হয়।

বিনয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিল, আমার বন্ধু হয় ত না মনে করতে পারেন কিন্তু আমি মনে করি। লড়াই নয় ত কি! যে লোক আমাকে গ্রাহ্যই করে না, মনে করে আমাকে কড়ে' আঙুল তুলে ইসারায় ডাক্ দিলেই আমি কৃতার্থ হয়ে যাব তার সেই উপেক্ষার সঙ্গে উপেক্ষা দিয়েই যদি লড়াই না করি তা হলে আত্মসম্মানকে বাঁচাব কি করে?

ললিতা নিজে অভিমানী স্বভাবের লোক—বিনয়ের মুখের এই অভিমানবাক্য তাহার ভালই লাগিল। কিন্তু সেই জন্যই তাহার নিজের পক্ষের যুক্তিকে দুর্ব্বল অনুভব করিয়াই ললিতা অকারণ বিদ্রূপের খোঁচায় বিনয়কে কথায় কথায় আহত করিতে লাগিল।

শেষকালে বিনয় কহিল—দেখুন্ আপনি তর্ক করচেন কেন? আপনি বলুন্ না কেন 'আমার ইচ্ছা, আপনি অভিনয়ে যোগ দেন।' তা হলে আমি আপনার অনুরোধ রক্ষার খাতিরে নিজের মতটাকে বিসর্জ্জন দিয়ে একটা সুখ পাই।

ললিতা কহিল—বাঃ, তা আমি কেন বল্‌ব? সত্যি যদি আপনার কোনো মত থাকে তাহলে সেটা আমার অনুরোধে কেন ত্যাগ করতে যাবেন? কিন্তু সেটা সত্যি হওয়া চাই।

বিনয় কহিল—আচ্ছা সেই কথাই ভাল। আমার সত্যিকার কোনো মত নেই। আপনার অনুরোধে নাই হল, আপনার তর্কেই পরাস্ত হয়ে আমি অভিনয়ে যোগ দিতে রাজি হলুম।

এমন সময় বরদাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই বিনয় উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে কহিল—অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হলে আমাকে কি করতে হবে বলে দেবেন।

বরদাসুন্দরী সগর্ব্বে কহিলেন—সে জন্য আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না, আমরা আপনাকে ঠিক তৈরি করে নিতে পারব। কেবল অভ্যাসের জন্য রোজ আপনাকে নিয়মিত আস্‌তে হবে।

বিনয় কহিল—আচ্ছা। আজ তবে আসি।

বরদাসুন্দরী কহিলেন—সে কি কথা? আপনাকে খেয়ে যেতে হচ্চে।

বিনয় কহিল—আজ নাই খেলুম।

বরদাসুন্দরী কহিলেন—না, না, সে হবে না।

বিনয় খাইল, কিন্তু অন্য দিনের মত তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ছিল না। আজ সুচরিতাও কেমন অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া ছিল! যখন ললিতার সঙ্গে বিনয়ের লড়াই চলিতেছিল তখন সে বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। আজ রাত্রে কথাবার্ত্তা আর জমিল না।

বিদায়ের সময় বিনয় ললিতার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করিয়া কহিল—আমি হার মান্‌লুম তবু আপনাকে খুসি করতে পারলুম না।

ললিতা কোনো জবাব না দিয়া চলিয়া গেল।

ললিতা সহজে কাঁদিতে জানেনা কিন্তু আজ তাহার চোখ দিয়া জল যেন ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিল। কি হইয়াছে? কেন সে বিনয় বাবুকে বার বার এমন করিয়া খোঁচা দিতেছে এবং নিজে ব্যথা পাইতেছে?

বিনয় যতক্ষণ অভিনয়ে যোগ দিতে নারাজ ছিল ললিতার জেদও ততক্ষণ কেবলি চড়িয়া উঠিতেছিল কিন্তু যখনি সে রাজি হইল তখনি তাহার সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। যোগ না দিবার পক্ষে যতগুলি তর্ক, সমস্ত তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন তাহার মন পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিল কেবল আমার অনুরোধ রাখিবার জন্য বিনয় বাবুর এমন করিয়া রাজি হওয়া উচিত হয় নাই। অনুরোধ! কেন অনুরোধ রাখিবেন। তিনি মনে করেন, অনুরোধ রাখিয়া তিনি আমার সঙ্গে

ভদ্রতা করিতেছেন! তাঁহার এই ভদ্রতাটুকু পাইবার জন্য আমার যেন অত্যন্ত মাথাব্যথা!

কিন্তু এখন অমন করিয়া স্পর্দ্ধা করিলে চলিবে কেন? সত্যই যে সে বিনয়কে অভিনয়ের দলে টানিবার জন্য এতদিন ক্রমাগত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছে! আজ বিনয় ভদ্রতার দায়ে তাহার এত জেদের অনুরোধ রাখিয়াছে বলিয়া রাগ করিলেই বা চলিবে কেন? এই ঘটনায় ললিতার নিজের উপরে এমনি তীব্র ঘৃণা ও লজ্জা উপস্থিত হইল যে স্বভাবত এতটা হইবার কোনো কারণ ছিল না। অন্যদিন হইলে তাহার মনের চাঞ্চল্যের সময় সে সুচরিতার কাছে যাইত। আজ গেল না এবং কেন যে তাহার বুকটাকে ঠেলিয়া তুলিয়া তাহার চোখ দিয়া এমন করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না।

পরদিন সকালে সুধীর লাবণ্যকে একটি তোড়া আনিয়া দিয়াছিল। সেই তোড়ায় একটি বোঁটায় দুইটি বিকচোন্মুখ বসোরা গোলাপ ছিল। ললিতা সেটি তোড়া হইতে খুলিয়া লইল। লাবণ্য কহিল—ও কি করচিস্? ললিতা কহিল, তোড়ায় অনেক গুলো বাজে ফুল-পাতার মধ্যে ভালো ফুলকে বাঁধা দেখলে আমার কষ্ট হয়; ওরকম দড়ি দিয়ে সব জিনিষকে এক শ্রেণীতে জোর করে বাঁধা বর্ব্বরতা।

এই বলিয়া সমস্ত ফুলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ললিতা সে গুলিকে ঘরের এদিকে ওদিকে পৃথক্ করিয়া সাজাইল; কেবল গোলাপ দুটিকে হাতে করিয়া লইয়া গেল।

সতীশ ছুটিয়া আসিয়া কহিল, দিদি ফুল কোথায় পেলে?

ললিতা তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, আজ তোর বন্ধুর বাড়িতে যাবি নে।

বিনয়ের কথা এতক্ষণ সতীশের মনে ছিল না, কিন্তু তাহার উল্লেখ-

মাত্রেই লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—হাঁ যাব! বলিয়া তখনি যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল।

ললিতা তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে গিয়ে কি করিস্?

সতীশ সংক্ষেপে কহিল, গল্প করি।

ললিতা কহিল, তিনি তোকে এত ছবি দেন্ তুই তাঁকে কিছু দিস্‌নে কেন?

বিনয় ইংরেজি কাগজ প্রভৃতি হইতে সতীশের জন্য নানাপ্রকার ছবি কাটিয়া রাখিত। একটা খাতা করিয়া সতীশ এই ছবিগুলি তাহাতে গঁদ দিয়া আঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইরূপে পাতা পূরাইবার জন্য তাহার নেশা এতই চড়িয়া গিয়াছে যে ভাল বই দেখিলেও তাহা হইতে ছবি কাটিয়া লইবার জন্য তাহার মন ছটফট করিত। এই লোলুপতার অপরাধে তাহার দিদিদের কাছে তাহাকে বিস্তর তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছে।

সংসারে প্রতিদান বলিয়া যে একটা দায় আছে সে কথাটা হঠাৎ আজ সতীশের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে সে বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভাঙা টিনের বাক্সটির মধ্যে তাহার নিজের বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার কোনোটারই আসক্তি বন্ধন ছেদন করা তাহার পক্ষে সহজ নহে। সতীশের উদ্বিগ্ন মুখ দেখিয়া ললিতা হাসিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিয়া কহিল—থাক্ থাক্ তোকে আর অত ভাবতে হবে না। আচ্ছা এই গোলাপ ফুল দুটো তাঁকে দিস্।

এত সহজে সমস্যার মীমাংসা হইল দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং ফুল দুটি লইয়া তখনি সে তাহার বন্ধুঋণ শোধ করিবার জন্য চলিল।

রাস্তায় বিনয়ের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। বিনয় বাবু বিনয় বাবু করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে ডাক দিয়া সতীশ তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জামার মধ্যে ফুল লুকাইয়া কহিল, আপনার জন্যে কি এনেছি বলুন দেখি।

বিনয়কে হার মানাইয়া গোলাপ ফুল দুইটি বাহির করিল। বিনয় কহিল বাঃ কি চমৎকার! কিন্তু সতীশ বাবু এটিত তোমার নিজের জিনিষ নয়। চোরাই মাল নিয়ে শেষকালে পুলিশের হাতে পড়বনা ত?

এই ফুল দুটিকে ঠিক নিজের জিনিষ বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে সতীশের হঠাৎ ধোঁকা লাগিল। সে একটু ভাবিয়া কহিল—না, বাঃ, ললিতা দিদি আমাকে দিলেন যে আপনাকে দিতে।

এ কথাটার এই খানেই নিষ্পত্তি হইল, এবং বিকালে তাহাদের বাড়ি যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া বিনয় সতীশকে বিদায় দিল।

কাল রাত্রে ললিতার কথার খোঁচা খাইয়া বিনয় তাহার বেদনা ভুলিতে পারিতেছিল না। বিনয়ের সঙ্গে কাহারও প্রায় বিরোধ হয় না। সেই জন্য এই প্রকার তীব্র আঘাত সে কাহারো কাছে প্রত্যাশাই করে না। ইতিপূর্ব্বে ললিতাকে বিনয় সুচরিতার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী করিয়াই দেখিয়াছিল। কিন্তু অঙ্কুশাহত হাতী যেমন তাহার মাহুতকে ভুলিবার সময় পায় না, কিছু দিন হইতে ললিতা সম্বন্ধে বিনয়ের সেই দশা হইয়াছিল। কি করিয়া ললিতাকে একটু খানি প্রসন্ন করিবে এবং শান্তি পাইবে বিনয়ের এই চিন্তাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়া ললিতার তীব্রহাস্যদিগ্ধ জ্বালাময় কথাগুলি একটার পর একটা কেবলি তাহার মনে বাজিয়া উঠিত এবং তাহার নিদ্রা দূর করিয়া রাখিত। আমি গোরার ছায়ার মত, আমার নিজের কোনো পদার্থ নাই, ললিতা এই বলিয়া অবজ্ঞা করেন, কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য। ইহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার যুক্তি সে মনের মধ্যে জড় করিয়া তুলিত। কিন্তু এ সমস্ত যুক্তি তাহার কোনো কাজে লাগিত না। কারণ ললিতা ত স্পষ্ট করিয়া এ অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে আনে নাই—এ কথা লইয়া তর্ক করিবার অবকাশ তাহাকে দেয় নাই। বিনয়ের জবাব দিবার এত কথা ছিল তবু সেগুলা ব্যবহার করিতে না পারিয়া তাহার মনে ক্ষোভ আরো

বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে কাল রাত্রে হারিয়াও যখন ললিতার মুখ সে প্রসন্ন দেখিল না তখন বাড়িতে আসিয়া সে নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি আমি এতই অবজ্ঞার পাত্র ?

এই জন্যই সতীশের কাছে যখন সে শুনিল যে ললিতাই তাহাকে গোলাপফুল দুটি সতীশের হাত দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে তখন সে অত্যন্ত একটা উল্লাস বোধ করিল। সে ভাবিল, অভিনয়ে যোগ দিতে রাজি হওয়াতেই সন্ধির নিদর্শনস্বরূপ ললিতা তাহাকে খুসি হইয়া এই গোলাপ দুটি দিয়াছে। প্রথমে মনে করিল ফুল দুটি বাড়িতে রাখিয়া আসি, তাহার পরে ভাবিল—না, এই শান্তির ফুল মায়ের পায়ে দিয়া ইহাকে পবিত্র করিয়া আনি।

সে দিন বিকালে বিনয় যখন পরেশ বাবুর বাড়িতে গেল তখন সতীশ ললিতার কাছে তাহার ইস্কুলের পড়া বলিয়া লইতেছে। বিনয় ললিতাকে কহিল—যুদ্ধেরই রং লাল, অতএব সন্ধির ফুল শাদা হওয়া উচিত ছিল।

ললিতা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল। বিনয় তখন একটি গুচ্ছ শ্বেত করবী চাদরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ললিতার সম্মুখে ধরিয়া কহিল—আপনার ফুল দুটি যতই সুন্দর হোক্—তবু তাতে ক্রোধের রংটুকু আছে; আমার এ ফুল সৌন্দর্য্যে তার কাছে দাঁড়াতে পারে না কিন্তু শান্তির শুভ্র রঙে নম্রতা স্বীকার করে আপনার কাছে হাজির হয়েছে।

ললিতা কর্ণমূল রাঙা করিয়া কহিল, আমার ফুল আপনি কাকে বল্‌চেন ?

বিনয় কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল—তবে ত ভুল বুঝেছি। সতীশ বাবু, কার ফুল কাকে দিলে ?

সতীশ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—বাঃ, ললিতা দিদি যে দিতে বল্লে !

বিনয়। কাকে দিতে বল্লেন্‌ ?

সতীশ। আপনাকে।

ললিতা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া সতীশের পিঠে এক চাপড় মারিয়া কহিল—তোর মত বোকা ত আমি দেখিনি! বিনয়বাবুর ছবির বদলে তুই তাঁকে ফুল দিতে চাইলি নে ?

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া কহিল—হাঁ, তাইত, কিন্তু তুমিই আমাকে দিতে বল্লে না ?

সতীশের সঙ্গে তক্‌রার করিতে গিয়া ললিতা আরো বেশি করিয়া জালে জড়াইয়া পড়িল। বিনয় স্পষ্ট বুঝিল ফুল দুটি ললিতাই দিয়াছে, কিন্তু বেনামীতেই কাজ করা তাহার অভিপ্রায় ছিল। বিনয় কহিল, আপনার ফুলের দাবী আমি ছেড়েই দিচ্ছি—কিন্তু তাই বলে আমার এই ফুলের মধ্যে ভুল কিছুই নেই। আমাদের বিবাদ নিষ্পত্তির শুভ উপলক্ষে এই ফুল কয়টি—

ললিতা মাথা নাড়িয়া কহিল,—আমাদের বিবাদই বা কি, আর তার নিষ্পত্তিইবা কিসের ?

বিনয় কহিল—একেবারে আগাগোড়া সমস্তই মায়া? বিবাদও ভুল, ফুলও তাই, নিষ্পত্তিও মিথ্যা? শুধু শুক্তিতে রজত ভ্রম নয় শুক্তিটা শুদ্ধই ভ্রম? ঐ যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে অভিনয়ের একটা কথা হচ্ছিল সেটা—

ললিতা কহিল,—সেটা ভ্রম নয়। কিন্তু তা নিয়ে ঝগড়া কিসের? আপনি কেন মনে করচেন আপনাকে এইটেতে রাজি করবার জন্যে আমি মস্ত একটা লড়াই বাধিয়ে দিয়েছি—আপনি সম্মত হওয়াতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। আপনার কাছে অভিনয় করাটা যদি অন্যায় বোধ হয় কারো কথা শুনে কেনইবা তাতে রাজি হবেন ?

এই বলিয়া ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সমস্তই উল্টা

ব্যাপার হইল। আজ ললিতা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে বিনয়ের কাছে নিজের হার স্বীকার করিবে এবং যাহাতে অভিনয়ে বিনয় যোগ না দেয় তাহাকে সেইরূপ অনুরোধ করিবে। কিন্তু এমন করিয়া কথাটা উঠিল এবং এমন ভাবে তাহার পরিণতি হইল যে, ফল ঠিক উল্টা দাঁড়াইল। বিনয় মনে করিল, সে যে অভিনয় সম্বন্ধে এতদিন বিরুদ্ধতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহারই প্রতিঘাতের উত্তেজনা এখনো ললিতার মনে রহিয়া গেছে। বিনয় যে কেবল বাহিরে হার মানিয়াছে—কিন্তু মনের মধ্যে তাহার বিরোধ রহিয়াছে এই জন্য ললিতার ক্ষোভ দূর হইতেছে না। ললিতা এই ব্যাপারটাতে যে এতটা আঘাত পাইয়াছে ইহাতে বিনয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে স্থির করিল এই কথাটা লইয়া সে আর কোনো আলোচনা উপহাসচ্ছলেও করিবে না—এবং এমন নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এই কাজটাকে সম্পন্ন করিয়া তুলিবে যে কেহ তাহার প্রতি ঔদাসীন্যের অপরাধ আরোপ করিতে পারিবে না।

সুচরিতা আজ প্রাতঃকাল হইতে নিজের শোবার ঘরে নিভৃতে বসিয়া খ্রীষ্টের অনুকরণ নামক একটি ইংরেজি ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। আজ সে তাহার অন্যান্য নিয়মিত কর্ম্মে যোগ দেয় নাই। মাঝে মাঝে গ্রন্থ হইতে মন ভ্রষ্ট হইয়া পড়াতে বইয়ের লেখাগুলি তাহার কাছে ছায়া হইয়া পড়িতেছিল—আবার পরক্ষণে নিজের উপর রাগ করিয়া বিশেষ বেগের সহিত চিত্তকে গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ করিতেছিল—কোনো মতেই হার মানিতে চাহিতেছিল না।

এক সময়ে দূর হইতে কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে হইল বিনয়বাবু আসিয়াছেন ;—তখনি চমকিয়া উঠিয়া বই রাখিয়া বাহিরের ঘরে যাইবার জন্য মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজের এই ব্যস্ততাতে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সুচরিতা আবার চৌকির উপর বসিয়া বই লইয়া পড়িল। পাছে কানে শব্দ যায় বলিয়া দুই কান চাপিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক দিন এমন হইয়াছে বিনয় আগে আসিয়াছে, গোরা তাহার পরে আসিয়াছে—আজও সেইরূপ ঘটিতে পারে ইহাই মনে করিয়া সুচরিতা যেন এক প্রকার সচকিত অবস্থায় রহিল। গোরা পাছে আসিয়া পড়ে এই তাহার একটা ভয় ছিল এবং পাছে না আসে এই আশঙ্কাও তাহাকে বেদনা দিতেছিল।

বিনয়ের সঙ্গে ছাড়া-ছাড়া ভাবে দুই চারটে কথা হওয়ার পর সুচরিতা আর কোনো উপায় না দেখিয়া সতীশের ছবির খাতা খানা লইয়া সতীশের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ছবি সাজাইবার ত্রুটি ধরিয়া নিন্দা করিয়া সতীশকে রাগাইয়া তুলিল। সতীশ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাদানুবাদ করিতে লাগিল। আর বিনয় টেবিলের উপর তাহার প্রত্যাখ্যাত করবীগুচ্ছের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও আমার এই ফুল কয়টা ললিতার লওয়া উচিত ছিল।

হঠাৎ একটা পায়ের শব্দে চমকিয়া সুচরিতা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল হারানবাবু ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। তাহার চমকটা অত্যন্ত সুগোচর হওয়াতে সুচরিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। হারানবাবু একটা চৌকিতে বসিয়া কহিলেন—কই, আপনাদের গৌরবাবু আসেন নি?

বিনয় হারানবাবুর এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া কহিল—কেন, তাঁকে কোনো প্রয়োজন আছে?

হারানবাবু কহিলেন—আপনি আছেন অথচ তিনি নেই এ ত প্রায় দেখা যায় না; তাই জিজ্ঞাসা করচি।

বিনয়ের মনে বড় রাগ হইল—পাছে তাহা প্রকাশ পায় এই জন্য সংক্ষেপে কহিল—তিনি কলকাতায় নেই।

হারান। প্রচারে গেছেন বুঝি?

বিনয়ের রাগ বাড়িয়া উঠিল, কোনো জবাব করিল না। সুচরিতাও কোনো কথা না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। হারানবাবু দ্রুতপদে সুচরিতার অনুবর্ত্তন করিলেন কিন্তু তাহাকে ধরিয়া উঠিতে পারিলেন না। হারানবাবু দূর হইতে কহিলেন, সুচরিতা, একটা কথা আছে।

সুচরিতা কহিল—আজ আমি ভাল নেই।—বলিতে বলিতেই তাহার শয়নগৃহে কপাট পড়িল।

এমন সময় ললিতা তাহার ঘরে আসিল। সুচরিতা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—তোর কি হয়েচে বল্ ত?

ললিতা তীব্র ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—কিছু না!

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় ছিলি?

ললিতা কহিল—বিনয়বাবু এসেচেন, তিনি বোধ হয় তোমার সঙ্গে গল্প করতে চান।

বিনয়বাবুর সঙ্গে আর কেহ আসিয়াছে কি না, এ প্রশ্ন সুচরিতা আজ উচ্চারণ করিতেও পারিল না। যদি আর কেহ আসিত তবে নিশ্চয় ললিতা তাহার উল্লেখ করিত কিন্তু তবু মন নিঃসংশয় হইতে পারিল না। আর সে নিজেকে দমনের চেষ্টা না করিয়া গৃহাগত অতিথির প্রতি কর্ত্তব্যের উপলক্ষে বাহিরের ঘরের দিকে চলিল। ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিল—তুই যাবি নে?

ললিতা একটু অধৈর্য্যের স্বরে কহিল—তুমি যাও না—আমি পরে যাচ্চি।

সুচরিতা বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বিনয় সতীশের সঙ্গে গল্প করিতেছে।

সুচরিতা কহিল—বাবা বেরিয়ে গেছেন, এখনি আস্‌বেন। মা আপনাদের সেই অভিনয়ের কবিতা মুখস্থ করাবার জন্যে লাবণ্য ও লীলাকে নিয়ে মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে গেছেন—ললিতা কোনো মতেই গেল না।

তিনি বলে গেছেন, আপনি এলে আপনাকে বসিয়ে রাখতে—আপনার আজ পরীক্ষা হবে।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—আপনি এর মধ্যে নেই?

সুচরিতা কহিল—সবাই অভিনেতা হলে জগতে দর্শক হবে কে?

বরদাসুন্দরী সুচরিতাকে এ সকল ব্যাপারে যথাসম্ভব বাদ দিয়া চলিতেন। তাই তাহার গুণপনা দেখাইবার জন্য এবারও ডাক পড়ে নাই।

অন্য দিন এই দুই ব্যক্তি একত্র হইলে কথার অভাব হইত না—আজ উভয় পক্ষেই এমন বিঘ্ন ঘটিয়াছে যে কোনো মতেই কথা জমিতে চাহিল না! সুচরিতা গোরার প্রসঙ্গ তুলিবে না পণ করিয়া আসিয়াছিল। বিনয়ও পূর্ব্বের মত সহজে গোরার কথা তুলিতে পারে না। তাহাকে ললিতা এবং হয়ত এ বাড়ির সকলেই গোরার একটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ বলিয়া মনে করে ইহাই কল্পনা করিয়া গোরার কথা তুলিতে সে বাধা পায়।

এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া অভিনয়ের পালা দিবার জন্য যখন বিনয়কে আর একটা ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন তাহার অনতিকাল পরেই অকস্মাৎ ফুলগুলিকে আর সেই টেবিলের উপরে দেখা যায় নাই। সে রাত্রে ললিতাও বরদাসুন্দরীর অভিনয়ের আখড়ায় দেখা দিল না। এবং সুচরিতা খৃষ্টের অনুকরণ বই খানি কোলের উপর মুড়িয়া ঘরের বাতিটাকে এক কোণে আড়াল করিয়া দিয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত দ্বারের বহির্ব্বর্ত্তী অন্ধকার রাত্রির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সম্মুখে যেন একটা কোন্ অপরিচিত অপূর্ব্ব দেশ মরীচিকার মত দেখা দিয়াছিল; জীবনের এতদিনকার সমস্ত জানাশুনার সঙ্গে সেই দেশের একটা কোথায় একান্ত বিচ্ছেদ আছে;—সেইজন্য সেখানকার বাতায়নে যে আলোগুলি জ্বলিতেছে তাহা তিমির নিশীথিনীর নক্ষত্রমালার মত একটা সুদূরতার

রহস্যে মনকে ভীত করিতেছে; অথচ মনে হইতেছে, জীবন আমার তুচ্ছ, এতদিন যাহা নিশ্চয় বলিয়া জানিয়াছি তাহা সংশয়াকীর্ণ এবং প্রত্যহ যাহা করিয়া আসিতেছি তাহা অর্থহীন—ঐখানেই হয়ত জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে, কর্ম্ম মহৎ হইয়া উঠিবে এবং জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারিব। ঐ অপূর্ব্ব অপরিচিত ভয়ঙ্কর দেশের অজ্ঞাত সিংহদ্বারের সম্মুখে কে আমাকে দাঁড় করাইয়া দিল? কেন আমার হৃদয় এমন করিয়া কাঁপিতেছে—কেন আমার পা অগ্রসর হইতে গিয়া এমন করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে?

২৪

সুচরিতা এ কয়দিন বিশেষ করিয়া উপাসনায় মন দিয়াছিল। সে যেন পূর্ব্বের চেয়েও পরেশ বাবুকে বেশি করিয়া আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একদিন পরেশ বাবু তাঁহার ঘরে একলা বসিয়া পড়িতে-ছিলেন এমন সময় সুচরিতা তাঁহার কাছে চুপ করিয়া আসিয়া বসিল। পরেশ বাবু বই টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রাধে!

সুচরিতা কহিল—কিছু না। বলিয়া, তাঁহার টেবিলের উপরে যদিচ বই কাগজ প্রভৃতি গোছানই ছিল তবু সেগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া অন্যরকম করিয়া গুছাইতে লাগিল।

একটু পরে বলিয়া উঠিল,—বাবা, আগে তুমি আমাকে যে রকম পড়াতে এখন সেই রকম করে পড়াও না কেন?

পরেশ বাবু সস্নেহে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন—আমার ছাত্রী যে আমার ইস্কুল থেকে পাস করে বেরিয়ে গেছে! এখন ত তুমি নিজে পড়েই বুঝতে পার।

সুচরিতা কহিল,—না, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি নে, আমি আগের মত তোমার কাছে পড়ব।

পরেশ বাবু কহিলেন,—আচ্ছা বেশ, কাল থেকে পড়াব।

সুচরিতা আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—বাবা, সেদিন বিনয় বাবু জাতিভেদের কথা অনেক বল্লেন, তুমি আমাকে সে সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে বল না কেন?

পরেশবাবু কহিলেন—মা, তুমি ত জানই, তোমরা আপনি ভেবে বুঝতে চেষ্টা করবে, আমার বা আর কারো মত কেবল অভ্যস্ত কথার মতো ব্যবহার করবে না, আমি বরাবর তোমাদের সঙ্গে সেই রকম করেই ব্যবহার করেছি। প্রশ্নটা ঠিকমতো মনে জেগে ওঠবার পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দিতে যাওয়া আর ক্ষুধা পাবার পূর্ব্বেই খাবার খেতে দেওয়া একই—তাতে কেবল অরুচি এবং অপাক হয়। তুমি আমাকে যখনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে আমি যা বুঝি বলব।

সুচরিতা কহিল—আমি তোমাকে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করচি, আমরা জাতিভেদকে নিন্দা করি কেন?

পরেশবাবু কহিলেন—একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়—মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম্ম না বলে কি বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনই পৃথিবীতে বড় হতে পারে না—অন্যের অবজ্ঞা তাদের সইতেই হবে।

সুচরিতা গোরার মুখে শোনা কথার অনুসরণ করিয়া কহিল—এখনকার সমাজে যে বিকার উপস্থিত হয়েচে তাতে অনেক দোষ থাকতে পারে; সে দোষ ত সমাজের সকল জিনিষেই ঢুকেছে, তাই বলে আসল জিনিষটাকে দোষ দেওয়া যায় কি?

পরেশবাবু তাঁহার স্বাভাবিক শান্তস্বরে কহিলেন—আসল জিনিষটা কোথায় আছে জানলে বলতে পারতুম—আমি চোখে দেখতে পাচ্চি

আমাদের দেশে মানুষ মানুষকে অসহ্য ঘৃণা করচে এবং তাতে আমাদের সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্চে, এমন অবস্থায় একটা কাল্পনিক আসল জিনিষের কথা চিন্তা করে মন সান্ত্বনা মানে কই ?

সুচরিতা পুনশ্চ গোরাদের কথার প্রতিধ্বনি স্বরূপে কহিল—আচ্ছা, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখাই ত আমাদের দেশের চরমতত্ত্ব ছিল।

পরেশবাবু কহিলেন—সমদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞানের কথা, হৃদয়ের কথা নয়। সমদৃষ্টির মধ্যে প্রেমও নেই, ঘৃণাও নেই—সমদৃষ্টি রাগদ্বেষের অতীত। মানুষের হৃদয় এমনতর হৃদয়ধর্ম্মবিহীন জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সেই জন্যে আমাদের দেশে এরকম সাম্যতত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও নীচজাতকে দেবালয়ে পর্য্যন্ত প্রবেশ কর্ত্তে দেওয়া হয় না। যদি দেবতার ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে সাম্য না থাকে তবে দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সে তত্ত্ব থাকলেই কি আর না থাকলেই কি ?

সুচরিতা পরেশবাবুর কথা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে কহিল—আচ্ছা বাবা, তুমি বিনয় বাবুদের এ সব কথা বোঝাবার চেষ্টা কর না কেন ?

পরেশবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন—বিনয়বাবুদের বুদ্ধি কম বলে যে এ সব কথা বোঝেন না তা নয়—বরঞ্চ তাঁদের বুদ্ধি বেশি বলেই তাঁরা বুঝতে চান না, কেবল বোঝাতেই চান। তাঁরা যখন ধর্ম্মের দিক থেকে —অর্থাৎ সকলের চেয়ে বড় সত্যের দিক থেকে এসব কথা অন্তরের সঙ্গে বুঝতে চাইবেন তখন তোমার বাবার বুদ্ধির জন্যে তাঁদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে না। এখন তাঁরা অন্য দিক থেকে দেখচেন, এখন আমার কথা তাঁদের কোনো কাজেই লাগবে না।

গোরাদের কথা যদিও সুচরিতা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছিল, তবু তাহা তাহার সংস্কারের সহিত বিবাদ বাধাইয়া তাহার অন্তরের মধ্যে বেদনা দিতেছিল। সে শান্তি পাইতেছিল না। আজ পরেশবাবুর সঙ্গে কথা

কহিয়া সেই বিরোধ হইতে সে ক্ষণকালের জন্য মুক্তিলাভ করিল। গোরা বিনয় বা আর কেহই যে পরেশবাবুর চেয়ে কোনো বিষয়ে ভাল বুঝে এ কথা সুচরিতা কোনো মতেই মনে স্থান দিতে চায় না। পরেশবাবুর সঙ্গে যাহার মতের অনৈক্য হইয়াছে সুচরিতা তাহার উপর রাগ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। সম্প্রতি গোরার সঙ্গে আলাপের পর গোরার কথা একেবারে রাগ বা অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতে-ছিল না বলিয়াই সুচরিতা এমন একটা কষ্ট বোধ করিতেছিল। সেই কারণেই আবার শিশুকালের মত করিয়া পরেশবাবুকে তাঁহার ছায়াটির ন্যায় নিয়ত আশ্রয় করিবার জন্য তাহার হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা উপস্থিত লইয়াছিল। চৌকি হইতে উঠিয়া দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া সুচরিতা পরেশবাবুর পিছনে তাঁহার চৌকির পিঠের উপর হাত রাখিয়া কহিল—বাবা, আজ বিকালে আমাকে নিয়ে উপাসনা কোরো।

পরেশবাবু কহিলেন—আচ্ছা।

তাহার পরে নিজের শোবার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া সুচরিতা গোরার কথাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু গোরার সেই বুদ্ধি ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত মুখ তাহার চোখের সম্মুখে জাগিয়া রহিল—তাহার মনে হইতে লাগিল, গোরার কথা শুধু কথা নহে, সে যেন গোরা স্বয়ং;—সে কথার আকৃতি আছে, গতি আছে, প্রাণ আছে—তাহা বিশ্বাসের বলে এবং স্বদেশপ্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ। তাহা মত নয় যে তাহার প্রতিবাদ করিয়াই চুকাইয়া দেওয়া যাইবে—তাহা যে সম্পূর্ণ মানুষ—এবং সে মানুষ সামান্য মানুষ নহে। তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে যে হাত ওঠে না। অত্যন্ত একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া সুচরিতার কান্না আসিতে লাগিল। কেহ যে তাহাকে এত বড় একটা দ্বিধার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ উদাসীনের মত অনায়াসে দূরে চলিয়া যাইতে

পারে এই কথা মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে চাহিল অথচ কষ্ট পাইতেছে বলিয়াও ধিক্কারের সীমা রহিল না।

২৫

এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে ইংরেজি কবি ড্রাইডেনের রচিত সঙ্গীত-বিষয়ক একটি কবিতা বিনয় ভাবব্যক্তির সহিত আবৃত্তি করিয়া যাইবে এবং মেয়েরা অভিনয়মঞ্চে উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হইয়া কাব্যলিখিত ব্যাপারে মূক অভিনয় করিতে থাকিবে। এ ছাড়া মেয়েরাও ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি এবং গান প্রভৃতি করিবে।

বরদাসুন্দরী বিনয়কে অনেক ভরসা দিয়াছিলেন যে তাহাকে তাঁহারা কোনো প্রকারে তৈরি করিয়া লইবেন। তিনি নিজে ইংরেজি অতি সামান্যই শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দলের দুই এক জন পণ্ডিতের প্রতি তাঁহার নির্ভর ছিল।

কিন্তু যখন আখ্ড়া বসিল, বিনয় তাহার আবৃত্তির দ্বারা বরদাসুন্দরীর পণ্ডিতসমাজকে বিস্মিত করিয়া দিল। তাঁহাদের মণ্ডলীবহির্ভূত এই ব্যক্তিকে গড়িয়া লইবার সুখ হইতে বরদাসুন্দরী বঞ্চিত হইলেন। পূর্ব্বে যাহারা বিনয়কে বিশেষ কেহ বলিয়া খাতির করে নাই, তাহারা, বিনয় এমন ভাল ইংরেজি পড়ে বলিয়া তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এমন কি, হারান বাবুও তাঁহার কাগজে মাঝে মাঝে লিখিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। এবং সুধীর, তাহাদের ছাত্রসভায় মাঝে মাঝে ইংরেজি বক্তৃতা করিবার জন্য বিনয়কে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

ললিতার অবস্থাটা ভারি অদ্ভুত রকম হইল। বিনয়কে যে কোনো সাহায্য কাহাকেও করিতে হইল না, সে জন্য সে খুসিও হইল, আবার তাহাতে তাহার মনের মধ্যে একটা অসন্তোষও জন্মিল। বিনয় যে

তাহাদের কাহারো অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরঞ্চ তাহাদের সকলের চেয়ে ভাল—সে যে মনে মনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিবে এবং তাহাদের নিকট হইতে কোনো প্রকার শিক্ষার প্রত্যাশা করিবে না ইহাতে তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। বিনয়ের সম্বন্ধে সে যে কি চায়, কেমনটা হইলে তাহার মন বেশ সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। মাঝে হইতে তাহার অপ্রসন্নতা কেবলি ছোটখাটো বিষয়ে তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বিনয়কে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বিনয়ের প্রতি ইহা যে সুবিচার নহে এবং শিষ্টতাও নহে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল; বুঝিয়া সে কষ্ট পাইল এবং নিজেকে দমন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিল কিন্তু অকস্মাৎ অতি সামান্য উপলক্ষেই কেন যে তাহার একটা অসঙ্গত অন্তর্জ্জ্বালা সংযমের শাসন লঙ্ঘন করিয়া বাহির হইয়া পড়িত তাহা সে বুঝিতে পারিত না। পূর্ব্বে যে ব্যাপারে যোগ দিবার জন্য সে বিনয়কে অবিশ্রাম উত্তেজিত করিয়াছে এখন তাহা হইতে নিরস্ত করিবার জন্যই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু এখন সমস্ত আয়োজনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া বিনয় অকারণে পলাতক হইবে কি বলিয়া? সময়ও আর অধিক নাই; এবং নিজের একটা নূতন নৈপুণ্য আবিষ্কার করিয়া সে নিজেই এই কাজে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে।

অবশেষে ললিতা বরদাসুন্দরীকে কহিল,—আমি এতে থাকব না।

বরদাসুন্দরী তাঁহার মেঝ মেয়েকে বেশ চিনিতেন, তাই নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন?

ললিতা কহিল—আমি যে পারিনে।

বস্তুত যখন হইতে বিনয়কে আর আনাড়ি বলিয়া গণ্য করিবার উপায় ছিল না, তখন হইতেই ললিতা বিনয়ের সম্মুখে কোনো মতেই আবৃত্তি বা অভিনয় অভ্যাস করিতে চাহিত না—সে বলিত, আমি আপনি

আলাদা অভ্যাস করিব। ইহাতে সকলেরই অভ্যাসে বাধা পড়িত কিন্তু ললিতাকে কিছুতেই পারা গেল না। অবশেষে, হার মানিয়া অভ্যাস-ক্ষেত্রে ললিতাকে বাদ দিয়াই কাজ চালাইতে হইল।

কিন্তু যখন শেষ অবস্থায় ললিতা একেবারেই ভঙ্গ দিতে চাহিল, তখন বরদাসুন্দরীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি জানিতেন যে তাঁহার দ্বারা ইহার প্রতিকার হইতেই পারিবে না। তখন তিনি পরেশবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। পরেশ বাবু সামান্য বিষয়ে কখনোই তাঁহার মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই অনুসারে সে পক্ষেও আয়োজন করিয়াছেন, সময়ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া পরেশবাবু ললিতাকে ডাকিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, ললিতা, এখন তুমি ছেড়ে দিলে যে অন্যায় হবে!

ললিতা রুদ্ধরোদন কণ্ঠে কহিল,—বাবা, আমি যে পারিনে। আমার হয় না।

পরেশ কহিলেন,—তুমি ভাল না পারিলে তোমার অপরাধ হবে না কিন্তু না করলে অন্যায় হবে।

ললিতা মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল;—পরেশ বাবু কহিলেন,—মা, যখন তুমি ভার নিয়েছ তখন তোমাকে ত সম্পন্ন করতেই হবে। পাছে অহংকারে ঘা লাগে বলে আর ত পালাবার সময় নেই। লাগুক্ না ঘা, সেটাকে অগ্রাহ্য করেও তোমাকে কর্ত্তব্য করতে হবে। পারবে না মা?

ললিতা পিতার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল—পারব।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় বিশেষ করিয়া বিনয়ের সম্মুখেই সমস্ত সঙ্কোচ সম্পূর্ণ দূর করিয়া সে যেন একটা অতিরিক্ত বলের সঙ্গে যেন স্পর্দ্ধা করিয়া নিজের কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হইল। বিনয় এতদিন তাহার

আবৃত্তি শোনে নাই। আজ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। এমন সুস্পষ্ট সতেজ উচ্চারণ—কোথাও কিছুমাত্র জড়িমা নাই; এবং ভাব প্রকাশের মধ্যে এমন একটা নিঃসংশয় বল, যে, শুনিয়া বিনয় প্রত্যাশাতীত আনন্দ লাভ করিল। এই কণ্ঠস্বর তাহার কানে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিতে লাগিল।

কবিতা আবৃত্তিতে ভাল আবৃত্তিকারকের সম্বন্ধে শ্রোতার মনে একটা বিশেষ মোহ উৎপন্ন করে। ফুল যেমন গাছের শাখায়, তেমনি কবিতাটিও আবৃত্তিকারকের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে বিশেষ সম্পদ দান করে।

ললিতাও বিনয়ের কাছে কবিতায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ললিতা এতদিন তাহার তীব্রতার দ্বারা বিনয়কে অনবরত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিল। যেখানে ব্যথা সেইখানেই কেবলি যেমন হাত পড়ে, বিনয়ও তেমনি কয়দিন ললিতার উষ্ণ বাক্য এবং তীক্ষ্ণ হাস্য ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারে নাই। কেন যে ললিতা এমন করিল, তেমন বলিল, ইহাই তাহাকে বারম্বার আলোচনা করিতে হইয়াছে ;—ললিতার অসন্তোষের রহস্য যতই সে ভেদ করিতে না পারিয়াছে ততই ললিতার চিন্তা তাহার মনকে অধিকার করিয়াছে। হঠাৎ ভোরের বেলা ঘুম হইতে জাগিয়া সেকথা তাহার মনে পড়িয়াছে, পরেশবাবুর বাড়িতে আসিবার সময় প্রত্যহই তাহার মনে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে আজ না জানি ললিতাকে কিরূপ ভাবে দেখা যাইবে। যে দিন ললিতা লেশমাত্র প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছে সেদিন বিনয় যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে এবং এই ভাবটি কি করিলে স্থায়ী হয় সেই চিন্তাই করিয়াছে কিন্তু এমন কোনো উপায় খুঁজিয়া পায় নাই যাহা তাহার আয়ত্তাধীন।

এ কয়দিনের এই মানসিক আলোড়নের পর ললিতার কাব্য আবৃত্তির মাধুর্য্য বিনয়কে বিশেষ করিয়া এবং প্রবল করিয়া বিচলিত করিল। তাহার এত ভাল লাগিল যে কি বলিয়া প্রশংসা করিবে ভাবিয়া পাইল না।

ললিতার মুখের সামনে ভাল মন্দ কোনো কথাই বলিতে তাহার সাহস হয় না—কেন না তাহাকে ভাল বলিলেই, যে, সে খুসি হইবে মনুষ্য-চরিত্রের এই সাধারণ নিয়ম ললিতার সম্বন্ধে না খাটিতে পারে,—এমন কি, সাধারণ নিয়ম বলিয়াই হয়ত খাটিবে না—এই কারণে, বিনয় উচ্ছ্বসিত হৃদয় লইয়া বরদাসুন্দরীর নিকট ললিতার ক্ষমতার অজস্র প্রশংসা করিল। ইহাতে বিনয়ের বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রতি বরদাসুন্দরীর শ্রদ্ধা আরও দৃঢ় হইল।

আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। ললিতা যখনি নিজে অনুভব করিল তাহার আবৃত্তি ও অভিনয় অনিন্দনীয় হইয়াছে, সুগঠিত নৌকা ঢেউয়ের উপর দিয়া যেমন করিয়া চলিয়া যায় সেও যখন তেমনি সুন্দর করিয়া তাহার কর্ত্তব্যের দুরূহতার উপর দিয়া চলিয়া গেল তখন হইতে বিনয়ের সম্বন্ধে তাহার তীব্রতাও দূর হইল। বিনয়কে বিমুখ করিবার জন্য তাহার চেষ্টামাত্র রহিল না। এই কাজটাতে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল এবং রিহার্সাল ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে তাহার যোগ ঘনিষ্ঠ হইল। এমন কি, আবৃত্তি অথবা অন্য কিছু সম্বন্ধে বিনয়ের কাছে উপদেশ লইতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি রহিল না।

ললিতার এই পরিবর্ত্তনে বিনয়ের বুকের উপর হইতে যেন একটা পাথরের বোঝা নামিয়া গেল। এত আনন্দ হইল যে তখন আনন্দময়ীর কাছে গিয়া বালকের মত ছেলেমানুষি করিতে লাগিল। সুচরিতার কাছে বসিয়া অনেক কথা বকিবার জন্য তাহার মনে কথা জমিতে থাকিল, কিন্তু আজকাল সুচরিতার সঙ্গে তাহার দেখাই হয় না। সুযোগ পাইলেই ললিতার সঙ্গে আলাপ করিতে বসিত কিন্তু ললিতার কাছে তাহাকে বিশেষ সাবধান হইয়াই কথা বলিতে হইত ;—ললিতা যে মনে মনে তাহাকে এবং তাহার সকল কথাকে তীক্ষ্ণভাবে বিচার করে ইহা জানিত বলিয়া ললিতার সম্মুখে তাহার কথার স্রোতে স্বাভাবিক বেগ থাকিত না।

ললিতা মাঝে মাঝে তাহাকে বলিত—আপনি যেন বই পড়ে এসে কথা বলচেন এমন করে বলেন কেন ?

বিনয় উত্তর করিত— আমি যে এত বয়স পর্য্যন্ত কেবল বই পড়েই এসেছি, সেই জন্য মনটা ছাপার বইয়ের মত হয়ে গেছে।

ললিতা বলিত—আপনি খুব ভাল করে বলবার চেষ্টা করবেন না—নিজের কথাটা ঠিক করে বলে যাবেন। আপনি এমন চমৎকার করে বলেন যে, আমার সন্দেহ হয় আপনি আর কারো কথা ভেবে সাজিয়ে বলচেন।

এই কারণে, স্বাভাবিক ক্ষমতাবশত একটা কথা বেশ সুসজ্জিত হইয়া বিনয়ের মনে আসিলে ললিতাকে বলিবার সময় চেষ্টা করিয়া বিনয়কে তাহা শাদা. করিয়া এবং স্বল্প করিয়া বলিতে হইত। কোনো একটা অলঙ্কৃত বাক্য তাহার মুখে হঠাৎ আসিলে সে লজ্জিত হইয়া পড়িত।

ললিতার মনের ভিতর হইতে একটা যেন অকারণ মেঘ কাটিয়া গিয়া তাহার হৃদয় উজ্জল হইয়া উঠিল। বরদাসুন্দরীও তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে এখন পূর্ব্বের ন্যায় কথায় কথায় আপত্তি প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া বসে না—সকল কাজে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয়। আগামী অভিনয়ের সাজসজ্জা ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাহার মনে প্রত্যহ নানাপ্রকার নূতন নূতন কল্পনার উদয় হইতে লাগিল, তাহাই লইয়া সে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল। এ সম্বন্ধে বরদাসুন্দরীর উৎসাহ যতই বেশি হউক তিনি খরচের কথাটাও ভাবেন—সেইজন্য, ললিতা যখন অভিনয় ব্যাপারে বিমুখ ছিল তখনও যেমন তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ ঘটিয়াছিল এখন তাহার উৎসাহিত অবস্থাতেও তেমনি তাঁহার সঙ্কট উপস্থিত হইল। কিন্তু ললিতার উত্তেজিত কল্পনাবৃত্তিকে আঘাত করিতেও সাহস হয় না—যে কাজে সে উৎসাহ বোধ করে সে কাজের কোথাও লেশমাত্র অসম্পূর্ণতা ঘটিলে সে একেবারে দমিয়া যায়, তাহাতে যোগ দেওয়াই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

ললিতা তাহার মনের এই উচ্ছ্বসিত অবস্থায় সুচরিতার কাছে অনেকবার ব্যগ্র হইয়া গিয়াছে। সুচরিতা হাসিয়াছে, কথা কহিয়াছে বটে কিন্তু ললিতা তাহার মধ্যে বারম্বার এমন একটা বাধা অনুভব করিয়াছে যে মনে মনে রাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

একদিন সে পরেশবাবুর কাছে গিয়া কহিল, বাবা, সুচি দিদি যে কোণে বসে বসে বই পড়বে, আর আমরা অভিনয় করতে যাব সে হবে না। ওকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

পরেশ বাবুও কয়দিন ভাবিতেছিলেন সুচরিতা তাহার সঙ্গিনীদের নিকট হইতে কেমন যেন দূরবর্ত্তিনী হইয়া পড়িতেছে। এরূপ অবস্থা তাহার চরিত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন। ললিতার কথা শুনিয়া আজ তাঁহার মনে হইল, আমোদপ্রমোদে সকলের সঙ্গে যোগ দিতে না পারিলে সুচরিতার এইরূপ পার্থক্যের ভাব প্রশ্রয় পাইয়া উঠিবে। পরেশ বাবু ললিতাকে কহিলেন—তোমার মাকে বল গে।

ললিতা কহিল,—মাকে আমি বলব, কিন্তু সুচি দিদিকে রাজি করবার ভার তোমাকে নিতে হবে।

পরেশ বাবু যখন বলিলেন তখন সুচরিতা আর আপত্তি করিতে পারিল না—সে আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হইল।

সুচরিতা কোণ্ হইতে বাহির হইয়া আসিতেই বিনয় তাহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু এই কয়দিন কি একটা হইয়াছে, ভাল করিয়া সুচরিতার যেন নাগাল পাইল না। তাহার মুখশ্রীতে, তাহার দৃষ্টিপাতে এমন একটা সুদূরত্ব প্রকাশ পাইতেছে যে তাহার কাছে অগ্রসর হইতে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেও মেলামেশা ও কাজকর্ম্মের মধ্যে সুচরিতার একটা নির্লিপ্ততা ছিল এখন সেইটে অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সে যে অভিনয় কার্য্যের অভ্যাসে যোগ দিয়াছিল

তাহার মধ্যেও তাহার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নাই। কাজের জন্য তাহাকে যতটুকু দরকার সেইটুকু সারিয়াই সে চলিয়া যাইত। এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে সুচরিতা বিনয়ের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গেল।

এবারে কয়দিন গোরা উপস্থিত না থাকাতে বিনয় অত্যন্ত অবাধে পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে সকল রকম করিয়া মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল। বিনয়ের স্বভাব এইরূপ অবারিতভাবে প্রকাশ পাওয়াতে পরেশবাবুর বাড়ির সকলেই একটা বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিল। বিনয়ও নিজের এইরূপ বাধামুক্ত স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দ পাইল এমন আর কখনো পায় নাই। তাহাকে যে ইঁহাদের সকলেরই ভাল লাগিতেছে ইহাই অনুভব করিয়া তাহার ভাল লাগাইবার শক্তি আরো বাড়িয়া উঠিল।

প্রকৃতির এই প্রসারণের সময়ে, নিজেকে স্বতন্ত্র শক্তিতে অনুভব করিবার দিনে বিনয়ের কাছ হইতে সুচরিতা দূরে চলিয়া গেল। এই ক্ষতি এই আঘাত অন্য সময় হইলে দুঃসহ হইত, কিন্তু এখন সেটা সে সহজেই উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আশ্চর্য্য এই যে, ললিতাও সুচরিতার ভাবান্তর উপলক্ষ করিয়া তাহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অভিমান প্রকাশ করে নাই। আবৃত্তি ও অভিনয়ের উৎসাহই কি তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল?

এদিকে সুচরিতাকে অভিনয়ে যোগ দিতে দেখিয়া হঠাৎ হারান বাবুও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্যারাডাইস্ লষ্ট হইতে এক অংশ আবৃত্তি করিবেন এবং ড্রাইডেনের কাব্য আবৃত্তির ভূমিকাস্বরূপে সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিবেন বলিয়া স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে বরদাসুন্দরী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, ললিতাও সন্তুষ্ট হইল না। হারানবাবু নিজে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিয়া এই প্রস্তাব পূর্ব্বেই পাকা করিয়া আসিয়াছিলেন। ললিতা যখন বলিল ব্যাপারটাকে এত সুদীর্ঘ করিয়া তুলিতে ম্যাজিষ্ট্রেট হয় ত আপত্তি

করিবেন তখন হারান বাবু পকেট হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক পত্র বাহির করিয়া ললিতার হাতে দিয়া তাহাকে নিরুত্তর করিয়া দিলেন।

গোরা বিনা কাজে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে কবে ফিরিবে তাহা কেহ জানিত না। যদিও সুচরিতা এ সম্বন্ধে কোনো কথা মনে স্থান দিবে না ভাবিয়াছিল তবু প্রতিদিনই তাহার মনের ভিতরে আশা জন্মিত যে আজ হয়ত গোরা আসিবে। এ আশা কিছুতেই সে মন হইতে দমন করিতে পারিত না। গোরার ঔদাসীন্য এবং নিজের মনের এই অবাধ্যতায় যখন সে নিরতিশয় পীড়া বোধ করিতেছিল, যখন কোনো মতে এই জাল ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিবার জন্য তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল এমন সময় হারান বাবু একদিন বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের নাম করিয়া সুচরিতার সহিত তাহার সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য পরেশ বাবুকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন। পরেশ বাবু কহিলেন—এখনো ত বিবাহের বিলম্ব আছে এত শীঘ্র আবদ্ধ হওয়া কি ভাল?

হারান বাবু কহিলেন—বিবাহের পূর্ব্বে কিছুকাল এই আবদ্ধ অবস্থায় যাপন করা উভয়ের মনের পরিণতির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক বলে মনে করি। প্রথম পরিচয় এবং বিবাহের মাঝখানে এই রকম একটা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, যাতে সাংসারিক দায়িত্ব নেই অথচ বন্ধন আছে—এটা বিশেষ উপকারী।

পরেশবাবু কহিলেন—আচ্ছা, সুচরিতাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

হারান বাবু কহিলেন—তিনি ত পূর্ব্বেই মত দিয়েছেন।

হারান বাবুর প্রতি সুচরিতার মনের ভাব সম্বন্ধে পরেশ বাবুর এখনো সন্দেহ ছিল তাই তিনি নিজে সুচরিতাকে ডাকিয়া তাহার নিকট হারান বাবুর প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সুচরিতা নিজের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনকে একটা কোথাও চূড়ান্ত ভাবে সমর্পণ করিতে পারিলে বাঁচে—তাই সে এমন অবিলম্বে এবং নিশ্চিন্ত ভাবে সম্মতি দিল যে পরেশ বাবুর

সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য কি না তাহা তিনি ভালরূপ বিবেচনা করিবার জন্য সুচরিতাকে অনুরোধ করিলেন—তৎসত্ত্বেও সুচরিতা এ প্রস্তাবে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না।

ব্রাউন্‌লো সাহেবের নিমন্ত্রণ সারিয়া আসিয়া একটি বিশেষ দিনে সকলকে ডাকিয়া ভাবী দম্পতীর সম্বন্ধ পাকা করা হইবে এইরূপ স্থির হইল।

সুচরিতার ক্ষণকালের জন্য মনে হইল তাহার মন যেন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে। সে মনে মনে স্থির করিল, হারান বাবুকে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কাজে যোগ দিবার জন্য সে মনকে কঠোরভাবে প্রস্তুত করিবে। হারান বাবুর নিকট হইতেই সে প্রত্যহ খানিকটা করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরেজি বই পড়িয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ মত চলিতে থাকিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিল। তাহার পক্ষে যাহা দুরূহ, এমন কি অপ্রিয়, তাহাই গ্রহণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সে মনের মধ্যে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিল।

হারান বাবুর সম্পাদিত ইংরেজি কাগজ কিছুকাল ধরিয়া সে পড়ে নাই। আজ সেই কাগজ ছাপা হইবামাত্র তাহা হাতে আসিয়া পড়িল। বোধ করি হারান বাবু বিশেষ করিয়াই পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সুচরিতা কাগজখানি ঘরে লইয়া গিয়া স্থির হইয়া বসিয়া পরম কর্ত্তব্যের মত তাহার প্রথম লাইন হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল। শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে নিজেকে ছাত্রীর মত জ্ঞান করিয়া এই পত্রিকা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

জাহাজ পালে চলিতে চলিতে হঠাৎ পাহাড়ে ঠেকিয়া কাৎ হইয়া পড়িল। এই সংখ্যায় সেকেলে-বায়ুগ্রস্ত নামক একটি প্রবন্ধ আছে, তাহাতে, বর্ত্তমান কালের মধ্যে বাস করিয়াও যাহারা সেকালের দিকে মুখ

ফিরাইয়া আছে তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে। যুক্তিগুলি যে অসঙ্গত তাহা নহে, বস্তুত এরূপ যুক্তি সুচরিতা সন্ধান করিতেছিল কিন্তু প্রবন্ধটি পড়িবামাত্রই সে বুঝিতে পারিল যে এই আক্রমণের লক্ষ্য গোরা। অথচ তাহার নাম নাই, অথবা তাহার লিখিত কোনো প্রবন্ধের উল্লেখ নাই। বন্দুকের প্রত্যেক গুলির দ্বারা একটা করিয়া মানুষ মারিয়া সৈনিক যেমন খুসি হয় এই প্রবন্ধের প্রত্যেক বাক্যে তেমনি কোনো একটি সজীব পদার্থ বিদ্ধ হইতেছে বলিয়া যেন একটা হিংসার আনন্দ ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রবন্ধ সুচরিতার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহার প্রত্যেক যুক্তি প্রতিবাদের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে তাহার ইচ্ছা হইল। সে মনে মনে কহিল গৌরমোহন বাবু যদি ইচ্ছা করেন তবে এই প্রবন্ধকে তিনি ধূলায় লুটাইয়া দিতে পারেন। গোরার উজ্জ্বল মুখ তাহার চোখের সাম্‌নে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া জাগিয়া উঠিল এবং তাহার প্রবল কণ্ঠস্বর সুচরিতার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই মুখের ও বাক্যের অসামান্যতার কাছে এই প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকের ক্ষুদ্রতা এমনই তুচ্ছ হইয়া উঠিল যে সুচরিতা কাগজখানাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

অনেক কাল পরে সুচরিতা আপনি সে দিন বিনয়ের কাছে আসিয়া বসিল এবং তাহাকে কথায় কথায় বলিল—আচ্ছা, আপনি যে বলেছিলেন যে সব কাগজে আপনাদের লেখা বেরিয়েছে আমাকে পড়তে এনে দেবেন, কই দিলেন না?

বিনয় এ কথা বলিল না যে ইতিমধ্যে সুচরিতার ভাবান্তর দেখিয়া সে আপন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সাহস করে নাই—সে কহিল, আমি সেগুলো একত্র সংগ্রহ করে রেখেছি, কালই এনে দেব।

বিনয় পরদিন পুস্তিকা ও কাগজের এক পুঁটুলি আনিয়া সুচরিতাকে দিয়া গেল। সুচরিতা সেগুলি হাতে পাইয়া আর পড়িল না, বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিল। পড়িতে অত্যন্ত ইচ্ছা করিল বলিয়াই পড়িল না। চিত্তকে

কোনো মতেই বিক্ষিপ্ত হইতে দিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজের বিদ্রোহী চিত্তকে পুনর্ব্বার হারান বাবুর শাসনাধীনে সমর্পণ করিয়া আর একবার সে সান্ত্বনা অনুভব করিল।

২৬

রবিবার দিন সকালে আনন্দময়ী পান সাজিতেছিলেন, শশিমুখী তাঁহার পাশে বসিয়া সুপারি কাটিয়া স্তূপাকার করিতেছিল। এমন সময় বিনয় আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই শশিমুখী তাহার কোলের আঁচল হইতে সুপারি ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। আনন্দময়ী একটুখানি মুচ্‌কিয়া হাসিলেন।

বিনয় সকলেরই সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে পারিত। শশিমুখীর সঙ্গে এতদিন তাহার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। উভয় পক্ষেই পরস্পরের প্রতি খুব উপদ্রব চলিত। শশিমুখী বিনয়ের জুতা লুকাইয়া রাখিয়া তাহার নিকট হইতে গল্প আদায় করিবার উপায় বাহির করিয়াছিল। বিনয় শশিমুখীর জীবনের দুই একটা সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাহাতে যথেষ্ট রং ফলাইয়া দুই একটা গল্প বানাইয়া রাখিয়াছিল। তাহারই অবতারণা করিলে শশিমুখী বড়ই জব্দ হইত—প্রথমে সে বক্তার প্রতি মিথ্যাভাষণের অপবাদ দিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদের চেষ্টা করিত; তাহাতে হার মানিলে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিত। সেও বিনয়ের জীবনচরিত বিকৃত করিয়া পাণ্টা গল্প বানাইবার চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু রচনাশক্তিতে সে বিনয়ের সমকক্ষ না হওয়াতে এসম্বন্ধে বড় একটা সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

যাহা হোক, বিনয় এ বাড়িতে আসিলেই সব কাজ ফেলিয়া শশিমুখী তাহার সঙ্গে গোলমাল করিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। এক একদিন এত উৎপাত করিত যে আনন্দময়ী তাহাকে ভৎর্সনা করিতেন কিন্তু দোষ ত

তাহার একলার ছিল না, বিনয় তাহাকে এমনি উত্তেজিত করিয়া তুলিত, যে আত্মসম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। সেই শশিমুখী আজ যখন বিনয়কে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল তখন আনন্দময়ী হাসিলেন কিন্তু সে হাসি সুখের হাসি নহে।

বিনয়কেও এই ক্ষুদ্র ঘটনায় এমন আঘাত করিল যে সে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনয়ের পক্ষে শশিমুখীকে বিবাহ করা যে কতখানি অসঙ্গত তাহা এই ছোটোখাটো ব্যাপারেই ফুটিয়া উঠে। বিনয় যখন সম্মতি দিয়াছিল তখন সে কেবল গোরার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্বের কথাই চিন্তা করিয়াছিল, ব্যাপারটাকে কল্পনার দ্বারা অনুভব করে নাই। তা ছাড়া আমাদের দেশে বিবাহটা যে প্রধানত ব্যক্তিগত নহে তাহা পারিবারিক, এই কথা লইয়া বিনয় গৌরব করিয়া কাগজে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছে; নিজেও এ সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিতৃষ্ণাকে মনে স্থানও দেয় নাই। আজ শশিমুখী যে বিনয়কে দেখিয়া আপনার বর বলিয়া জিভ কাটিয়া পলাইয়া গেল ইহাতে শশিমুখীর সঙ্গে তাহার ভাবী সম্বন্ধের একটা চেহারা তাহার কাছে দেখা দিল। গোরা যে তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাহাকে কতদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতেছিল ইহা মনে করিয়া গোরার উপরে তাহার রাগ হইল, নিজের উপরে ধিক্কার জন্মিল, এবং আনন্দময়ী যে প্রথম হইতেই এই বিবাহে নিষেধ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতায় তাঁহার প্রতি বিনয়ের মন বিস্ময়মিশ্রিত ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী বিনয়ের মনের ভাবটা বুঝিলেন। তিনি অন্যদিকে তাহার মনকে ফিরাইবার জন্য বলিলেন,—কাল গোরার চিঠি পেয়েছি বিনয়।

বিনয় একটু অন্যমনস্ক ভাবেই কহিল—কি লিখেছে?

আনন্দময়ী কহিলেন,—নিজের খবর বড় একটা কিছু দেয়নি। দেশের

ছোট লোকদের দুর্দ্দশা দেখে দুঃখ করে লিখেছে। ঘোষপাড়া বলে কোন এক গ্রামে ম্যাজিষ্ট্রেট কি সব অন্যায় করচে তারই বর্ণনা করেচে।

গোরার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাবের উত্তেজনা হইতেই অসহিষ্ণু হইয়া বিনয় বলিয়া উঠিল—গোরার ঐ পরের দিকেই দৃষ্টি; আর আমরা সমাজের বুকের উপরে বসে প্রতিদিন যে সব অত্যাচার করচি তা কেবলি মার্জ্জনা করতে হবে, আর বলতে হবে এমন সৎকর্ম্ম আর কিছু হতে পারে না!

হঠাৎ গোরার উপরে এইরূপ দোষারোপ করিয়া বিনয় যেন অন্য পক্ষ বলিয়া নিজেকে দাঁড় করাইল দেখিয়া আনন্দময়ী হাসিলেন।

বিনয় কহিল,—মা, তুমি হাসচ, মনে করচ হঠাৎ বিনয় এমন রাগ করে উঠল কেন? কেন রাগ হয় তোমাকে বলি। সুধীর সেদিন আমাকে তাদের নৈহাটি ষ্টেশনে তার এক বন্ধুর বাগানে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা শেয়ালদা ছাড়তেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। শোদপুর ষ্টেশনে যখন গাড়ি থামল, দেখি একটি সাহেবী কাপড় পরা বাঙালী নিজে মাথায় দিব্যি ছাতা দিয়ে তার স্ত্রীকে গাড়ি থেকে নাবালে। স্ত্রীর কোলে একটি শিশু ছেলে; গায়ের মোটা চাদরটা দিয়ে সেই ছেলেটিকে কোনো-মতে ঢেকে খোলা ষ্টেশনের একধারে দাঁড়িয়ে সে বেচারী শীতে ও লজ্জায় জড়সড় হয়ে ভিজতে লাগল—তার স্বামী জিনিষ পত্র নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁক ডাক বাধিয়ে দিলে। আমার এক মুহূর্ত্তে মনে পড়ে গেল সমস্ত বাংলাদেশে কি রৌদ্রে কি বৃষ্টিতে কি ভদ্র কি অভদ্র কোনো স্ত্রীলোকের মাথায় ছাতা নেই। যখন দেখলুম স্বামীটা নির্লজ্জ ভাবে মাথায় ছাতা দিয়েছে, আর তার স্ত্রী গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে নীরবে ভিজচে, এই ব্যবহারটাকে মনে মনেও নিন্দা করচে না,—এবং ষ্টেশন সুদ্ধ কোনো লোকের মনে এটা কিছুমাত্র অন্যায় বলে বোধ হচ্চে না তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত

সমাদর করি, তাদের লক্ষ্মী বলে দেবী বলে জানি এসমস্ত অলীক কাব্যকথা আর কোনো দিন মুখেও উচ্চারণ করব না।

নিজের উৎসাহে হঠাৎ লজ্জিত হইয়া বিনয় স্বাভাবিক সুরে কহিল—মা, তুমি ভাবচ, বিনয় মাঝে মাঝে এই রকম বড় বড় কথায় বক্তৃতা করে থাকে—আজো তাকে বক্তৃতায় পেয়েছে। অভ্যাসবশত আমার কথাগুলো বক্তৃতার মত হয়ে পড়ে, আজ এ আমার কিন্তু বক্তৃতা নয়। দেশের মেয়েরা যে দেশের কতখানি, আগে আমি তা ভাল করে বুঝতেই পারিনি—কখনো চিন্তাও করিনি। মা, আমি আর বেশি বকবো না। আমি বেশি কথা কই বলে আমার কথাকে কেউ আমারই মনের কথা বলে বিশ্বাস করে না। এবার থেকে কথা কমাব।

বলিয়া বিনয় আর বিলম্ব না করিয়া উৎসাহদীপ্ত চিত্তে প্রস্থান কারল।

আনন্দময়ী মহিমকে ডাকাইয়া বলিলেন,—বাবা, বিনয়ের সঙ্গে আমাদের শশিমুখীর বিবাহ হবে না।

মহিম—কেন? তোমার অমত আছে?

আনন্দময়ী। এ সম্বন্ধ শেষ পর্য্যন্ত টিঁক্‌বে না বলেই আমার অমত, নইলে অমত করব কেন?

মহিম। গোরা রাজি হয়েছে, বিনয়ও রাজি, তবে টিঁক্‌বে না কেন? অবশ্য, তুমি যদি মত না দাও তা হলে বিনয় এ কাজ করবে না সে আমি জানি।

আনন্দময়ী। আমি বিনয়কে তোমার চেয়ে ভাল জানি।

মহিম। গোরার চেয়েও?

আনন্দময়ী। হাঁ, গোরার চেয়েও ভাল জানি, সেই জন্যেই সকল দিক ভেবে আমি মত দিতে পারচি নে।

মহিম। আচ্ছা গোরা ফিরে আসুক।

আনন্দময়ী। মহিম, আমার কথা শোনো। এ নিয়ে যদি বেশি

পীড়াপীড়ি কর তাহলে শেষ কালে একটা গোলমাল হবে। আমার ইচ্ছা নয় যে, গোরা বিনয়কে এ নিয়ে কোনো কথা বলে।

আচ্ছা দেখা যাবে বলিয়া মহিম মুখে একটা পান লইয়া রাগ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

২৭

গোরা যখন ভ্রমণে বাহির হইল তখন তাহার সঙ্গে অবিনাশ, মতিলাল, বসন্ত এবং রমাপতি এই চারজন সঙ্গী ছিল। কিন্তু গোরার নির্দ্দয় উৎসাহের সঙ্গে তাহারা তাল রাখিতে পারিল না। অবিনাশ এবং বসন্ত অসুস্থ শরীরের ছুতা করিয়া চার পাঁচ দিনের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। নিতান্তই গোরার প্রতি ভক্তিবশত মতিলাল ও রমাপতি তাহাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না। কিন্তু তাহাদের কষ্টের সীমা ছিল না; কারণ, গোরা চলিয়াও শ্রান্ত হয় না আবার কোথাও স্থির হইয়া বাস করিতেও তাহার বিরক্তি নাই। গ্রামের যে-কোনো গৃহস্থ গোরাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভক্তি করিয়া ঘরে রাখিয়াছে তাহার বাড়িতে আহার ব্যবহারের যতই অসুবিধা হোক দিনের পর দিন সে কাটাইয়াছে। তাহার আলাপ শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রামের লোক তাহার চারিদিকে সমাগত হইত, তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

ভদ্রসমাজ, শিক্ষিতসমাজ ও কলিকাতা সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ গোরা তাহা এই প্রথম দেখিল। এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্ব্বল; সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন; প্রত্যেক পাঁচ সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত; পৃথিবীর বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত; তুচ্ছতাকে যে

সে কতই বড় করিয়া জানে এবং সংস্কার মাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন ; তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ, তাহা গোরা গ্রামবাসিদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনো মতেই কল্পনা করিতে পারিত না। গোরা গ্রামে বাস করিবার সময় একটা পাড়ায় আগুন লাগিয়াছিল—এত বড় একটা সঙ্কটেও সকলে দলবদ্ধ হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় বিপদের বিরুদ্ধে কাজ করিবার শক্তি যে তাহাদের কত অল্প তাহা দেখিয়া গোরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সকলেই গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি, কান্নাকাটি করিতে লাগিল কিন্তু বিধিবদ্ধভাবে কিছুই করিতে পারিল না। সে পাড়ার নিকটে জলাশয় ছিল না ; মেয়েরা দূর হইতে জল বহিয়া আনিয়া ঘরের কাজ চালায় ; অথচ প্রতিদিনেরই সেই অসুবিধা লাঘব করিবার জন্য ঘরে একটা স্বল্পব্যয়ে কূপ খনন করিয়া রাখে সঙ্গতিপন্ন লোকেরও সে চিন্তাই ছিল না। পূর্ব্বেও এ পাড়ায় মাঝে মাঝে আগুন লাগিয়াছে, তাহাকে দৈবের উৎপাত বলিয়াই সকলে নিরুদ্যম হইয়া আছে, নিকটে কোনো প্রকার জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের কোনরূপ চেষ্টাই জন্মে নাই। পাড়ার নিতান্ত প্রয়োজন সম্বন্ধেও যাহাদের বোধশক্তি এমন আশ্চর্য্য অসাড় তাহাদের কাছে সমস্ত দেশের আলোচনা করা গোরার কাছে বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইল। সকলের চেয়ে গোরার কাছে আশ্চর্য্য এই লাগিল যে, মতিলাল ও রমাপতি এই সমস্ত দৃশ্যে ও ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হইত না—বরঞ্চ গোরার ক্ষোভকে তাহারা অসঙ্গত বলিয়াই মনে করিত। ছোটলোকেরা ত এইরকম করিয়াই থাকে, তাহারা এমনি করিয়াই ভাবে, এই সকল কষ্টকে তাহারা কষ্টই মনে করে না ; ছোটলোকদের পক্ষে এরূপ ছাড়া আর যে কিছু হইতেই পারে তাহাই কল্পনা করা তাহারা বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ করে। এই অজ্ঞতা জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কি ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড—এবং এই ভার যে আমাদের

শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র সকলেরই কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না এই কথা আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া গোরার চিত্ত রাত্রিদিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।

মতিলাল বাড়ি হইতে পীড়ার সংবাদ পাইয়াছে বলিয়া বিদায় হইল; গোরার সঙ্গে কেবল রমাপতি অবশিষ্ট রহিল।

উভয়ে চলিতে চলিতে একজায়গায় নদীর চরে এক মুসলমান পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আতিথ্যগ্রহণের প্রত্যাশায় খুঁজিতে খুঁজিতে সমস্ত গ্রামের মধ্যে কেবল একটি ঘর মাত্র হিন্দু নাপিতের সন্ধান পাওয়া গেল। দুই ব্রাহ্মণ তাহারই ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া দেখিল বৃদ্ধ নাপিত ও তাহার স্ত্রী একটি মুসলমানের ছেলেকে পালন করিতেছে। রমাপতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সে ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গোরা নাপিতকে তাহার অনাচারের জন্য ভৎর্সনা করাতে সে কহিল,—ঠাকুর, আমরা বলি হরি ওরা বলে আল্লা কোনো তফাৎ নেই।

তখন রৌদ্র প্রখর হইয়াছে—বিস্তীর্ণ বালুচর, নদী বহুদূর। রমাপতি পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া কহিল,—হিন্দুর পানীয় জল পাই কোথায়?

নাপিতের ঘরে একটা কাঁচা কূপ আছে—কিন্তু ভ্রষ্টাচারের সে কূপ হইতে রমাপতি জল খাইতে না পারিয়া মুখ বিমর্ষ করিয়া বসিয়া রহিল।

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, এছেলের কি মা বাপ নেই?

নাপিত কহিল, দুই আছে, কিন্তু না থাকারই মত।

গোরা কহিল, সে কি রকম?

নাপিত যে ইতিহাসটা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই:—

যে জমীদারীতে ইহারা বাস করিতেছে তাহা নীলকর সাহেবদের ইজারা। চরে নীলের জমী লইয়া প্রজাদের সহিত নীলকুঠির বিরোধের অন্ত নাই। অন্য সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে কেবল এই চর ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবেরা শাসন করিয়া বাধ্য করিতে পারে নাই। এখানকার

প্রজারা সমস্তই মুসলমান, এবং ইহাদের প্রধান ফরুসর্দ্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষে দুইবার পুলিসকে ঠেঙাইয়া সে জেল খাটিয়া আসিয়াছে; তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার ঘরে ভাত নাই বলিলেই হয় কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না। এবারে নদীর কাঁচি চরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরো ধান পাইয়াছিল,—আজ মাসখানেক হইল নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজার ধান লুট করে। সেই উৎপাতের সময় ফরুসর্দ্দার সাহেবের ডানহাতে এমন এক লাঠি বসাইয়াছিল যে ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এত বড় দুঃসাহসিক ব্যাপার এ অঞ্চলে আর কখনো হয় নাই। ইহার পর হইতে পুলিসের উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনের মত লাগিয়াছে;—প্রজাদের কাহারো ঘরে কিছু রাখিল না, ঘরের মেয়েদের ইজ্জৎ আর থাকে না; ফরুসর্দ্দার এবং বিস্তর লোককে হাজতে রাখিয়াছে, গ্রামের বহুতর লোক পলাতক হইয়াছে। ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন; এমন কি, তাহার পরনের একখানি মাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছে যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না; তাহার একমাত্র বালকপুত্র তমিজ, নাপিতের স্ত্রীকে গ্রামসম্পর্কে মাসী বলিয়া ডাকিত; সে খাইতে পায়না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী তাহাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে। নীলকুঠির একটা কাছারি ক্রোশদেড়েক তফাতে আছে, দারোগা এখনো তাহার দলবল লইয়া সেখানে আছে; তদন্ত উপলক্ষে গ্রামে যে কখন আসে এবং কি করে তাহার ঠিকানা নাই। গত কল্য নাপিতের প্রতিবেশী বৃদ্ধ নাজিমের ঘরে পুলিসের আবির্ভাব হইয়াছিল। নাজিমের এক যুবক শ্যালক, ভিন্ন এলেকা হইতে তাহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল—দারোগা নিতান্তই বিনা কারণে "বেটা ত জোয়ান কম নয়, দেখেচ বেটার বুকের ছাতি"—বলিয়া হাতের লাঠিটা দিয়া তাহাকে এমন

একটা খোঁচা মারিল যে তাহার দাঁত ভাঙিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তাহার ভগিনী এই অত্যাচার দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেই সেই বৃদ্ধাকে এক ধাক্কা মারিয়া সে ফেলিয়া দিল। পূর্ব্বে পুলিস এ পাড়ায় এমনতর উপদ্রব করিতে সহসা সাহস করিত না কিন্তু এখন পাড়ার বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ মাত্রই হয় গ্রেফ্তার নয় পলাতক হইয়াছে। সেই পলাতকদিগকে সন্ধানের উপলক্ষ করিয়াই পুলিস গ্রামকে এখনো শাসন করিতেছে। কবে এ গ্রহ কাটিয়া যাইবে তাহা কিছুই বলা যায় না।

গোরা ত উঠিতে চায় না, ওদিকে রমাপতির প্রাণ বাহির হইতেছে। সে নাপিতের মুখের ইতিবৃত্ত শেষ না হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, হিন্দুর পাড়া কত দূরে আছে?

নাপিত কহিল—ক্রোশ দেড়েক দূরে যে নীলকুঠির কাছারি আছে, তাহার তহশিলদার ব্রাহ্মণ, নাম মাধব চাটুয্যে।

গোরা জিজ্ঞাসা করিল—স্বভাবটা?

নাপিত কহিল—যমদূত বল্লেই হয়। এত বড় নির্দ্দয় অথচ কৌশলী লোক আর দেখা যায় না। এই যে ক'দিন দারোগাকে ঘরে পুষ্‌চে, তার সমস্ত খরচা আমাদেরই কাছ থেকে আদায় করবে—তাতে কিছু মুনফাও থাকবে।

রমাপতি কহিল—গৌরবাবু চলুন, আর ত পারা যায় না।—বিশেষত নাপিতবৌ যখন মুসলমান ছেলেটিকে তাহাদের প্রাঙ্গণের কুয়াটার কাছে দাঁড় করাইয়া ঘটিতে করিয়া জল তুলিয়া স্নান করাইয়া দিতে লাগিল তখন তাহার মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল এবং এ বাড়িতে বসিয়া থাকিতে তাহার প্রবৃত্তিই হইল না।

গোরা যাইবার সময় নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল,—এই উৎপাতের মধ্যে তুমি যে এ পাড়ায় এখনো টিকে আছ? আর কোথাও তোমার আত্মীয় কেউ নেই?

নাপিত কহিল—অনেক দিন আছি এদের উপর আমার মায়া পড়ে গেছে। আমি হিন্দু নাপিত, আমার জোতজমা বিশেষ কিছু নেই বলে কুঠির লোক আমার গায়ে হাত দেয় না। আজ এ পাড়ায় পুরুষ বলতে আর বড় কেউ নেই, আমি যদি যাই তা'হলে মেয়েগুলো ভয়েই মারা যাবে।

গোরা কহিল, আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া করে আবার আমি আসব।

দারুণ ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় এই নীলকুঠির উৎপাতের সুদীর্ঘ বিবরণে রমাপতি গ্রামের লোকের উপরেই চটিয়া গেল। বেটারা প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে চায় ইহা গোঁয়ার মুসলমানের স্পর্দ্ধা ও নির্ব্বুদ্ধিতার চরম বলিয়া তাহার কাছে মনে হইল। যথোচিত শাসনের দ্বারা ইহাদের এই ঔদ্ধত্য চূর্ণ হইলেই যে ভাল হয় ইহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। এই প্রকারের লক্ষ্মীছাড়া বেটাদের প্রতি পুলিসের উৎপাত ঘটিয়াই থাকে এবং ঘটিতেই বাধ্য এবং ইহারাই সে জন্য প্রধানত দোষী এইরূপ তাহার ধারণা। মনিবের সঙ্গে মিটমাট করিয়া লইলেই ত হয়, ফেসাদ্ বাধাইতে যায় কেন, তেজ এখন রহিল কোথায়? বস্তুত রমাপতির অন্তরের সহানুভূতি নীলকুঠির সাহেবের প্রতিই ছিল।

মধ্যাহ্নরৌদ্রে উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়া চলিতে চলিতে গোরা সমস্ত পথ একটি কথাও বলিল না। অবশেষে গাছপালার ভিতর হইতে কাছারি-বাড়ির চালা যখন কিছুদূর হইতে দেখা গেল তখন হঠাৎ গোরা আসিয়া কহিল,—রমাপতি তুমি খেতে যাও, আমি সেই নাপিতের বাড়ি চল্লুম।

রমাপতি কহিল,—সে কি কথা? আপনি খাবেন না? চাটুজ্জের ওখানে খাওয়া দাওয়া করে তার পরে যাবেন।

গোরা কহিল,—আমার কর্ত্তব্য আমি করব এখন। তুমি খাওয়া দাওয়া সেরে কলকাতায় চলে যেয়ো—ঐ ঘোষপুর চরে আমাকে বোধ হয় কিছু দিন থেকে যেতে হবে—তুমি সে পারবে না।

রমাপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গোরার মত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু

ঐ ম্লেচ্ছের ঘরে বাস করিবার কথা কোন্ মুখে উচ্চারণ করিল তাই সে ভাবিয়া পাইল না। গোরা কি পান ভোজন পরিত্যাগ করিয়া প্রায়োপ-বেশনের সংকল্প করিয়াছে তাই সে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু তখন ভাবিবার সময় নহে, এক এক মুহূর্ত্ত তাহার কাছে এক এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে; গোরার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলায়নের জন্য তাহাকে অধিক অনুরোধ করিতে হইল না। ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটি দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।

ক্ষুধার তৃষ্ণায় গোরাকে অভিভূত করিয়াছিল কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধব চাটুজ্জের অন্ন খাইয়া তবে জাত বাঁচাইতে হইবে এ কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার অসহ্য বোধ হইল। তাহার মুখ চোখ লাল ও মাথা গরম হইয়া মনের মধ্যে বিষম একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সে কহিল পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিষ করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কি ভয়ঙ্কর অধর্ম্ম করিতেছি! উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে! যাই হোক্ এই আচার বিচারের ভাল মন্দের কথা পরে ভাবিব কিন্তু এখন ত পারিলাম না।

নাপিত গোরাকে একলা ফিরিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গোরা প্রথমে আসিয়া নাপিতের ঘটী নিজের হাতে ভাল করিয়া মাজিয়া কূপ হইতে জল তুলিয়া খাইল এবং কহিল ঘরে যদি কিছু চাল ডাল থাকে ত দাও আমি রাঁধিয়া খাইব। নাপিত ব্যস্ত হইয়া রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিল। গোরা আহার সারিয়া কহিল,—আমি তোমার এখানে দু'চার দিন থাক্‌ব।

নাপিত ভয় পাইয়া হাত জোড় করিয়া কহিল—আপনি এই অধমের এখানে থাকবেন তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কিছুই নেই। কিন্তু দেখুন আমাদের উপরে পুলিসের দৃষ্টি পড়েছে, আপনি থাকলে কি ফেসাদ্ ঘট্‌বে তা ত বলা যায় না।

গোরা কহিল,—আমি এখানে উপস্থিত থাকলে পুলিস কোনো উৎপাত করতে সাহস করবে না। যদি করে আমি তোমাদের রক্ষা করব।

নাপিত কহিল—দোহাই আপনার, রক্ষা করবার যদি চেষ্টা করেন তাহলে আমাদের আর রক্ষা থাক্‌বে না। ও বেটারা ভাববে আমিই চক্রান্ত করে আপনাকে ডেকে এনে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী যোগাড় করে দিয়েছি? এত দিন কোনো প্রকারে টিঁকে ছিলুম, আর টিঁকুতে পারব না। আমাকে স্বুদ্ধ যদি এখান থেকে উঠ্‌তে হয় তাহলে গ্রাম পয়মাল হয়ে যাবে।

গোরা চিরদিন সহরে থাকিয়াই মানুষ হইয়াছে, নাপিত কেন যে এত ভয় পাইতেছে তাহা তাহার পক্ষে বুঝিতে পারাই শক্ত। সে জানিত ন্যায়ের পক্ষে জোর করিয়া দাঁড়াইলে অন্যায়ের প্রতিকার হয়। বিপন্ন গ্রামকে অসহায় রাখিয়া চলিয়া যাইতে কিছুতেই তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি সম্মত হইল না। তখন নাপিত তাহার পায়ে ধরিয়া কহিল,—দেখুন আপনি ব্রাহ্মণ, আমার পুণ্যবলে আমার বাড়িতে অতিথি হয়েছেন, আপনাকে যেতে বল্‌চি এতে আমার অপরাধ হচ্চে। কিন্তু আমাদের প্রতি আপনার দয়া আছে জেনেই বল্‌চি, আপনি আমার এই বাড়িতে বসে পুলিসের অত্যাচারে যদি কোনো বাধা দেন তাহলে আমাকে বড়ই বিপদে ফেল্‌বেন।

নাপিতের এই ভয়কে অমূলক কাপুরুষতা মনে করিয়া গোরা কিছু বিরক্ত হইয়াই অপরাহ্ণে তাহার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। এই ম্লেচ্ছাচারীর ঘরে আহারাদি করিয়াছে মনে করিয়া তাহার মনের মধ্যে একটা

অপ্রসন্নতাও জন্মিতে লাগিল। ক্লান্ত শরীরে এবং উত্যক্তচিত্তে সন্ধ্যার সময়ে সে নীলকুঠির কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আহার সারিয়া রমাপতি কলিকাতায় রওনা হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করে নাই, তাই সেখানে তাহার দেখা পাওয়া গেল না। মাধব চাটুজ্জে বিশেষ খাতির করিয়া গোরাকে আতিথ্যে আহ্বান করিল। গোরা একেবারেই আগুন হইয়া উঠিয়া কহিল,—আপনার এখানে আমি জলগ্রহণও করব না।

মাধব বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই গোরা তাহাকে অন্যায়কারী অত্যাচারী বলিয়া কটূক্তি করিল,—এবং আসন গ্রহণ না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা তক্তপোষে বসিয়া তাকিয়া আশ্রয় করিয়া গুড়্‌গুড়িতে তামাক টানিতেছিল। সে খাড়া হইয়া বসিল এবং রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—কেহে তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়?

গোরা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া কহিল,—তুমি দারোগা বুঝি? তুমি ঘোষপুরের চরে যে সমস্ত উৎপাত করেছ আমি তার সমস্ত খবর নিয়েছি। এখনো যদি সাবধান না হও তাহলে—

দারোগা। ফাঁসি দেবে না কি? তাই ত লোকটা কম নয় ত দেখচি! ভেবেছিলেম ভিক্ষা নিতে এসেছে, এযে চোখ রাঙায়! ওরে তেওয়ারি।

মাধব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দারোগার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—আরে কর কি, ভদ্রলোক অপমান কোরো না।

দারোগা গরম হইয়া কহিল—কিসের ভদ্রলোক। উনি যে তোমাকে যা খুসি তাই বল্লেন, সেটা বুঝি অপমান নয়?

মাধব কহিল—যা বলেচেন সে ত মিথ্যে বলেন নি, তা রাগ করলে চলবে কি করে? নীলকুঠির সাহেবের গোমস্তাগিরি করে খাই, তার চেয়ে আর ত কিছু বলবার দরকার করে না। রাগ কোরো না দাদা, তুমি যে পুলিসের দারোগা, তোমাকে যমের পেয়াদা বল্লে কি গাল হয়?

বাঘ মানুষ মেরে খায়, সে বোষ্টম নয়, সে ত জানা কথা। কি করবে, তাকে ত খেতে হবে।

বিনা প্রয়োজনে মাধবকে রাগ প্রকাশ করিতে কেহ কোনো দিন দেখে নাই। কোন্ মানুষের দ্বারা কখন্ কি কাজ পাওয়া যায়, অথবা বক্র হইলে কাহার দ্বারা কি অপকার হইতে পারে তাহা বলা যায় কি? কাহারো অনিষ্ট বা অপমান সে খুব হিসাব করিয়াই করিত—রাগ করিয়া পরকে আঘাত করিবার ক্ষমতার বাজে খরচ করিত না।

দারোগা তখন গোরাকে কহিল—দেখ বাপু, আমরা এখানে সরকারের কাজ করতে এসেছি—এতে যদি কোনো কথা বল বা গোলমাল কর তাহলে মুস্কিলে পড়বে!

গোরা কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মাধব তাড়াতাড়ি তাহার পশ্চাতে গিয়া কহিল—মশায়, যা বলেচেন সে কথাটা ঠিক—আমাদের এ কসাইয়ের কাজ—আর ঐ যে বেটা দারোগা দেখ্‌চেন ওর সঙ্গে এক বিছানায় বস্‌লে পাপ হয়—ওকে দিয়ে কত যে দুষ্কর্ম্ম করিয়েছি তা মুখে উচ্চারণ করতেও পারিনে। আর বেশি দিন নয়—বছর দুত্তিন কাজ করলেই মেয়ে কটার বিয়ে দেবার সম্বল করে নিয়ে তার পরে স্ত্রী পুরুষে কাশীবাসী হব। আর ভাল লাগে না মশায়, এক এক সময় ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি? যা হোক, আজ রাত্রে যাবেন কোথায়? এইখানেই আহারাদি করে শয়ন করবেন। ও দারোগা বেটার ছায়া মাড়াতেও হবে না, আপনার জন্যে সমস্ত আলাদা বন্দোবস্ত করে দেব।

গোরার ক্ষুধা সাধারণের অপেক্ষা অধিক— আজ প্রাতে ভাল করিয়া খাওয়াও হয় নাই—কিন্তু তাহার সর্ব্ব শরীর যেন জ্বলিতেছিল—সে কোনো মতেই এখানে থাকিতে পারিল না—কহিল আমার বিশেষ কাজ আছে।

মাধব কহিল—তা রসুন্ একটা লণ্ঠন সঙ্গে দিই।

গোরা তাহার কোনো জবাব না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মাধব ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—দাদা ওলোকটা সদরে গেল। এই বেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটা লোক পাঠাও।

দারোগা কহিল—কেন, কি করতে হবে? মাধব কহিল—আর কিছু নয়, একবার কেবল জানিয়ে আসুক্ একজন ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে সাক্ষী ভাঙাবার জন্যে চেষ্টা করে বেড়াচ্চে।

২৮

ম্যাজিষ্ট্রেট্ ব্রাউন্‌লো সাহেব দিবাবসানে নদীর ধারের রাস্তায় পদব্রজে বেড়াইতেছেন, সঙ্গে হারান বাবু রহিয়াছেন। কিছু দূরে গাড়িতে তাঁহার মেম পরেশ বাবুর মেয়েদের লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন।

ব্রাউন্‌লো সাহেব গার্ডেন্ পার্টিতে মাঝে মাঝে বাঙালী ভদ্রলোকদিগকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতেন। জিলার এণ্ট্রেন্স স্কুলে প্রাইজ বিতরণ উপলক্ষে তিনিই সভাপতির কাজ করিতেন। কোনো সম্পন্ন লোকের বাড়ীতে বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি গৃহকর্ত্তার অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতেন। এমন কি, যাত্রাগানের মজলিসে আহূত হইয়া তিনি একটা বড় কেদারায় বসিয়া কিছুক্ষণের জন্য ধৈর্য্যসহকারে গান শুনিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আদালতের গভর্মেণ্ট প্লীডারের বাড়িতে গত পূজার দিন যাত্রায় যে দুই ছোকরা ভিস্তি ও মেথরাণী সাজিয়াছিল, তাহাদের অভিনয়ে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধক্রমে একাধিকবার তাহাদের অংশ তাঁহার সম্মুখে পুনরাবৃত্ত হইয়াছিল।

তাঁহার স্ত্রী মিশনরির কন্যা ছিলেন। তাঁহার বাড়িতে মাঝে মাঝে মিশনরি মেয়েদের চা-পান সভা বসিত। জেলায় তিনি একটি মেয়ে

ইস্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সেই স্কুলে ছাত্রীর অভাব না হয় সে জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। পরেশবাবুর বাড়িতে মেয়েদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার চর্চ্চা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন; দূরে থাকিলেও মাঝে মাঝে চিঠি পত্র চালাইতেন ও ক্রিষ্ট্‌মাসের সময় তাহাদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার পাঠাইতেন।

মেলা বসিয়াছে। তদুপলক্ষে হারানবাবু, সুধীর ও বিনয়ের সঙ্গে বরদাসুন্দরী ও মেয়েরা সকলেই আসিয়াছেন—তাঁহাদিগকে ইন্‌স্পেক্‌শন বাংলায় স্থান দেওয়া হইয়াছে। পরেশবাবু এই সমস্ত গোলমালের মধ্যে কোনোমতেই থাকিতে পারেন না এই জন্য তিনি একলা কলিকাতাতেই রহিয়া গিয়াছেন। সুচরিতা তাঁহার সঙ্গরক্ষার জন্য তাঁহার কাছে থাকিতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু পরেশ, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণে কর্ত্তব্যপালনের জন্য সুচরিতাকে বিশেষ উপদেশ দিয়াই পাঠাইয়া দিলেন। আগামী পরশ্ব কমিশনর সাহেব ও সস্ত্রীক ছোট লাটের সম্মুখে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়িতে ডিনারের পরে ঈভ্‌নিং পার্টিতে পরেশবাবুর মেয়েদের দ্বারা অভিনয় আবৃত্তি প্রভৃতি হইবার কথা স্থির হইয়াছে—সে জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের অনেক ইংরেজ বন্ধু জেলা ও কলিকাতা হইতে আহূত হইয়াছেন। কয়েকজন বাছা বাছা বাঙালী ভদ্রলোকেরও উপস্থিত হইবার আয়োজন হইয়াছে। তাঁহাদের জন্য বাগানে একটি তাঁবুতে ব্রাহ্মণ পাচক কর্ত্তৃক প্রস্তুত জলযোগেরও ব্যবস্থা হইবে এইরূপ শুনা যাইতেছে।

হারান বাবু অতি অল্পকালের মধ্যেই উচ্চভাবের আলাপে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে হারান বাবুর অসামান্য অভিজ্ঞতা দেখিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণে তিনি অল্প একটু মাত্র বাধা কেন রাখিয়াছেন এই প্রশ্নও হারান বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

আজ অপরাহ্নে নদীতীরের পথে হারান বাবুর সঙ্গে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যপ্রণালী ও হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় গোরা "গুড্ ঈভ্নিং স্যর" বলিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাল সে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া বুঝিয়াছে যে সাহেবের চৌকাঠ উত্তীর্ণ হইতে গেলে তাঁহার পেয়াদার মাশুল যোগাইতে হয়। এরূপ দণ্ড ও অপমান স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া আজ সাহেবের হাওয়া খাইবার অবকাশে সে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। এই সাক্ষাৎকালে হারানবাবু ও গোরা, উভয় পক্ষ হইতেই পরিচয়ের কোনো লক্ষণ প্রকাশ হইল না।

লোকটাকে দেখিয়া সাহেব কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। এমন ছয়ফুটের চেয়ে লম্বা, হাড়মোটা, মজ্বুৎ মানুষ তিনি বাংলা দেশে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। ইহার দেহের বর্ণও সাধারণ বাঙালীর মত নহে। গায়ে একখানা খাকী রঙের পাঞ্জাবী জামা, ধুতি মোটা ও মলিন, হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি, চাদর খানাকে মাথায় পাগ্ড়ির মত বাঁধিয়াছে।

গোরা ম্যাজিষ্ট্রেটকে কহিল—আমি চর ঘোষপুর হইতে আসিতেছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট একপ্রকার বিস্ময়সূচক শিষ্ দিলেন। ঘোষপুরের তদন্ত-কার্য্যে একজন বিদেশী বাধা দিতে আসিয়াছে সে সংবাদ তিনি গতকল্যই পাইয়াছিলেন। তবে এই লোকটাই সে! গোরাকে আপাদমস্তক তীক্ষ্ণভাবে একবার নিরীক্ষণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন্ জাত?

গোরা কহিল,—আমি বাঙালী ব্রাহ্মণ।

সাহেব কহিলেন,—ও! খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার যোগ আছে বুঝি?

গোরা কহিল—না।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—তবে ঘোষপুর চরে তুমি কি করতে এসেছ ?

গোরা কহিল,—ভ্রমণ করতে করতে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলুম—পুলিশের অত্যাচারে গ্রামের দুর্গতির চিহ্ন দেখে এবং আরো উপদ্রবের সম্ভাবনা আছে জেনে প্রতিকারের জন্য আপনার কাছে এসেছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—চর ঘোষপুরের লোকগুলো অত্যন্ত বদমায়েস সে কথা তুমি জান ?

গোরা কহিল,—তারা বদ্‌মায়েস নয়, তারা নির্ভীক স্বাধীনচেতা—তারা অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে পারে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট চটিয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন নব্য বাঙালী ইতিহাসের পুঁথি পড়িয়া কতকগুলা বুলি শিখিয়াছে—Insufferable !

এখানকার অবস্থা তুমি কিছুই জান না—বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট গোরাকে খুব একটা ধমক দিলেন।

আপনি এখানকার অবস্থা আমার চেয়ে অনেক কম জানেন—গোরা মেঘমন্দ্র স্বরে জবাব করিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্চি তুমি যদি ঘোষপুরের ব্যাপার সম্বন্ধে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ কর তাহলে খুব সস্তায় নিষ্কৃতি পাবে না।

গোরা কহিল—আপনি যখন অত্যাচারের প্রতিবিধান করবেন না বলে মনস্থির করেছেন এবং গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে আপনার ধারণা যখন বদ্ধমূল, তখন আমার আর কোনো উপায় নেই—আমি গ্রামের লোকদের নিজের চেষ্টায় পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে উৎসাহিত করব।

ম্যাজিষ্ট্রেট চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যুতের মত গোরার দিকে ফিরিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—কি ! এত বড় স্পর্দ্ধা !

গোরা দ্বিতীয় কোনো কথা না বলিয়া ধীরগমনে চলিয়া গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—হারানবাবু, আপনাদের দেশের লোকদের মধ্যে এ সকল কিসের লক্ষণ দেখা যাইতেছে?

হারানবাবু কহিলেন—লেখাপড়া তেমন গভীরভাবে হইতেছে না, বিশেষত দেশে আধ্যাত্মিক ও চারিত্র-নৈতিক শিক্ষা একেবারে নাই বলিয়াই এরূপ ঘটিতেছে। ইংরেজি বিদ্যার যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ সেটা গ্রহণ করিবার অধিকার ইহাদের হয় নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজত্ব যে ঈশ্বরের বিধান এই অকৃতজ্ঞরা এখনো তাহা স্বীকার করিতে চাহিতেছে না তাহার একমাত্র কারণ ইহারা কেবল পড়ামুখস্থ করিয়াছে কিন্তু ইহাদের ধর্ম্মবোধ নিতান্তই অপরিণত।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—খৃষ্টকে স্বীকার না করিলে ভারতবর্ষে এই ধর্ম্মবোধ কখনই পূর্ণতা লাভ করিবে না।

হারানবাবু কহিলেন,—সে এক হিসাবে সত্য। এই বলিয়া খৃষ্টকে স্বীকার করা সম্বন্ধে একজন খৃষ্টানের সঙ্গে হারানবাবুর মতের কোন্ অংশে কতটুকু ঐক্য এবং কোথায় অনৈক্য তাহাই লইয়া হারান বাবু ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সূক্ষ্মভাবে আলাপ করিয়া তাঁহাকে এই কথা-প্রসঙ্গে এতই নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, মেমসাহেব যখন পরেশ বাবুর মেয়েদিগকে গাড়ি করিয়া ডাকবাংলায় পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে তাঁহার স্বামীকে কহিলেন,—হ্যারি, ঘরে ফিরিতে হইবে—তিনি চমকিয়া উঠিয়া ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন,—বাই জোভ, আটটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট! গাড়িতে উঠিবার সময় হারান বাবুর কর নিপীড়ন করিয়া বিদায়-সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন,—আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমার সন্ধ্যা খুব সুখে কাটিয়াছে।

হারানবাবু ডাকবাংলায় ফিরিয়া আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার আলাপের বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। কিন্তু গোরার সহিত সাক্ষাতের কোনো উল্লেখমাত্র করিলেন না।

২৯

কোন প্রকার অপরাধ বিচার না করিয়া কেবলমাত্র গ্রামকে শাসন করিবার জন্য সাতচল্লিশজন আসামীকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাতের পর গোরা উকিলের সন্ধানে বাহির হইল। কোনো লোকের কাছে খবর পাইল সাতকড়ি হালদার এখানকার একজন ভাল উকিল। সাতকড়ির বাড়ি যাইতেই সে বলিয়া উঠিল—বাঃ, গোরা যে! তুমি এখানে!

গোরা যা মনে করিয়াছিল তাই বটে—সাতকড়ি গোরার সহপাঠী। গোরা কহিল, চর ঘোষপুরের আসামীদিগকে জামিনে খালাস করিয়া তাহাদের মকদ্দমা চালাইতে হইবে।

সাতকড়ি কহিল,—জামিন হবে কে?

গোরা কহিল,—আমি হব।

সাতকড়ি কহিল,—তুমি সাতচল্লিশ জনের জামিন হবে তোমার এমন কি সাধ্য আছে?

গোরা কহিল,—যদি মোক্তারেরা মিলে জামিন হয় তার ফি আমি দেব।

সাতকড়ি কহিল,—টাকা কম লাগবে না।

পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের এজ্‌লাসে জামিন খালাসের দরখাস্ত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট গতকল্যকার সেই মলিন বস্ত্রধারী পাগ্‌ড়ীপরা বীরমূর্ত্তির দিকে একবার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। চৌদ্দ বৎসরের ছেলে হইতে আশি বৎসরের বুড়া পর্য্যন্ত হাজতে পচিতে লাগিল।

গোরা ইহাদের হইয়া লড়িবার জন্য সাতকড়িকে অনুরোধ করিল। সাতকড়ি কহিল,—সাক্ষী পাব কোথায়? যারা সাক্ষী হতে পারত

তারা সবাই আসামী! তার পরে এই সাহেব-মারা মামলার তদন্তের চোটে এ অঞ্চলের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের ধারণা হয়েছে ভিতরে ভিতরে ভদ্রলোকের যোগ আছে; হয় ত বা আমাকেও সন্দেহ করে, বলা যায় না। ইংরেজি কাগজগুলোতে ক্রমাগত লিখ্‌চে দেশিলোক যদি এ রকম স্পর্দ্ধা পায় তা হলে অরক্ষিত অসহায় ইংরেজেরা আর মফস্বলে বাস করতেই পারবে না। ইতিমধ্যে দেশের লোক দেশে টিক্‌তে পারচে না এমনি হয়েছে। অত্যাচার হচ্চে জানি কিন্তু কিছুই করবার জো নেই।

গোরা গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল,—কেন জো নেই?

সাতকড়ি হাসিয়া কহিল,—তুমি ইস্কুলে যেমনটি ছিলে এখনো ঠিক তেম্‌নিটি আছ দেখ্‌চি। জো নেই মানে আমাদের ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে—রোজ উপার্জ্জন না করলে অনেকগুলো লোককে উপবাস করতে হয়। পরের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে মরতে রাজি হয় এমন লোক সংসারে বেশি নেই—বিশেষত যে দেশে সংসার জিনিষটি বড় ছোটখাট জিনিষ নয়। যাদের উপর দশজন নির্ভর করে তারা সেই দশজন ছাড়া অন্য দশজনের দিকে তাকাবার অবকাশই পায় না।

গোরা কহিল,—তাহলে এদের জন্যে কিছুই করবে না? হাইকোর্টে মোশন করে যদি—

সাতকড়ি অধীর হইয়া কহিল,—আরে ইংরেজ মেরেছে যে—সেটা দেখ্‌চ না! প্রত্যেক ইংরেজটিই যে রাজা—একটা ছোট ইংরেজকে মারলেও যে সেটা একটা ছোট রকম রাজবিদ্রোহ। যেটাতে কিছু ফল হবে না সেটার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা করতে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপানলে পড়ব সে আমার দ্বারা হবে না।

কলিকাতায় গিয়া সেখানকার কোনো উকিলের সাহায্যে কিছু সুবিধা হয় কিনা তাই দেখিবার জন্য পরদিন সাড়ে দশটার গাড়িতে রওনা

হইবার অভিপ্রায়ে গোরা যাত্রা করিয়াছে এমন সময় বাধা পড়িয়া গেল।

এখানকার মেলা উপলক্ষেই কলিকাতার একদল ছাত্রের সহিত এখানকার স্থানীয় ছাত্রদলের ক্রিকেটযুদ্ধ স্থির হইয়াছে। হাত পাকাইবার জন্য কলিকাতার ছেলেরা আপন দলের মধ্যেই খেলিতেছিল। ক্রিকেটের গোলা লাগিয়া একটি ছেলের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। মাঠের ধারে একটা বড় পুষ্করিণী ছিল—আহত ছেলেটিকে দুইটি ছাত্র ধরিয়া সেই পুষ্করিণীর তীরে রাখিয়া চাদর ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া তাহার পা বাঁধিয়া দিতেছিল এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একটা পাহারাওয়ালা আসিয়াই একেবারেই একজন ছাত্রের ঘাড়ে হাত দিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিল। পুষ্করিণীটি পানীয় জলের জন্য রিজার্ভ করা, ইহার জলে নামা নিষেধ, কলিকাতার ছাত্র তাহা জানিত না, জানিলেও অকস্মাৎ পাহারাওয়ালার কাছে এরূপ অপমান সহ্য করা তাহাদের অভ্যাস ছিল না, গায়েও জোর ছিল তাই অপমানের যথোচিত প্রতিকার আরম্ভ করিয়া দিল। এই দৃশ্য দেখিয়া চার পাঁচ জন কন্‌ষ্টেবল ছুটিয়া আসিল। ঠিক এমন সময়টিতেই সেখানে গোরা আসিয়া উপস্থিত। ছাত্ররা গোরাকে চিনিত—গোরা তাহাদিগকে লইয়া অনেকদিন ক্রিকেট খেলাইয়াছে। গোরা যখন দেখিল, ছাত্রদিগকে মারিতে মারিতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে সে সহিতে পারিল না—সে কহিল—খবরদার মারিস্‌নে। পাহারাওয়ালার দল তাহাকে অশ্রাব্য গালি দিতেই গোরা ঘুষি ও লাথি মারিয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া তুলিল যে রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। এদিকে দেখিতে দেখিতে ছাত্রের দল জুটিয়া গেল। গোরার উৎসাহ ও আদেশ পাইয়া তাহারা পুলিসকে আক্রমণ করিতেই পাহারাওয়ালার দল রণে ভঙ্গ দিল। দর্শকরূপে রাস্তার লোকে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল; কিন্তু বলা বাহুল্য এই তামাসা গোরার পক্ষে নিতান্ত তামাসা হইল না।

বেলা যখন তিন চারটে,—ডাকবাংলায় বিনয়, হারানবাবু এবং মেয়েরা রিহার্সালে প্রবৃত্ত আছে এমন সময় বিনয়ের পরিচিত দুইজন ছাত্র আসিয়া খবর দিল গোরাকে এবং কয়জন ছাত্রকে পুলিসে গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া হাজতে রাখিয়াছে, আগামী কাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রথম এজ্‌লাসেই ইহার বিচার হইবে।

গোরা হাজতে! একথা শুনিয়া হারানবাবু ছাড়া আর সকলেই একেবারে চমকিয়া উঠিল। বিনয় তথনই ছুটিয়া প্রথমে তাহার সহপাঠী সাতকড়ি হালদারের নিকট গিয়া তাহাকে সমস্ত জানাইল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া হাজতে গেল।

সাতকড়ি তাহার পক্ষে ওকালতি ও তাহাকে এখনি জামিনে খালাসের চেষ্টা করিবার প্রস্তাব করিল। গোরা বলিল,—না, আমি উকীলও রাখব না আমাকে জামিনে খালাসেরও চেষ্টা করতে হবে না।

সে কি কথা! সাতকড়ি বিনয়ের দিকে ফিরিয়া কহিল,—দেখছো! কে বলবে গোরা ইস্কুল থেকে বেরিয়েছে! ওর বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক সেই রকমই আছে।

গোরা কহিল,—দৈবাৎ আমার টাকা আছে বন্ধু আছে বলেই হাজত আর হাতকড়ি থেকে আমি খালাস পাব সে আমি চাইনে। আমাদের দেশের যে ধর্ম্মনীতি তাতে আমরা জানি সুবিচার করার গরজ রাজার; প্রজার প্রতি অবিচার রাজারই অধর্ম্ম। কিন্তু এ রাজ্যে উকীলের কড়ি না জোগাতে পেরে প্রজা যদি হাজতে পচে জেলে মরে, রাজা মাথার উপরে থাক্‌তে ন্যায় বিচার পয়সা দিয়ে কিন্‌তে যদি সর্ব্বস্বান্ত হতে হয় তবে এমন বিচারের জন্যে আমি সিকি পয়সা খরচ করতে চাইনে। *

সাতকড়ি কহিল,—কাজির আমলে যে ঘুষ দিতেই মাথা বিকিয়ে যেত।

গোরা কহিল—ঘুষ দেওয়া ত রাজার বিধান ছিল না যে কাজি মন্দ

ছিল সে ঘুষ নিত এ আমলেও সেটা আছে। কিন্তু এখন রাজদ্বারে বিচারের জন্যে দাঁড়াতে গেলেই বাদী হোক্ প্রতিবাদী হোক্ দোষী হোক্ নির্দ্দোষ হোক্ প্রজাকে চোখের জল ফেলতেই হবে। যে পক্ষ নির্ধন, বিচারের লড়াইয়ে জিত হার দুই তার পক্ষে সর্ব্বনাশ। তারপরে রাজা যখন বাদী আর আমার মত লোক প্রতিবাদী তখন তাঁর পক্ষেই উকীল ব্যারিষ্টার—আর আমি যদি জোটাতে পারলুম ত ভাল নইলে অদৃষ্টে যা থাকে! বিচারে যদি উকীলের সাহায্যের প্রয়োজন না থাকে তবে সরকারী উকীল আছে কেন? যদি প্রয়োজন থাকে ত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ কেন নিজের উকীল নিজে জোটাতে বাধ্য হবে? এ কি প্রজার সঙ্গে শত্রুতা? এ কি রকমের রাজধর্ম্ম?

সাতকড়ি কহিল,—ভাই, চট কেন? সিভিলিজেশন্ সস্তা জিনিষ নয়। সূক্ষ্ম বিচার করতে গেলে সূক্ষ্ম আইন করতে হয়—সূক্ষ্ম আইন করতে গেলেই আইনের ব্যবসায়ী না হলে কাজ চলেই না, ব্যবসা চালাতে গেলেই কেনাবেচা এসে পড়ে—অতএব সভ্যতার আদালত আপনিই বিচার কেনাবেচার হাট হয়ে উঠ্‌বেই—যার টাকা নেই তার ঠকবার সম্ভাবনা থাক্‌বেই। তুমি রাজা হলে কি করতে বল দেখি?

গোরা কহিল,—যদি এমন আইন করতুম যে হাজার দেড় হাজার টাকা বেতনের বিচারকের বুদ্ধিতেও তার রহস্য ভেদ হওয়া সম্ভব হত না তাহলে হতভাগা বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের জন্য উকীল সরকারী খরচে নিযুক্ত করে দিতুম। বিচার ভাল হওয়ার খরচা প্রজার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সুবিচারের গৌরব করে পাঠান-মোগলদের গাল দিতুম না।

সাতকড়ি কহিল,—বেশ কথা, সে শুভদিন যখন আসেনি—তুমি যখন রাজা হওনি—সম্প্রতি তুমি যখন সভ্য রাজার আদালতের আসামী তখন তোমাকে হয় গাঁঠের কড়ি খরচ করতে হবে, নয় উকীল বন্ধুর শরণাপন্ন হতে হবে, নয় ত তৃতীয় গতিটা সদ্গতি হবে না।

গোরা জেদ করিয়া কহিল,—কোন চেষ্টা না করে যে গতি হতে পারে আমার সেই গতি হোক্। এরাজ্যে সম্পূর্ণ নিরুপায়ের যে গতি আমারো সেই গতি।

বিনয় অনেক অনুনয় করিল কিন্তু গোরা তাহাতে কর্ণপাতমাত্র করিল না। সে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি হঠাৎ এখানে কি করে উপস্থিত হলে?

বিনয়ের মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল। গোরা যদি আজ হাজতে না থাকিত তবে বিনয় হয় ত কিছু বিদ্রোহের স্বরেই তাহার এখানে উপস্থিতির কারণটা বলিয়া দিত। আজ স্পষ্ট উত্তরটা তাহার মুখে বাধিয়া গেল—কহিল আমার কথা পরে হবে—এখন তোমার—

গোরা কহিল,—আমি ত আজ রাজার অতিথি। আমার জন্যে রাজা স্বয়ং ভাবচেন তোমাদের আর কারো ভাবতে হবে না।

বিনয় জানিত গোরাকে টলানো সম্ভব নয়—অতএব উকীল রাখার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইল। বলিল—তুমি ত খেতে এখানে পারবে না জানি, বাইরে থেকে কিছু খাবার পাঠাবার জোগাড় করে দিই।

গোরা অধীর হইয়া কহিল,—বিনয়, কেন তুমি বৃথা চেষ্টা করচ। বাইরে থেকে আমি কিছুই চাইনে। হাজতে সকলের ভাগ্যে যা জোটে আমি তার চেয়ে কিছু বেশি চাইনে।

বিনয় ব্যথিত চিত্তে ডাকবাংলায় ফিরিয়া আসিল। সুচরিতা রাস্তার দিকের একটা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া জানলা খুলিয়া বিনয়ের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। কোনোমতেই অন্য সকলের সঙ্গ এবং আলাপ সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

সুচরিতা যখন দেখিল বিনয় চিন্তিত বিমর্ষমুখে ডাকবাংলার অভিমুখে আসিতেছে তখন আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। বহু চেষ্টায় সে নিজেকে শান্ত করিয়া একটা বই হাতে করিয়া

এ ঘরে আসিয়া বসিল। ললিতা শেলাই ভালবাসে না কিন্তু সে আজ চুপ করিয়া কোণে বসিয়া শেলাই করিতেছিল—লাবণ্য সুধীরকে লইয়া ইংরেজি বানানের খেলা খেলিতেছিল, লীলা ছিল দর্শক; হারান বাবু বরদাসুন্দরীর সঙ্গে আগামী কল্যকার উৎসবের কথা আলোচনা করিতেছিলেন।

আজ প্রাতঃকালে পুলিসের সঙ্গে গোরার বিরোধের ইতিহাস বিনয় সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিল। সুচরিতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—ললিতার কোল হইতে শেলাই পড়িয়া গেল এবং তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

বরদাসুন্দরী কহিলেন—আপনি কিছু ভাব্‌বেন না বিনয় বাবু—আজ সন্ধ্যা বেলায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেমের কাছে গৌরমোহন বাবুর জন্যে আমি নিজে অনুরোধ করব।

বিনয় কহিল,—না, আপনি তা করবেন না—গোরা যদি শুন্‌তে পায় তাহলে জীবনে সে আমাকে আর ক্ষমা করবে না।

সুধীর কহিল,—তাঁর ডিফেন্সের জন্য ত কোনো বন্দোবস্ত করতে হবে।

জামিন দিয়া খালাসের চেষ্টা এবং উকীল নিয়োগ সম্বন্ধে গোরা যে সকল আপত্তি করিয়াছিল বিনয় তাহা সমস্তই বলিল—শুনিয়া হারান বাবু অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন,—এ সমস্ত বাড়াবাড়ি!

হারান বাবুর প্রতি ললিতার মনের ভাব যাই থাক্ সে এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে মান্য করিয়া আসিয়াছে, কখনো তাঁহার সঙ্গে তর্কে যোগ দেয় নাই,—আজ সে তীব্রভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি নয়—গৌর বাবু যা করেছেন সে ঠিক করেচেন—ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের জব্দ করবে আর আমরা নিজেরা নিজেকে রক্ষা করব! তাদের মোটা মাইনে জোগাবার জন্যে ট্যাক্স জোগাতে হবে, আবার তাদের হাত

থেকে পরিত্রাণ পেতে উকীল ফি গাঁঠ থেকে দিতে হবে! এমন বিচার পাওয়ার চেয়ে জেলে যাওয়া ভাল।

ললিতাকে হারান বাবু এতটুকু দেখিয়াছেন—তাহার যে একটা মতামত আছে সে কথা তিনি কোনোদিন কল্পনাও করেন নাই। সেই ললিতার মুখের তীব্র ভাষা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—তাহাকে ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন,—তুমি এ সব কথার কি বোঝ? যারা গোটাকত বই মুখস্থ করে পাস করে সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে, যাদের কোনো ধর্ম্ম নেই ধারণা নেই, তাদের মুখ থেকে দায়িত্বহীন উন্মত্ত প্রলাপ শুনে তোমাদের মাথা ঘুরে যায়!—এই বলিয়া গত কল্য সন্ধ্যার সময় গোরার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ-বিবরণ এবং সে সম্বন্ধে হারান বাবুর সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের আলাপের কথা বিবৃত করিলেন। চর ঘোষপুরের ব্যাপার বিনয়ের জানা ছিল না; শুনিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল—বুঝিল ম্যাজিষ্ট্রেট গোরাকে সহজে ক্ষমা করিবে না।

হারান যে উদ্দেশ্যে এই গল্পটা বলিলেন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি যে গোরার সহিত তাঁহার দেখা হওয়া সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে নীরব ছিলেন তাহার ভিতরকার ক্ষুদ্রতা সুচরিতাকে আঘাত করিল এবং হারান বাবুর প্রত্যেক কথার মধ্যে গোরার প্রতি যে একটা ব্যক্তিগত ঈর্ষা প্রকাশ পাইল তাহাতে গোরার এই বিপদের দিনে তাঁহার প্রতি উপস্থিত প্রত্যেকেরই একটা অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিল। সুচরিতা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল; কি একটা বলিবার জন্য তাহার আবেগ উপস্থিত হইল, কিন্তু সেটা সম্বরণ করিয়া সে বই খুলিয়া কম্পিত হস্তে পাতা উল্টাইতে লাগিল। ললিতা উদ্ধতভাবে কহিল,—ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত হারান বাবুর মতের যতই মিল থাক্, ঘোষপুরের ব্যাপারে গৌরমোহন বাবুর মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

৩০

আজ ছোটলাট আসিবেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঠিক সাড়ে দশটায় আদালতে আসিয়া বিচারকার্য্য সকাল সকাল শেষ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন।

সাতকড়ি বাবু ইস্কুলের ছাত্রদের পক্ষ লইয়া সেই উপলক্ষে তাঁহার বন্ধুকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি গতিক দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, অপরাধ স্বীকার করাই এ স্থলে ভাল চাল। ছেলেরা দুরন্ত হইয়াই থাকে, তাহারা অর্ব্বাচীন নির্ব্বোধ ইত্যাদি বলিয়া তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ছাত্রদিগকে জেলে লইয়া গিয়া বয়স ও অপরাধের তারতম্য অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশ বেতের আদেশ করিয়া দিলেন। গোরার উকীল কেহ ছিল না। সে নিজের মামলা নিজে চালাইবার উপলক্ষে পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন ও পুলিসের কর্ম্মে বাধা দেওয়া অপরাধে তাহাকে একমাস সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন এবং এইরূপ লঘু দণ্ডকে বিশেষ দয়া বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন।

সুধীর ও বিনয় আদালতে উপস্থিত ছিল। বিনয় গোরার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। তাহার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, সে তাড়াতাড়ি আদালত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সুধীর তাহাকে ডাকবাংলায় ফিরিয়া গিয়া স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিল—সে শুনিল না—মাঠের রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। সুধীরকে কহিল—তুমি বাংলায় ফিরে যাও কিছুক্ষণ পরে আমি যাব। সুধীর চলিয়া গেল।

এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতে পারিল না।

সূর্য্য মাথার উপর হইতে পশ্চিমের দিকে যখন হেলিয়াছে তখন একটা গাড়ি ঠিক তাহার সম্মুখে আসিয়া থামিল। বিনয় মুখ তুলিয়া দেখিল সুধীর ও সুচরিতা গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার কাছে আসিতেছে। বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। সুচরিতা কাছে আসিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে কহিলেন,—বিনয় বাবু আসুন!

বিনয়ের হঠাৎ চৈতন্য হইল যে এই দৃশ্যে রাস্তার লোকে কৌতুক অনুভব করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। সমস্ত পথ কেহ কিছুই কথা কহিতে পারিল না।

ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া বিনয় দেখিল সেখানে একটা লড়াই চলিতেছে। ললিতা বাঁকিয়া বসিয়াছে সে কোনোমতেই আজ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণে যোগ দিবে না। বরদাসুন্দরী বিষম সঙ্কটে পড়িয়া গিয়াছেন—হারান বাবু ললিতার মত বালিকার এই অসঙ্গত বিদ্রোহে ক্রোধে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বারবার বলিতেছেন আজকালের ছেলে মেয়েদের এ কিরূপ বিকার ঘটিয়াছে—তাহারা 'ডিসিপ্লিন্' মানিতে চাহে না। কেবল যে-সে লোকের সংসর্গে যাহা-তাহা আলোচনা করিয়াই এইরূপ ঘটিতেছে!

বিনয় আসিতেই ললিতা কহিল,—বিনয় বাবু, আমাকে মাপ করুন। আমি আপনার কাছে ভারি অপরাধ করেছি, আপনি তখন যা বলেছিলেন আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি;—আমরা বাইরের অবস্থা কিছুই জানিনে বলেই এত ভুল বুঝি! পানুবাবু বলেন ভারতবর্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের এই শাসন বিধাতার বিধান—তা যদি হয় তবে এই শাসনকে সমস্ত কায়-মনোবাক্যে অভিশাপ দেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দেওয়াও সেই বিধাতারই বিধান!

হারান বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—ললিতা, তুমি—

ললিতা হারান বাবুর দিক হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—চুপ

করুন! আপনাকে আমি কিছু বলচিনে! বিনয় বাবু, আপনি কারো অনুরোধ রাখ্‌বেন না! আজ কোনোমতেই অভিনয় হতেই পারে না!

বরদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি ললিতার কথা চাপা দিয়া কহিলেন,—ললিতা, তুই ত আচ্ছা মেয়ে দেখ্‌চি! বিনয় বাবুকে আজ স্নান করতে খেতে দিবিনে? বেলা দেড়টা বেজে গেছে তা জানিস্? দেখ্‌দেখি ওঁর মুখ শুকিয়ে কি রকম চেহারা হয়ে গেছে।

বিনয় কহিল,—এখানে আমরা সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের অতিথি—এবাড়িতে আমি স্নানাহার করতে পারব না।

বরদাসুন্দরী বিনয়কে বিস্তর মিনতি করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। মেয়েরা সকলেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি রাগিয়া বলিলেন,—তোদের সব হল কি? সুচি, তুমি বিনয় বাবুকে একটু বুঝিয়ে বল না! আমরা কথা দিয়েছি—লোকজন সব ডাকা হয়েছে, আজকের দিনটা কোনোমতে কাটিয়ে যেতে হবে—নইলে ওরা কি মনে করবে বল দেখি? আর যে ওদের সাম্‌নে মুখ দেখাতে পারব না।

সুচরিতা চুপ করিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

বিনয় অদূরে নদীতে ষ্টীমারে চলিয়া গেল। এই ষ্টীমার আজ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই যাত্রী লইয়া কলিকাতা রওনা হইবে—আগামী কাল আটটা আন্দাজ সময়ে সেখানে পৌঁছিবে।

হারান বাবু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বিনয় ও গোরাকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। সুচরিতা তাড়াতাড়ি চৌকি হইতে উঠিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া বেগে দ্বার ভেজাইয়া দিল। একটু পরেই ললিতা দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সুচরিতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বিছানার উপর পড়িয়া আছে।

ললিতা ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সুচরিতার পাশে বসিয়া তাহার মাথায় চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সুচরিতা যখন শান্ত হইল তখন জোর করিয়া তাহার মুখ হইতে বাহুর আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল,—দিদি, আমরা এখান থেকে কলকাতায় ফিরে যাই, আজ ত ম্যাজিষ্ট্রেটের ওখানে যেতে পারব না।

সুচরিতা অনেকক্ষণ এ কথার কোনো উত্তর করিল না। ললিতা যখন বারবার বলিতে লাগিল তখন সে বিছানায় উঠিয়া বসিল—সে কি করে হবে ভাই? আমার ত একেবারেই আসবার ইচ্ছা ছিল না—বাবা যখন পাঠিয়ে দিয়েছেন তখন, যে জন্যে এসেছি তা না সেরে যেতে পারব না।

ললিতা কহিল,—বাবা ত এসব কথা জানেন না—জানলে কখনই আমাদের থাকতে বলতেন না।

সুচরিতা কহিল,—তা কি করে জানব ভাই!

ললিতা। দিদি,তুই পারবি? কি করে যাবি বল্ দেখি? তার পরে আবার সাজগোজ করে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে কবিতা আওড়াতে হবে! আমার ত জিভ ফেটে গিয়ে রক্ত পড়বে তবু কথা বের হবে না!

সুচরিতা কহিল,—সে ত জানি বোন্! কিন্তু নরকযন্ত্রণাও সইতে হয়। এখন আর কোনো উপায় নেই! আজকের দিন জীবনে আর কখনো ভুল্‌তে পারব না।

সুচরিতার এই বাধ্যতায় ললিতা রাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। মাকে আসিয়া কহিল,—মা তোমরা যাবে না?

বরদাসুন্দরী কহিলেন,—তুই কি পাগল হয়েছিস্? রাত্তির নটার পর যেতে হবে।

ললিতা কহিল,—আমি কলকাতায় যাবার কথা বলচি।

বরদাসুন্দরী। শোন একবার মেয়ের কথা শোন!

ললিতা সুধীরকে কহিল—সুধীর-দা, তুমিও এখানে থাক্‌বে?

গোরার শাস্তি সুধীরের মনকে বিকল করিয়া দিয়াছিল কিন্তু বড় বড়

সাহেবের সম্মুখে নিজের বিদ্যা প্রকাশ করিবার প্রলোভন সে ত্যাগ করিতে পারে এমন সাধ্য তাহার ছিল না। সে অব্যক্তস্বরে কি একটা বলিল—বোঝা গেল সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে কিন্তু সে থাকিয়াই যাইবে।

বরদাসুন্দরী কহিলেন,—গোলমালে বেলা হয়ে গেল। আর দেরি করলে চল্‌বে না। এখন সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত বিছানা থেকে কেউ উঠ্‌তে পারবে না—বিশ্রাম করতে হবে। নইলে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে মুখ শুকিয়ে যাবে—দেখ্‌তে বিশ্রী হবে।

এই বলিয়া তিনি জোর করিয়া সকলকে শয়নঘরে পূরিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন। সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল কেবল সুচরিতার ঘুম হইল না এবং অন্য ঘরে ললিতা তাহার বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

ষ্টীমারে ঘন ঘন বাঁশি বাজিতে লাগিল।

ষ্টীমার যখন ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে, খালাসীরা সিঁড়ি তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এমন সময় জাহাজের ডেকের উপর হইতে বিনয় দেখিল একজন ভদ্রস্ত্রীলোক জাহাজের অভিমুখে দ্রুতপদে আসিতেছে। তাহার বেশভূষা প্রভৃতি দেখিয়া তাহাকে ললিতা বলিয়াই মনে হইল কিন্তু বিনয় সহসা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে ললিতা নিকটে আসিতে আর সন্দেহ রহিল না। একবার মনে করিল ললিতা তাহাকে ফিরাইতে আসিয়াছে কিন্তু ললিতাই ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। ললিতা ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িল—খাল্লাসী সিঁড়ি তুলিয়া লইল। বিনয় শঙ্কিতচিত্তে উপরের ডেক হইতে নীচে নামিয়া ললিতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ললিতা কহিল,—আমাকে উপরে নিয়ে চলুন।

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল,—জাহাজ যে ছেড়ে দিচ্ছে!

ললিতা কহিল,—সে আমি জানি। বলিয়া বিনয়ের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সম্মুখের সিঁড়ি বাহিয়া উপরের তলায় উঠিয়া গেল।

ষ্টীমার বাঁশি ফুঁকিতে ফুঁকিতে ছাড়িয়া দিল।

বিনয় ললিতাকে ফাষ্টক্লাসের ডেকে কেদারায় বসাইয়া নীরব প্রশ্নে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

ললিতা কহিল,—আমি কলকাতায় যাব—আমি কিছুতেই থাক্‌তে পারলুম না।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—ওঁরা সকলে?

ললিতা কহিল,—এখনো পর্য্যন্ত কেউ জানেন না। আমি চিঠি রেখে এসেছি—পড়লেই জানতে পারবেন।

ললিতার এই দুঃসাহসিকতায় বিনয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সঙ্কোচের সহিত বলিতে আরম্ভ করিল—কিন্তু—

ললিতা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল,—জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে এখন আর 'কিন্তু' নিয়ে কি হবে! মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই যে সমস্তই চুপ করে সহ্য করতে হবে সে আমি বুঝিনে। আমাদের পক্ষেও ন্যায় অন্যায় সম্ভব অসম্ভব আছে। আজকের নিমন্ত্রণে গিয়ে অভিনয় করার চেয়ে আত্মহত্যা করা আমার পক্ষে সহজ।

বিনয় বুঝিল, যা হইবার তা হইয়া গেছে, এখন এ কাজের ভালমন্দ বিচার করিয়া মনকে পীড়িত করিয়া তোলায় কোনো ফল নাই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতা কহিল,—দেখুন আপনার বন্ধু গৌরমোহন বাবুর প্রতি আমি মনে মনে বড় অবিচার করেছিলুম। জানিনে, প্রথম থেকেই কেন তাঁকে দেখে তাঁর কথা শুনে আমার মনটা তাঁর বিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বড় বেশি জোর দিয়ে কথা কইতেন, আর আপনারা সকলেই তাতে যেন সায় দিয়ে যেতেন—তাই দেখে আমার একটা রাগ হতে থাকৃত। আমার স্বভাবই ঐ—আমি যদি দেখি কেউ কথায় বা ব্যবহারে জোর প্রকাশ করচে সে আমি একেবারেই সইতে পারিনে। কিন্তু গৌরমোহন বাবুর জোর কেবল পরের উপরে

নয় সে তিনি নিজের উপরেও খাটান্—এ সত্যিকার জোর—এরকম মানুষ আমি দেখিনি।

এমনি করিয়া ললিতা বকিয়া যাইতে লাগিল। কেবল যে গোরা সম্বন্ধে সে অনুতাপ বোধ করিতেছিল বলিয়াই এ সকল কথা বলিতেছিল তাহা নহে; আসলে, ঝোঁকের মাথায় যে কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে তাহার সঙ্কোচ মনের ভিতর হইতে কেবলি মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছিল;—কাজটা হয়ত ভাল হয় নাই এই দ্বিধা জোর করিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল; বিনয়ের সম্মুখে ষ্টীমারে এইরূপ একলা বসিয়া থাকা যে এত বড় কুণ্ঠার বিষয় তাহা সে পূর্ব্বে মনেও করিতে পারে নাই; কিন্তু লজ্জা প্রকাশ হইলেই জিনিষটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিবে এইজন্য সে প্রাণপণে বকিয়া যাইতে লাগিল। বিনয়ের মুখে ভাল করিয়া কথা জোগাইতেছিল না। এদিকে গোরার দুঃখ ও অপমান, অন্যদিকে সে যে এখানে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ি আমোদ করিতে আসিয়াছিল তাহার লজ্জা, তাহার উপরে ললিতার সম্বন্ধে তাহার এই অকস্মাৎ অবস্থাসঙ্কট, সমস্ত একত্র মিশ্রিত হইয়া বিনয়কে বাক্যহীন করিয়া দিয়াছিল।

পূর্ব্বে হইলে ললিতার এই দুঃসাহসিকতায় বিনয়ের মনে তিরস্কারের ভাব উদয় হইত—আজ তাহা কোনো মতেই হইল না। এমন কি, তাহার মনে যে বিস্ময়ের উদয় হইয়াছিল তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ছিল—ইহাতে আরো একটি আনন্দ এই ছিল তাহাদের সমস্ত দলের মধ্যে গোরার অপমানের সামান্য প্রতিকারচেষ্টা কেবল বিনয় এবং ললিতাই করিয়াছে। এজন্য বিনয়কে বিশেষ কিছু দুঃখ পাইতে হইবে না, কিন্তু ললিতাকে নিজের কর্ম্মফলে অনেক দিন ধরিয়া বিস্তর পীড়া ভোগ করিতে হইবে। অথচ এই ললিতাকে বিনয় বরাবর গোরার বিরুদ্ধ বলিয়াই জানিত। যতই ভাবিতে লাগিল ততই ললিতার এই পরিণাম-বিচার-হীন সাহসে এবং অন্যায়ের প্রতি একান্ত ঘৃণায় তাহার প্রতি বিনয়ের ভক্তি জন্মিতে

লাগিল। কেমন করিয়া কি বলিয়া যে সে এই ভক্তি প্রকাশ করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। বিনয় বারবার ভাবিতে লাগিল ললিতা যে তাহাকে এত পরমুখাপেক্ষী সাহসহীন বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছে সে ঘৃণা যথার্থ। সে ত সমস্ত আত্মীয় বন্ধুর নিন্দা প্রশংসা সবলে উপেক্ষা করিয়া এমন করিয়া কোনো বিষয়েই সাহসিক আচরণের দ্বারা নিজের মত প্রকাশ করিতে পারিত না। সে যে অনেক সময়েই গোরাকে কষ্ট দিবার ভয়ে অথবা পাছে গোরা তাহাকে দুর্ব্বল মনে করে এই আশঙ্কায় নিজের স্বভাবের অনুসরণ করে নাই—অনেক সময় সূক্ষ্ম যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া গোরার মতকে নিজের মত বলিয়াই নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে আজ তাহা মনে মনে স্বীকার করিয়া ললিতাকে স্বাধীন বুদ্ধি-শক্তিগুণে নিজের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিল। ললিতাকে সে যে পূর্ব্বে অনেকবার মনে মনে নিন্দা করিয়াছে সে কথা স্মরণ করিয়া তাহার লজ্জা বোধ হইল—এমন কি, ললিতার কাছে তাহার ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা করিল—কিন্তু কেমন করিয়া ক্ষমা চাহিবে ভাবিয়া পাইল না। ললিতার কমনীয় স্ত্রীমূর্ত্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে, নারীর এই অপূর্ব্ব পরিচয়ে বিনয় নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল।

৩১

ললিতাকে সঙ্গে লইয়া বিনয় পরেশ বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ললিতার সম্বন্ধে বিনয়ের মনের ভাবটা কি তাহা ষ্টীমারে উঠিবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত বিনয় নিশ্চিত জানিত না। ললিতার সঙ্গে বিরোধেই তাহার মন ব্যাপৃত ছিল। কেমন করিয়া এই দুর্বশ মেয়েটির সঙ্গে কোনোমতে সন্ধিস্থাপন হইতে পারে কিছুকাল হইতে ইহাই তাহার প্রায় প্রতিদিনের

চিন্তার বিষয় ছিল। বিনয়ের জীবনে স্ত্রীমাধুর্য্যের নির্ম্মল দীপ্তি লইয়া সুচরিতাই প্রথম সন্ধ্যাতারাটির মত উদিত হইয়াছিল। এই আবির্ভাবের অপরূপ আনন্দে বিনয়ের প্রকৃতিকে পরিপূর্ণতা দান করিয়া আছে ইহাই বিনয় মনে মনে জানিত। কিন্তু ইতিমধ্যে আরো যে তারা উঠিয়াছে এবং জ্যোতিরুৎসবের ভূমিকা করিয়া দিয়া প্রথম তারাটি যে কখন্ ধীরে ধীরে দিগন্তরালে অবতরণ করিতেছিল বিনয় তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

বিদ্রোহী ললিতা যে দিন ষ্টীমারে উঠিয়া আসিল সেদিন বিনয়ের মনে হইল ললিতা এবং আমি একপক্ষ হইয়া সমস্ত সংসারের প্রতিকূলে যেন খাড়া হইয়াছি। এই ঘটনায় ললিতা আর সকলকে ছাড়িয়া তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একথা বিনয় কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। যে-কোনো কারণে, যে-কোনো উপলক্ষেই হউক্, ললিতার পক্ষে বিনয় আজ অনেকের মধ্যে একজন মাত্র নহে—ললিতার পার্শ্বে সেই একাকী—সেই একমাত্র; সমস্ত আত্মীয়স্বজন দূরে, সেই নিকটে। এই নৈকট্যের পুলকপূর্ণ স্পন্দন বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত তাহার বুকের মধ্যে গুরু গুরু করিতে লাগিল। প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনে ললিতা যখন ঘুমাইতে গেল তখন বিনয় তাহার স্বস্থানে শুইতে যাইতে পারিল না—সেই ক্যাবিনের বাহিরে ডেকে সে জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ষ্টীমারে ললিতার প্রতি কোনো উৎপাত ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু বিনয় তাহার অকস্মাৎ নূতনলব্ধ অধিকারটিকে পূরা অনুভব করিবার প্রলোভনে অপ্রয়োজনেও না খাটাইয়া থাকিতে পারিল না।

রাত্রি গভীর অন্ধকারময়, মেঘশূন্য নভস্তল তারায় আচ্ছন্ন, তীরে তরুশ্রেণী নিশীথ আকাশের কালিমাঘন নিবিড় ভিত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নিম্নে প্রশস্ত নদীর প্রবল ধারা নিঃশব্দে চলিয়াছে

ইহার মাঝখানে ললিতা নিদ্রিত। আর কিছু নয়, এই সুন্দর, এই বিশ্বাসপূর্ণ নিদ্রাটুকুকেই ললিতা আজ বিনয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। এই নিদ্রাটুকুকে বিনয় মহামূল্য রত্নটির মত রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। পিতা মাতা ভাই ভগিনী কেহই নাই, একটি অপরিচিত শয্যার উপর ললিতা আপন সুন্দর দেহখানি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে—নিশ্বাসপ্রশ্বাস যেন এই নিদ্রাকাব্যটুকুর ছন্দ পরিমাপ করিয়া অতি শান্তভাবে গতায়াত করিতেছে, সেই নিপুণ কবরীর একটি বেণীও বিস্রস্ত হয় নাই, সেই নারীহৃদয়ের কল্যাণ-কোমলতায় মণ্ডিত হাত দুইখানি পরিপূর্ণ বিরামে বিছানার উপরে পড়িয়া আছে; কুসুম-সুকুমার দুইটি পদতল তাহার সমস্ত রমণীয় গতিচেষ্টাকে উৎসব-অবসানের সঙ্গীতের মত স্তব্ধ করিয়া বিছানার উপর মেলিয়া রাখিয়াছে—বিশ্রব্ধ বিশ্রামের এই ছবিখানি বিনয়ের কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল; শুক্তির মধ্যে মুক্তাটুকু যেমন, গ্রহতারামণ্ডিত নিঃশব্দতিমিরবেষ্টিত এই আকাশমণ্ডলের মাঝখানটিতে ললিতার এই নিদ্রাটুকু, এই সুডোল সুন্দর সম্পূর্ণ বিশ্রামটুকু জগতে তেম্‌নি একটিমাত্র ঐশ্বর্য্য বলিয়া আজ বিনয়ের কাছে প্রতিভাত হইল। আমি জাগিয়া আছি—আমি জাগিয়া আছি এই বাক্য বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষঃকুহর হইতে অভয় শঙ্খধ্বনির মত উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দ বাণীর সহিত মিলিত হইল।

এই কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে আরো একটা কথা কেবলি বিনয়কে আঘাত করিতেছিল—আজ রাত্রে গোরা জেলখানায়! আজ পর্য্যন্ত বিনয় গোরার সকল সুখ দুঃখেই ভাগ লইয়া আসিয়াছে, এইবার প্রথম তাহার অন্যথা ঘটিল। বিনয় জানিত গোরার মত মানুষের পক্ষে জেলের শাসন কিছুই নহে কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে গোরার কোনো যোগ ছিল না—গোরার জীবনের এই

একটা প্রধান ঘটনা একেবারেই বিনয়ের সংস্রব ছাড়া। দুই বন্ধুর জীবনের ধারা এই যে এক জায়গায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—আবার যখন মিলিবে তখন কি এই বিচ্ছেদের শূন্যতা পূরণ হইতে পারিবে? বন্ধুত্বের সম্পূর্ণতা কি এবার ভঙ্গ হয় নাই? জীবনের এমন অখণ্ড এমন দুর্লভ বন্ধুত্ব! আজ একই রাত্রে বিনয় তাহার এক দিকের শূন্যতা এবং আর একদিকের পূর্ণতাকে একসঙ্গে অনুভব করিয়া জীবনের সৃজনপ্রলয়ের সন্ধিকালে স্তব্ধ হইয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ঠিকা গাড়ি পরেশ বাবুর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নামিবার সময় ললিতার যে পা কাঁপিল এবং বাড়িতে প্রবেশ করিবার সময় সে যে জোর করিয়া নিজেকে একটু শক্ত করিয়া লইল তাহা বিনয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। ললিতা ঝোঁকের মাথায় এবার যে কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে তাহার অপরাধ যে কতখানি তাহার ওজন সে নিজে কিছুতেই আন্দাজ করিতে পারিতেছিল না। ললিতা জানিত পরেশ বাবু তাহাকে এমন কোনো কথাই বলিবেন না যাহাকে ঠিক ভৎর্সনা বলা যাইতে পারে—কিন্তু সেই জন্যই পরেশবাবুর চুপ করিয়া থাকাকেই সে সব চেয়ে ভয় করিত।

ললিতার এই সঙ্কোচের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিনয়, এরূপ স্থলে তাহার কি কর্ত্তব্য ঠিকটি ভাবিয়া পাইল না। সে সঙ্গে থাকিলে ললিতার সঙ্কোচের কারণ অধিক হইবে কি না তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে একটু দ্বিধার স্বরে ললিতাকে কহিল,—তবে এখন যাই।

ললিতা তাড়াতাড়ি কহিল,—না, চলুন, বাবার কাছে চলুন।

ললিতার এই ব্যগ্র অনুরোধে বিনয় মনে মনে আনন্দিত হইয়া উঠিল। বাড়িতে পৌছিয়া দিবার পর হইতে তাহার যে কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় নাই—এই একটা আকস্মিক ব্যাপারে ললিতার সঙ্গে তাহার জীবনের

যে একটা বিশেষ গ্রন্থি বন্ধন হইয়া গেছে—তাহাই মনে করিয়া বিনয় ললিতার পার্শ্বে যেন একটু বিশেষ জোরের সঙ্গে দাঁড়াইল। তাহার প্রতি ললিতার এই নির্ভর-কল্পনা যেন একটি স্পর্শের মত তাহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল ললিতা যেন তাহার ডান হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। ললিতার সহিত এই সম্বন্ধে তাহার পুরুষের বক্ষ ভরিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল পরেশ বাবু ললিতার এই অসামাজিক হঠকারিতায় রাগ করিবেন, ললিতাকে ভর্ৎসনা করিবেন, তখন বিনয় যথাসম্ভব সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইবে—ভর্ৎসনার অংশ অসঙ্কোচে গ্রহণ করিবে, বর্ম্মের স্বরূপ হইয়া ললিতাকে সমস্ত আঘাত হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু ললিতার ঠিক মনের ভাবটা বিনয় বুঝিতে পারে নাই। সে যে ভর্ৎসনার প্রতিরোধকস্বরূপেই বিনয়কে ছাড়িতে চাহিল না তাহা নহে। আসল কথা, ললিতা কিছুই চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। সে যাহা করিয়াছে তাহার সমস্ত অংশই পরেশবাবু চক্ষে দেখিবেন এবং বিচারে যে ফল হয় তাহার সমস্তটাই ললিতা গ্রহণ করিবে এইরূপ তাহার ভাব।

আজ সকাল হইতেই ললিতা বিনয়ের উপর মনে মনে রাগ করিয়া আছে। রাগটা যে অসঙ্গত তাহা সে সম্পূর্ণ জানে—কিন্তু অসঙ্গত বলিয়াই রাগটা কমে না বরং বাড়ে!

ষ্টীমারে যতক্ষণ ছিল ললিতার মনের ভাব অন্যরূপ ছিল। ছেলেবেলা হইতে সে কখনো রাগ করিয়া কখনো জেদ করিয়া একটা না একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইয়া আসিয়াছে কিন্তু এবারকার ব্যাপারটি গুরুতর। এই নিষিদ্ধ ব্যাপারে বিনয়ও তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়াতে সে একদিকে সঙ্কোচ এবং অন্যদিকে একটা নিগূঢ় হর্ষ অনুভব করিতেছিল। এই হর্ষ যেন নিষেধের সংঘাত দ্বারাই বেশি করিয়া মথিত হইয়া

উঠিতেছিল। একজন বাহিরের পুরুষকে সে আজ এমন করিয়া আশ্রয় করিয়াছে, তাহার এত কাছে আসিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে আত্মীয়-সমাজের কোনো আড়াল নাই, ইহাতে কতখানি কুণ্ঠার কারণ ছিল—কিন্তু বিনয়ের স্বাভাবিক ভদ্রতা এমনি সংযমের সহিত একটি আব্রু রচনা করিয়া রাখিয়াছিল যে এই আশঙ্কাজনক অবস্থার মাঝখানে বিনয়ের সুকুমার শীলতার পরিচয় ললিতাকে ভারি একটা আনন্দদান করিতেছিল। যে বিনয় তাহাদের বাড়িতে সকলের সঙ্গে সর্ব্বদা আমোদ কৌতুক করিত যাহার কথার বিরাম ছিল না, বাড়ির ভৃত্যদের সঙ্গেও যাহার আত্মীয়তা অবারিত এ সে বিনয় নহে। সতর্কতার দোহাই দিয়া যেখানে সে অনায়াসেই ললিতার সঙ্গ বেশি করিয়া লইতে পারিত সেখানে বিনয় এমন দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল যে তাহাতেই ললিতা হৃদয়ের মধ্যে তাহাকে আরো নিকটে অনুভব করিতেছিল। রাত্রে ষ্টীমারের ক্যাবিনে নানা চিন্তায় তাহার ভাল ঘুম হইতেছিল না ;—ছট্‌ফট্ করিতে করিতে এক সময় মনে হইল রাত্রি এতক্ষণে প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে ক্যাবিনের দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্রিশেষের শিশিরার্দ্র অন্ধকার তখনো নদীর উপরকার মুক্ত আকাশ এবং তীরের বনশ্রেণীকে জড়াইয়া রহিয়াছে—এইমাত্র একটি শীতল বাতাস উঠিয়া নদীর জলে কলধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং নীচের তলায় এঞ্জিনের খালাসীরা কাজ আরম্ভ করিবে এমনতর চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ললিতা ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়াই দেখিল অনতিদূরে বিনয় একটা গরম কাপড় গায়ে দিয়া বেতের চৌকির উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়াই ললিতার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি বিনয় ঐখানেই বসিয়া পাহারা দিয়াছে! এতই নিকটে, তবু এত দূরে! ডেক হইতে তখনি ললিতা কম্পিত পদে ক্যাবিনে আসিল ; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সেই হেমন্তের প্রত্যূষে সেই অন্ধকার-

জড়িত অপরিচিত নদীদৃশ্যের মধ্যে একাকী নিদ্রিত বিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল; সম্মুখের দিক্‌প্রান্তের তারাগুলি যেন বিনয়ের নিদ্রাকে বেষ্টন করিয়া তাহার চোখে পড়িল; একটি অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে তাহার সমস্ত হৃদয় একেবারে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে ললিতার দুই চক্ষু কেন যে জলে ভরিয়া আসিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার পিতার কাছে সে যে-দেবতার উপাসনা করিতে শিখিয়াছে সেই দেবতা যেন দক্ষিণ হস্তে তাহাকে আজ স্পর্শ করিলেন এবং এই নদীর উপরে এই তরুপল্লবনিবিড় নিদ্রিত তীরে রাত্রির অন্ধকারের সহিত নবীন আলোকের যখন প্রথম নিগূঢ় সম্মিলন ঘটিতেছে সেই পবিত্র সন্ধিক্ষণে পরিপূর্ণ নক্ষত্রসভায় কোন্ একটি দিব্য সঙ্গীত অনাহত মহাবীণায় দুঃসহ আনন্দ-বেদনার মত বাজিয়া উঠিল।

এমন সময় ঘুমের ঘোরে বিনয় হাতটা একটু নাড়িবামাত্রই ললিতা তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার হাত পায়ের তলদেশ শীতল হইয়া উঠিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য নিবৃত্ত করিতে পারিল না।

অন্ধকার দূর হইয়া গেল। ষ্টীমার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ললিতা মুখ হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া রেল ধরিয়া দাঁড়াইল। বিনয়ও পূর্ব্বেই জাহাজের বাঁশির আওয়াজে জাগিয়া প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্বতীরে প্রভাতের প্রথম অভ্যুদয় দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ললিতা বাহির হইয়া আসিবামাত্র সে সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই ললিতা ডাকিল—বিনয় বাবু!

বিনয় কাছে আসিতে ললিতা কহিল,—আপনার বোধ হয় রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।

বিনয় কহিল,—মন্দ হয়নি।

ইহার পরে দুইজনে আর কথা হইল না। শিশিরসিক্ত কাশবনের পরপ্রান্তে আসন্ন সূর্য্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইহারা দুইজনে জীবনে এমন প্রভাত আর কোনো দিন দেখে নাই। আলোক তাহাদিগকে এমন করিয়া কখনো স্পর্শ করে নাই—আকাশ যে শূন্য নহে, তাহা যে বিস্ময়নীরব আনন্দে সৃষ্টির দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছে তাহা ইহারা এই প্রথম জানিল। এই দুই জনের চিত্তে চৈতনা এমন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে যে, সমস্ত জগতের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের সঙ্গে আজ যেন তাহাদের একেবারে গায়েগায়ে ঠেকাঠেকি হইল। কেহ কোনো কথা কহিল না।

ষ্টীমার কলিকাতায় আসিল। বিনয় ঘাটে একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া ললিতাকে ভিতরে বসাইয়া নিজে গাড়োয়ানের পাশে গিয়া বসিল। এই দিনের বেলাকার কলিকাতার পথে গাড়ি করিয়া চলিতে চলিতে কেন যে ললিতার মনে উল্টা হাওয়া বহিতে লাগিল তাহা কে বলিবে! এই সঙ্কটের সময় বিনয় যে ষ্টীমারে ছিল, ললিতা যে বিনয়ের সঙ্গে এমন করিয়া জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, বিনয় যে অভিভাবকের মত তাহাকে গাড়ি করিয়া বাড়ি লইয়া যাইতেছে ইহার সমস্তই তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। ঘটনাবশত বিনয় যে তাহার উপরে একটা কর্ত্তৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছে ইহা তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। কেন এমন হইল! রাত্রের সেই সঙ্গীত দিনের কর্ম্মক্ষেত্রের সম্মুখে আসিয়া কেন এমন কঠোর সুরে থামিয়া গেল!

তাই দ্বারের কাছে আসিয়া বিনয় যখন সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল—আমি তবে যাই—তখন ললিতার রাগ আরো বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিল যে বিনয় বাবু মনে করিতেছেন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত হইতে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি। এ সম্বন্ধে তাহার মনে যে লেশমাত্র সঙ্কোচ নাই ইহাই বলের সহিত প্রমাণ করিবার এবং পিতার

নিকট সমস্ত জিনিষটাকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত করিবার জন্য সে বিনয়কে দ্বারের কাছ হইতে অপরাধীর ন্যায় বিদায় দিতে চাহিল না।

বিনয়ের সঙ্গে সম্বন্ধকে সে পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে চায়—মাঝখানে কোনো কুণ্ঠা, কোনো মোহের জড়িমা রাখিয়া সে নিজেকে বিনয়ের কাছে খাটো করিতে চায় না।

৩২

বিনয় ও ললিতাকে দেখিবামাত্র কোথা হইতে সতীশ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের দুইজনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া উভয়ের হাত ধরিয়া কহিল,—কৈ, বড় দিদি এলেন না?

বিনয় পকেট চাপড়াইয়া এবং চারিদিকে চাহিয়া কহিল,—বড় দিদি! তাই ত, কি হল! হারিয়ে গেছেন।

সতীশ বিনয়কে ঠেলা দিয়া কহিল,—ইস, তাই ত, কথ্‌খন না! বল না, ললিতা দিদি!

ললিতা কহিল,—বড় দিদি কাল আসবেন। বলিয়া পরেশবাবুর ঘরের দিকে চলিল।

সতীশ ললিতা ও বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল,—আমাদের বাড়ি কে এসেচেন দেখবে চল!

ললিতা হাত টানিয়া লইয়া কহিল,—তোর যে আসুক এখন বিরক্ত করিসনে। এখন বাবার কাছে যাচ্চি।

সতীশ কহিল,—বাবা বেরিয়ে গেছেন, তাঁর আসতে দেরি হবে!

শুনিয়া বিনয় এবং ললিতা উভয়েই ক্ষণকালের জন্য একটা আরাম বোধ করিল। ললিতা জিজ্ঞাসা করিল,—কে এসেচে?

সতীশ কহিল,—বলব না! আচ্ছা, বিনয় বাবু বলুন দেখি কে এসেচে! আপনি কথ্‌খনোই বল্‌তে পারবেন না। কথ্‌খনো না, কথ্‌খনো না!

বিনয় অত্যন্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত নাম করিতে লাগিল—কখনো বলিল, নবাব সিরাজউদ্দৌলা কখনো বলিল রাজা নবকৃষ্ণ, একবার নন্দকুমারেরও নাম করিল। এরূপ অতিথিসমাগম যে একেবারেই অসম্ভব সতীশ তাহারই অকাট্য কারণ দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ করিল—বিনয় হার মানিয়া নম্রস্বরে কহিল,—তা বটে, সিরাজউদ্দৌলার যে এবাড়ীতে আসার কতকগুলো গুরুতর অসুবিধা আছে সেকথা আমি এপর্য্যন্ত চিন্তা করে দেখিনি। যাহোক তোমার দিদি ত আগে তদন্ত করে আসুন তার পরে যদি প্রয়োজন হয় আমাকে ডাক দিলেই আমি যাব।

সতীশ কহিল,—না, আপনারা তুজনেই আসুন।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল,—কোন্ ঘরে যেতে হবে?

সতীশ কহিল,—তেতালার ঘরে।

তেতালার ছাদের কোণে একটি ছোট ঘর আছে, তাহার দক্ষিণের দিকে রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণের জন্য একটি ঢালু টালির ছাদ। সতীশের অনুবর্ত্তী তুইজনে সেখানে গিয়া দেখিল ছোট একটি আসন পাতিয়া সেই ছাদের নীচে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক চোকে চষমা দিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেছেন। তাঁহার চষমার একদিককার ভাঙা দণ্ডে দড়ি বাঁধা, সেই দড়ি তাঁহার কানে জড়ানো। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি হইবে। মাথার সাম্‌নের দিকে চুল বিরল হইয়া আসিয়াছে কিন্তু গৌরবর্ণ মুখ পরিপক্ক ফলটির মত এখনো প্রায় নিটোল রহিয়াছে;—তুই ভ্রূর মাঝে একটি উল্কীর দাগ—গায়ে অলঙ্কার নাই, বিধবার বেশ। প্রথমে ললিতার দিকে চোখ পড়িতেই তাড়াতাড়ি চষমা খুলিয়া বই ফেলিয়া রাখিয়া বিশেষ একটা ঔৎসুক্যের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; পরক্ষণেই তাহার পশ্চাতে বিনয়কে দেখিয়া দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম

করিলেন। সতীশ তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—মাসিমা পালাচ্চ কেন? এই আমাদের ললিতা দিদি, আর ইনি বিনয় বাবু। বড় দিদি কাল আসবেন। বিনয় বাবুর এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই যথেষ্ট হইল: ইতিপূর্ব্বেই বিনয়বাবু সম্বন্ধে আলোচনা যে প্রচুর পরিমাণে হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে সতীশের যে কয়টি বলিবার বিষয় জমিয়াছে কোনো উপলক্ষ পাইলেই তাহা সতীশ বলে এবং হাতে রাখিয়া বলে না।

মাসিমা বলিতে যে কাহাকে বুঝায় তাহা না বুঝিতে পারিয়া ললিতা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনয় এই প্রৌঢ়া রমণীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেই ললিতা তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

মাসিমা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে একটি মাদুর বাহির করিয়া পাতিয়া দিলেন এবং কহিলেন—বাবা বোস, মা বোস।

বিনয় ও ললিতা বসিলে পর তিনি তাঁহার আসনে বসিলেন এবং সতীশ তাঁহার গা ঘেঁসিয়া বসিল। তিনি সতীশকে ডান হাত দিয়া নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কহিলেন,—আমাকে তোমরা জান না, আমি সতীশের মাসী হই—সতীশের মা আমার আপন দিদি ছিলেন।

এইটুকু পরিচয়ের মধ্যে বেশি কিছু কথা ছিল না কিন্তু মাসিমার মুখে ও কণ্ঠস্বরে এমন একটি কি ছিল যাহাতে তাঁহার জীবনের সুগভীর শোকের অশ্রুমার্জ্জিত পবিত্র একটি আভাস প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আমি সতীশের মাসি হই বলিয়া তিনি যখন সতীশকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিলেন তখন এই রমণীর জীবনের ইতিহাস কিছুই না জানিয়াও বিনয়ের মন করুণায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। বিনয় বলিয়া উঠিল,—একলা সতীশের মাসিমা হলে চল্‌বে না; তা হলে এত দিন পরে সতীশের সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। একে ত সতীশ আমাকে বিনয় বাবু বলে, দাদা

বলে না, তার পরে মাসিমা থেকে বঞ্চিত করবে সে ত কোনো মতেই উচিত হবে না।

মন বশ করিতে বিনয়ের বিলম্ব হইত না। এই প্রিয়দর্শন প্রিয়ভাষী যুবক দেখিতে দেখিতে মাসিমার মনে সতীশের সঙ্গে দখল ভাগ করিয়া লইল।

মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাছা, তোমার মা কোথায়?

বিনয় কহিল,—আমার নিজের মাকে অনেক দিন হল হারিয়েছি কিন্তু আমার মা নেই এমন কথা আমি মুখে আন্‌তে পারব না।

এই বলিয়া আনন্দময়ীর কথা স্মরণ করিবামাত্র তাহার দুই চক্ষু যেন ভাবের বাষ্পে আর্দ্র হইয়া আসিল।

দুই পক্ষে কথা খুব জমিয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে আজ যে নূতন পরিচয় সে কথা কিছুতেই মনে হইল না। সতীশ এই কথাবার্ত্তার মাঝখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল এবং ললিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

চেষ্টা করিলেও ললিতা নিজেকে সহজে যেন বাহির করিতে পারে না। প্রথম পরিচয়ের বাধা ভাঙিতে তাহার অনেক সময় লাগে। তা ছাড়া, আজ তাহার মন ভাল ছিল না। বিনয় যে অনায়াসেই এই অপরিচিতার সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিল ইহা তাহার ভাল লাগিতেছিল না; ললিতার যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে বিনয় তাহার গুরুত্ব মনের মধ্যে গ্রহণ না করিয়া যে এমন নিরুদ্বিগ্ন হইয়া আছে ইহাতে বিনয়কে লঘুচিত্ত বলিয়া সে মনে মনে অপবাদ দিল। কিন্তু মুখ গম্ভীর করিয়া বিষণ্ণভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকিলেই বিনয় যে ললিতার অসন্তোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইত তাহা নহে;—তাহা হইলে নিশ্চয় ললিতা রাগিয়া মনে মনে এই কথা বলিত আমার সঙ্গেই বাবার বোঝাপাড়া, কিন্তু বিনয়বাবু এমন ভাব ধারণ করিতেছেন কেন, যেন উঁহার ঘাড়েই এই দায় পড়িয়াছে। আসল

কথা, কাল রাত্রে যে আঘাতে সঙ্গীত বাজিয়াছিল, আজ দিনের বেলায় তাহাতে ব্যথাই বাজিতেছে—কিছুই ঠিকমত হইতেছে না। আজ তাই ললিতা প্রতিপদে বিনয়ের সঙ্গে মনে মনে ঝগড়াই করিতেছে; বিনয়ের কোনো ব্যবহারেই এ ঝগড়া মিটিতে পারিত না—কোন্ মূলে সংশোধন হইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

হায় রে, হৃদয় লইয়াই যাহাদের কারবার সেই মেয়েদের ব্যবহারকে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া দোষ দিলে চলিবে কেন? যদি গোড়ায় ঠিক জায়গাটিতে ইহার প্রতিষ্ঠা থাকে তবে হৃদয় এম্‌নি সহজে এম্‌নি সুন্দর চলে যে যুক্তিতর্ক হার মানিয়া মাথা হেঁট করিয়া থাকে কিন্তু সেই গোড়ায় যদি লেশমাত্র বিপর্য্যয় ঘটে তবে বুদ্ধির সাধ্য কি যে কল ঠিক করিয়া দেয়—তখন রাগবিরাগ হাসিকান্না, কি হইতে যে কি ঘটে তাহার হিসাব তলব করিতে যাওয়াই বৃথা।

দেরি হইতে চলিল। পরেশ বাবু এখনো ত আসিলেন না। উঠিবার জন্য ভিতর হইতে তাগিদ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল—তাহাকে কোনো মতে চাপা দিবার জন্য বিনয় সতীশের মাসির সঙ্গে একান্তমনে আলাপ করিতে থাকিল। অবশেষে ললিতার বিরক্তি আর বাঁধ মানিল না; সে বিনয়ের কথার মাঝখানে সহসা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—আপনি দেরি করচেন কার জন্যে? বাবা কখন্ আস্‌বেন তার ঠিক নেই। আপনি গৌর বাবুর মার কাছে একবার যাবেন না?

বিনয় চমকিয়া উঠিল। ললিতার বিরক্তিস্বর বিনয়ের পক্ষে সুপরিচিত ছিল। সে ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া একমুহূর্ত্তে একেবারে উঠিয়া পড়িল—হঠাৎ গুণ ছিঁড়িয়া গেলে ধনুক যেমন সোজা হইয়া উঠে তেমনি করিয়া সে দাঁড়াইল। সে দেরি করিতেছিল কাহার জন্য? এখানে যে তাহার কোনো একান্ত প্রয়োজন ছিল এমন অহঙ্কার ত আপনা হইতে বিনয়ের মনে আসে নাই—সে ত দ্বারের নিকট হইতেই বিদায় হইতেছিল

—ললিতাই ত তাহাকে অনুরোধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিল—অবশেষে ললিতার মুখে এই প্রশ্ন!

বিনয় এম্‌নি হঠাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল যে ললিতা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। দেখিল, বিনয়ের মুখের স্বাভাবিক সহাস্যতা একেবারে এক ফুৎকারে প্রদীপের আলোর মত সম্পূর্ণ নিবিয়া গেছে। বিনয়ের এমন ব্যথিত মুখ, তাহার ভাবের এমন অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন ললিতা আর কখনো দেখে নাই। বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়াই তীব্র অনুতাপের জ্বালাময় কষাঘাত তৎক্ষণাৎ ললিতার হৃদয়ের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে উপরি উপরি বাজিতে লাগিল।

সতীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিনয়ের হাত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া মিনতির স্বরে কহিল,—বিনয় বাবু, বসুন, এখনি যাবেন না! আমাদের বাড়িতে আজ খেয়ে যান্! মাসিমা, বিনয় বাবুকে খেতে বল না। ললিতা দিদি কেন বিনয় বাবুকে যেতে বল্লে!

বিনয় কহিল,—ভাই সতীশ, আজ না ভাই! মাসিমা যদি মনে রাখেন তবে আর একদিন এসে প্রসাদ খাব। আজ দেরি হয়ে গেছে।

কথাগুলো বিশেষ কিছু নয় কিন্তু কণ্ঠস্বরের মধ্যে অশ্রু আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাহার করুণা সতীশের মাসিমার কানেও বাজিল। তিনি একবার বিনয়ের ও একবার ললিতার মুখের দিকে চকিতের মত চাহিয়া লইলেন—বুঝিলেন অদৃষ্টের একটা লীলা চলিতেছে।

অনতিবিলম্বে কোনো ছুতা করিয়া ললিতা উঠিয়া তাহার ঘরে গেল। কত দিন সে নিজেকে নিজে এমন করিয়া কাঁদাইয়াছে।

৩৩

বিনয় তখনি আনন্দময়ীর বাড়ির দিকে চলিল। লজ্জায় বেদনায় মিশিয়া মনের মধ্যে ভারি একটা পীড়ন চলিতেছিল। এতক্ষণ কেন সে

মার কাছে যায় নাই! কি ভুলই করিয়াছিল! সে মনে করিয়াছিল তাহাকে ললিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে! সব প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া সে যে কলিকাতায় আসিয়াই আনন্দময়ীর কাছে ছুটিয়া যায় নাই সেজন্য ঈশ্বর তাহাকে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়াছেন! অবশেষে আজ ললিতার মুখ হইতে এমন প্রশ্ন শুনিতে হইল "গৌর বাবুর মার কাছে একবার যাবেন না?" কোনো এক মূহুর্ত্তেও এমন বিভ্রম ঘটিতে পারে যখন গৌর বাবুর মার কথা বিনয়ের চেয়ে ললিতার মনে বড় হইয়া উঠে! ললিতা তাঁহাকে গৌর বাবুর মা বলিয়া জানে মাত্র কিন্তু বিনয়ের কাছে তিনি যে জগতের সকল মায়ের একটি মাত্র প্রত্যক্ষ প্রতিমা।

তখন আনন্দময়ী সদ্য স্নান সারিয়া ঘরের মেঝেয় আসন পাতিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন;—বোধ করি বা মনে মনে জপ করিতেছিলেন; বিনয় তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল—মা।

আনন্দময়ী তাহার অবলুণ্ঠিত মাথায় দুই হাত বুলাইয়া কহিলেন,—বিনয়!

মার মত এমন কণ্ঠস্বর কার আছে! সেই কণ্ঠস্বরেই বিনয়ের সমস্ত শরীরে যেন করুণার স্পর্শ বহিয়া গেল। সে অশ্রুজল কণ্ঠে রোধ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, মা, আমার দেরি হয়ে গেছে!

আনন্দময়ী কহিলেন,—সব কথা শুনেছি বিনয়!

বিনয় চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল,—সব কথাই শুনেছ!

গোরা হাজত হইতেই তাঁহাকে পত্র লিখিয়া উকীল বাবুর হাত দিয়া পাঠাইয়াছিল। সে যে জেলে যাইবে সেকথা সে নিশ্চয় অনুমান করিয়াছিল।

পত্রের শেষে ছিল—"কারাবাসে তোমার গোরার লেশমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি একটু কষ্ট পাইলে চলিবে না। তোমার দুঃখই আমার দণ্ড, আমাকে আর কোনো দণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেটের দিবার

সাধ্য নাই। একা তোমার ছেলের কথা ভাবিও না মা, আরো অনেক মায়ের ছেলে বিনা দোষে জেল খাটিয়া থাকে, একবার তাহাদের কষ্টের সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে; এই ইচ্ছা এবার যদি পূর্ণ হয় তুমি আমার জন্য ক্ষোভ করিও না!

মা, তোমার মনে আছে কি না জানি না, সেবার দুর্ভিক্ষের বছরে আমার রাস্তার ধারের ঘরের টেবিলে আমার টাকার থলিটা রাখিয়া আমি পাঁচ মিনিটের জন্য অন্য ঘরে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি থলিটা চুরি গিয়াছে। থলিতে আমার স্কলারশিপের জমানো পঁচাশি টাকা ছিল; মনে সংকল্প করিয়াছিলাম আরো কিছু টাকা জমিলে তোমার পা ধোবার জলের জন্য একটি রূপার ঘটি তৈরি করাইয়া দিব। টাকা চুরি গেলে পর যখন চোরের প্রতি ব্যর্থ রাগে জ্বলিয়া মরিতেছিলাম তখন ঈশ্বর আমার মনে হঠাৎ একটা সুবুদ্ধি দিলেন; আমি মনে মনে কহিলাম, যে ব্যক্তি আমার টাকা লইয়াছে আজ দুর্ভিক্ষের দিনে তাহাকেই আমি সে টাকা দান করিলাম। যেমনি বলা অমনি আমার মনের নিষ্ফল ক্ষোভ সমস্ত শান্ত হইয়া গেল। আজ আমার মনকে আমি তেমনি করিয়া বলাইয়াছি যে, আমি ইচ্ছা করিয়াই জেলে যাইতেছি। আমার মনে কোনো কষ্ট নাই, কাহারো উপরে রাগ নাই। জেলে আমি আতিথ্য লইতে চলিলাম। সেখানে আহার বিহারের কষ্ট আছে—কিন্তু এবারে ভ্রমণের সময় নানা ঘরে আতিথ্য লইয়াছি; সে সকল জায়গাতে ত নিজের অভ্যাস ও আবশ্যকমত আরাম পাই নাই। ইচ্ছা করিয়া যাহা গ্রহণ করি সে কষ্ট ত কষ্টই নয়; জেলের আশ্রয় আজ আমি ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করিব; যতদিন আমি জেলে থাকিব একদিনও কেহ আমাকে জোর করিয়া সেখানে রাখিবে না ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।

পৃথিবীতে যখন আমরা ঘরে বসিয়া অনায়াসেই আহার বিহার করিতেছিলাম, বাহিরের আকাশ এবং আলোকে অবাধ সঞ্চরণের

অধিকার যে কত বড় প্রকাণ্ড অধিকার তাহা অভ্যাসবশত অনুভবমাত্র করিতে পারিতেছিলাম না সেই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর বহুতর মানুষই দোষে এবং বিনা দোষে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যে বন্ধন এবং অপমান ভোগ করিতেছিল আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কথা ভাবি নাই, তাহাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখি নাই—এবার আমি তাহাদের সমান দাগে দাগী হইয়া বাহির হইতে চাই; পৃথিবীর অধিকাংশ কৃত্রিম ভাল-মানুষ যাহারা ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়া আছে তাহাদের দলে ভিড়িয়া আমি সম্মান বাঁচাইয়া চলিতে চাই না।

মা, এবার পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হইয়া আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। পৃথিবীতে যাহারা বিচারের ভার লইয়াছে তাহারাই অধিকাংশ কৃপাপাত্র। যাহারা দণ্ড পায় না দণ্ড দেয়, তাহাদেরই পাপের শাস্তি জেলের কয়েদিরা ভোগ করিতেছে; অপরাধ গড়িয়া তুলিতেছে অনেকে মিলিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ইহারাই। যাহারা জেলের বাহিরে আরামে আছে সম্মানে আছে তাহাদের পাপের ক্ষয় কবে কোথায় কেমন করিয়া হইবে তাহা জানি না। আমি সেই আরাম ও সম্মানকে ধিক্কার দিয়া মানুষের কলঙ্কের দাগ বুকে চিহ্নিত করিয়া বাহির হইব, মা তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, তুমি চোখের জল ফেলিও না। ভৃগু-পদাঘাতের চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন বুক্ষে ধারণ করিয়াছেন; জগতে ঔদ্ধত্য যেখানে যত অন্যায় আঘাত করিতেছে ভগবানের বুকের সেই চিহ্নকেই গাঢ়তর করিতেছে। সেই চিহ্ন যদি তাঁর অলঙ্কার হয় তবে আমার ভাবনা কি, তোমারই বা দুঃখ কিসের?—"

এই চিঠি পাইয়া আনন্দময়ী মহিমকে গোরার কাছে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহিম বলিল, আপিস আছে, সাহেব কোনোমতেই ছুটি দিবে না। বলিয়া গোরার অবিবেচনা ও ঔদ্ধত্য লইয়া তাহাকে যথেষ্ট গালি দিতে লাগিল, কহিল, উহার সম্পর্কে কোন্‌দিন আমার সুদ্ধ

চাকরিটি যাইবে। আনন্দময়ী কৃষ্ণদয়ালকে এসম্বন্ধে কোনো কথা বলা অনাবশ্যক বোধ করিলেন। গোরা সম্বন্ধে স্বামীর প্রতি তাঁহার একটি মর্ম্মান্তিক অভিমান ছিল;—তিনি জানিতেন, কৃষ্ণদয়াল গোরাকে হৃদয়ের মধ্যে পুত্রের স্থান দেন নাই;—এমন কি, গোরা সম্বন্ধে তাঁহার অন্তঃকরণে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল। গোরা আনন্দময়ীর দাম্পত্য সম্বন্ধকে বিন্ধ্যাচলের মত বিভক্ত করিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার এক পারে অতি সতর্ক শুদ্ধাচার লইয়া কৃষ্ণদয়াল একা, এবং তাহার অন্যপারে তাঁহার ম্লেচ্ছ গোরাকে লইয়া একাকিনী আনন্দময়ী। গোরার জীবনের ইতিহাস পৃথিবীতে যে দুজন জানে তাহাদের মাঝখানে যাতায়াতের পথ যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে সংসারে গোরার প্রতি আনন্দময়ীর স্নেহ নিতান্তই তাঁহার একলার ধন ছিল। এই পরিবারে গোরার অনধিকারে অবস্থানকে তিনি সবদিক দিয়া যত হাল্কা করিয়া রাখা সম্ভব তাহার চেষ্টা করিতেন। পাছে কেহ বলে, তোমার গোরা হইতে এই ঘটিল, তোমার গোরার জন্য এই কথা শুনিতে হইল, অথবা তোমার গোরা আমাদের এই লোকসান করিয়া দিল, আনন্দময়ীর এই এক নিয়ত ভাবনা ছিল। গোরার সমস্ত দায় যে তাঁহারই! আবার তাঁহার গোরাও ত সামান্য দুরন্ত গোরা নয়! যেখানে সে থাকে সেখানে তাহার অস্তিত্ব গোপন করিয়া রাখা ত সহজ ব্যাপার নহে। এই তাঁহার কোলের ক্ষ্যাপা গোরাকে এই বিরুদ্ধ পরিবারের মাঝখানে এতদিন দিনরাত্রি তিনি সামলাইয়া এতবড় করিয়া তুলিয়াছেন;—অনেক কথা শুনিয়াছেন যাহার কোনো জবাব দেন নাই, অনেক দুঃখ সহিয়াছেন যাহার অংশ আর কাহাকেও দিতে পারেন নাই।

আনন্দময়ী চুপ করিয়া জানালার কাছে বসিয়া রহিলেন;—দেখিলেন কৃষ্ণদয়াল প্রাতঃস্নান সারিয়া ললাটে বাহুতে বক্ষে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার

কাছে আনন্দময়ী যাইতে পারিলেন না। নিষেধ, নিষেধ, নিষেধ, সর্ব্বত্রই নিষেধ। অবশেষে নিশ্বাস ফেলিয়া আনন্দময়ী উঠিয়া মহিমের ঘরে গেলেন। মহিম তখন মেঝের উপর বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে-ছিলেন, এবং তাঁহার ভৃত্য স্নানের পূর্ব্বে তাঁহার গায়ে তেল মালিশ করিয়া দিতেছিল। আনন্দময়ী তাঁহাকে কহিলেন,—মহিম, তুমি আমার সঙ্গে একজন লোক দাও, আমি যাই গোরার কি হল দেখে আসি। সে জেলে যাবে বলে মন স্থির করে বসে আছে; যদি তার জেল হয় আমি কি তার আগে তাকে একবার দেখে আস্‌তে পারব না?

মহিমের বাহিরের ব্যবহার যেমনি হউক, গোরার প্রতি তাঁহার একপ্রকারের স্নেহ ছিল। তিনি মুখে গর্জ্জন করিয়া গেলেন যে, যাক্ লক্ষ্মীছাড়া জেলেই যাক্—এতদিন যায় নি, এই আশ্চর্য্য, এই বলিয়া পরক্ষণেই তাঁহাদের অনুগত পরাণ ঘোষালকে ডাকিয়া তাহার হাতে উকীল খরচার কিছু টাকা দিয়া তখনি তাহাকে রওনা করিয়া দিলেন এবং আপিসে গিয়া সাহেবের কাছে ছুটি যদি পান এবং বৌ যদি সম্মতি দেন তবে নিজেও সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন।

আনন্দময়ীও জানিতেন, মহিম গোরার জন্য কিছু না করিয়া কখনো থাকিতে পারিবেন না। মহিম যথা-সম্ভব ব্যবস্থা করিয়াছেন শুনিয়া তিনি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি স্পষ্টই জানিতেন গোরা যেখানে আছে সেই অপরিচিত স্থানে এই সঙ্কটের সময় লোকের কৌতুক কৌতূহল ও আলোচনার মুখে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে এ পরিবারে এমন কেহই নাই। তিনি চোখের দৃষ্টিতে নিঃশব্দ বেদনার ছায়া লইয়া ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। লছমিয়া যখন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল তাহাকে তিরস্কার করিয়া অন্য ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। সমস্ত উদ্বেগ নিঃশব্দে পরিপাক করাই তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস। সুখ ও দুঃখ উভয়কেই তিনি শান্তভাবেই

গ্রহণ করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের আক্ষেপ কেবল অন্তর্যামীরই গোচর ছিল।

বিনয় যে আনন্দময়ীকে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু আনন্দময়ী কাহারো সান্ত্বনাবাক্যের কোনো অপেক্ষা রাখিতেন না;— যে দুঃখের কোনো প্রতিকার নাই সে দুঃখ লইয়া অন্য লোকে তাঁহার সঙ্গে আলোচেনা করিতে আসিলে তাঁহার প্রকৃতি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। তিনি আর কোনো কথা উঠিতে না দিয়া বিনয়কে কহিলেন,—বিনু, এখনো তোমার স্নান হয় নি দেখছি—যাও, শীঘ্র নেয়ে এস গে—অনেক বেলা হয়ে গেছে।

বিনয় স্নান করিয়া আসিয়া যখন আহার করিতে বসিল তখন বিনয়ের পাশে গোরার স্থান শূন্য দেখিয়া আনন্দময়ীর বুকের মধ্যে হাহাকার উঠিল;—গোরাকে আজ জেলের অন্ন খাইতে হইতেছে, সে অন্ন নির্ম্মম শাসনের দ্বারা কটু, মায়ের সেবার দ্বারা মধুর নহে, এই কথা মনে করিয়া আনন্দময়ীকেও কোনো ছুতা করিয়া উঠিয়া যাইতে হইল।

৩৪

বাড়ি আসিয়া অসময়ে ললিতাকে দেখিয়াই পরেশবাবু বুঝিতে পারিলেন তাঁহার এই উদ্দাম মেয়েটি অভূতপূর্ব্বরূপে একটা কিছু কাণ্ড বাধাইয়াছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে বলিয়া উঠিল,—বাবা, আমি চলে এসেছি। কোনো মতেই থাকতে পারলুম না।

পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন কি হয়েচে? ললিতা কহিল— গৌর বাবুকে ম্যাজিষ্ট্রেট জেলে দিয়েচে।—গৌর ইহার মধ্যে কোথা হইতে আসিল কি হইল পরেশ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ললিতার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎক্ষণাৎ গোরার

মার কথা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে ভাবিতে লাগিলেন, একজন চোরকে যে দণ্ড দেওয়া গোরাকেও সেই দণ্ড দেওয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে যে সমান অনায়াসসাধ্য হইয়াছে এরূপ বর্ব্বরতা নিতান্তই ধর্ম্মবুদ্ধির অসাড়তাবশত সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের দৌরাত্ম্য জগতের অন্য সমস্ত হিংস্রতার চেয়ে কত ভয়ানক, তাহার পশ্চাতে সমাজের শক্তি রাজার শক্তি দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে যে কিরূপ প্রচণ্ড প্রকাণ্ড করিয়া তুলিয়াছে গোরার কারাদণ্ডের কথা শুনিয়া তাহা তাঁহার চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।

পরেশবাবুকে এইরূপ চুপ করিয়া ভাবিতে দেখিয়া ললিতা উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, বাবা, এ ভয়ানক অন্যায় নয়?

পরেশবাবু তাঁহার স্বাভাবিক শান্তস্বরে কহিলেন—গৌর যে কতখানি কি করেচে সেত আমরা ঠিক জানিনে; তবে একথা নিশ্চয় বলতে পারি গৌর তার কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রবলতার ঝোঁকে হয়ত হঠাৎ আপনার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করতে পারে কিন্তু ইংরেজি ভাষায় যাকে ক্রাইম্ বলে তা যে গোরার পক্ষে একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ তাতে আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করবে মা—কালের ন্যায়বুদ্ধি এখনো সে পরিমাণে বিবেক লাভ করে নি। এখনো অপরাধের যে দণ্ড, ত্রুটিরও সেই দণ্ড; উভয়কেই একই জেলের একই ঘানি টান্‌তে হয়। এ রকম যে সম্ভব হয়েচে কোনো একজন মানুষকে সে জন্য দোষ দেওয়া যায় না। সমস্ত মানুষের পাপ এজন্য দায়ী।

হঠাৎ এই প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন,—তুমি কার সঙ্গে এলে?

ললিতা বিশেষ একটু জোর করিয়া যেন খাড়া হইয়া কহিল,—বিনয় বাবুর সঙ্গে।

বাহিরে যতই জোর দেখাক্ তাহার ভিতরে দুর্ব্বলতা ছিল। বিনয়

বাবুর সঙ্গে আসিয়াছে এ কথাটা ললিতা বেশ সহজে বলিতে পারিল না—কোথা হইতে একটু লজ্জা আসিয়া পড়িল এবং সে লজ্জা মুখের ভাবে বাহির হইয়া পড়িতেছে মনে করিয়া তাহার লজ্জা আরো বাড়িয়া উঠিল।

পরেশ বাবু এই খামখেয়ালি দুর্জ্জয় মেয়েটিকে তাঁহার অন্যান্য সকল সন্তানের চেয়ে একটু বিশেষ স্নেহই করিতেন। ইহার ব্যবহার অন্যের কাছে নিন্দনীয় ছিল বলিয়াই ললিতার আচরণের মধ্যে যে একটি সত্য-পরতা আছে সেইটিকে তিনি বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। তিনি জানিতেন ললিতার যে দোষ সেইটেই বেশি করিয়া লোকের চোখে পড়িবে কিন্তু ইহার যে গুণ তাহা যতই দুর্লভ হউক না কেন লোকের কাছে আদর পাইবে না। পরেশ বাবু সেই গুণটিকে যত্নপূর্ব্বক সাবধানে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন;—ললিতার দুরন্ত প্রকৃতিকে দমন করিয়া সেই সঙ্গে তাহার ভিতরকার মহত্ত্বকেও দলিত করিতে তিনি চান নাই। তাঁহার অন্য দুইটি মেয়েকে দেখিবামাত্রই সকলে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল, তাহাদের মুখের গড়নেও খুঁৎ নাই—কিন্তু ললিতার রং তাহাদের চেয়ে কালো, এবং তাহার মুখের কমনীয়তা সম্বন্ধে মতভেদ ঘটে। বরদাসুন্দরী সেইজন্য ললিতার পাত্র জোটা লইয়া সর্ব্বদাই স্বামীর নিকট উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু পরেশ বাবু ললিতার মুখে যে একটি সৌন্দর্য্য দেখিতেন তাহা রঙের সৌন্দর্য্য নহে, গড়নের সৌন্দর্য্য নহে তাহা অন্তরের গভীর সৌন্দর্য্য। তাহার মধ্যে কেবলমাত্র লালিত্য নহে, স্বাতন্ত্র্যের তেজ এবং শক্তির দৃঢ়তা আছে—সেই দৃঢ়তা সকলের মনোরম নহে। তাহা লোকবিশেষকে আকর্ষণ করে কিন্তু অনেককেই দূরে ঠেলিয়া রাখে। সংসারে ললিতা প্রিয় হইবে না কিন্তু খাঁটি হইবে ইহাই জানিয়া পরেশ বাবু কেমন একটু বেদনার সহিত ললিতাকে কাছে টানিয়া লইতেন—তাহাকে আর কেহ ক্ষমা করিতেছে না জানিয়াই তাহাকে করুণার সহিত বিচার করিতেন।

যখন পরেশ বাবু শুনিলেন, ললিতা একলা বিনয়ের সঙ্গে হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছে তখন তিনি এক মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন এজন্য ললিতাকে অনেকদিন ধরিয়া অনেক দুঃখ সহিতে হইবে; সে যেটুকু অপরাধ করিয়াছে লোকে তাহার চেয়ে বড় অপরাধের দণ্ড তাহার প্রতি বিধান করিবে। সেই কথাটা তিনি চুপ করিয়া ক্ষণকাল ভাবিতেছেন এমন সময় ললিতা বলিয়া উঠিল,—বাবা, আমি দোষ করেছি। কিন্তু এবার আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আমাদের দেশের লোকের এমন সম্বন্ধ যে তাঁর আতিথ্যের মধ্যে কিছুই সম্মান নেই কেবলি অনুগ্রহ মাত্র। সেটা সহ্য করেও কি আমার সেখানে থাকা উচিত ছিল?

পরেশ বাবুর কাছে প্রশ্নটি সহজ বলিয়া বোধ হইল না। তিনি কোনো উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া একটু হাসিয়া ললিতার মাথায় দক্ষিণ হস্ত দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন—পাগ্‌লি!

এই ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে সেদিন অপরাহ্ণে পরেশ বাবু যখন বাড়ির বাহিরে পায়চারি করিতেছিলেন এমন সময় বিনয় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পরেশ বাবু গোরার কারাদণ্ড সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন কিন্তু ললিতার সঙ্গে ষ্টীমারে আসার কোনো প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন না। অন্ধকার হইয়া আসিলে কহিলেন,—চল, বিনয়, ঘরে চল।

বিনয় কহিল—না, আমি এখন বাসায় যাব।

পরেশ বাবু তাহাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন না। বিনয় একবার চকিতের মত দোতলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

উপর হইতে ললিতা বিনয়কে দেখিতে পাইয়াছিল। যখন পরেশ বাবু একলা ঘরে ঢুকিলেন তখন ললিতা মনে করিল বিনয় হয়ত আর একটু পরেই আসিবে। আর একটু পরেও বিনয় আসিল না। তখন টেবিলের

উপরকার দুটো বই ও কাগজচাপা নাড়াচাড়া করিয়া ললিতা ঘর হইতে চলিয়া গেল। পরেশ বাবু তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন—তাহার বিষণ্ণ-মুখের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কহিলেন—ললিতা আমাকে একটা ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাও। বলিয়া বাতিটা আড়াল করিয়া দিলেন।

৩৫

পরদিনে বরদাসুন্দরী এবং তাঁহাদের দলের বাকি সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন। হারানবাবু ললিতা সম্বন্ধে তাঁহার বিরক্তি সম্বরণ করিতে না পারিয়া বাসায় না গিয়া ইঁহাদের সঙ্গে একেবারে পরেশ বাবুর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরদাসুন্দরী ক্রোধে ও অভিমানে ললিতার দিকে না তাকাইয়া এবং তাহার সঙ্গে কোনো কথা না কহিয়া একেবারে তাঁহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। লাবণ্য ও লীলাও ললিতার উপরে রাগ করিয়া আসিয়াছিল। ললিতা এবং বিনয় চলিয়া আসাতে তাহাদের আবৃত্তি ও অভিনয় এমন অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদের লজ্জার সীমা ছিল না। সুচরিতা, হারান বাবুর ক্রুদ্ধ ও কটু উত্তেজনায়, বরদাসুন্দরীর অশ্রুমিশ্রিত আক্ষেপে অথবা লাবণ্যলীলার লজ্জিত নিরুৎসাহে কিছুমাত্র যোগ না দিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া ছিল—তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজটুকু সে কলের মত করিয়া গিয়াছিল। আজও সে যন্ত্রচালিতের মত সকলের পশ্চাতে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সুধীর লজ্জায় এবং অনুতাপে সঙ্কুচিত হইয়া পরেশ বাবুর বাড়ীর দরজার কাছ হইতেই বাসায় চলিয়া গেল—লাবণ্য তাহাকে বাড়িতে আসিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া কৃতকার্য্য না হইয়া তাহার প্রতি আড়ি করিল।

হারান পরেশ বাবুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—একটা ভারি অন্যায় হয়ে গেছে!

পাশের ঘরে ললিতা ছিল, তাহার কানে কথাটা প্রবেশ করিবামাত্র

সে আসিয়া তাহার বাবার চৌকির পৃষ্ঠদেশে দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইল এবং হারান বাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পরেশ বাবু কহিলেন,—আমি ললিতার কাছ থেকে সংবাদ শুনেছি। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এখন আলোচনা করে কোনো ফল নেই।

হারান শান্ত সংযত পরেশকে নিতান্ত দুর্ব্বলস্বভাব বলিয়া মনে করিতেন। তাই কিছু অবজ্ঞার ভাবে কহিলেন—ঘটনা ত হয়ে চুকে যায় কিন্তু চরিত্র যে থাকে, সেই জন্যেই যা হয়ে যায় তারও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ললিতা আজ যে কাজটি করেচে তা কখনই সম্ভব হত না যদি আপনার কাছে বরাবর প্রশ্রয় পেয়ে না আস্‌ত—আপনি ওর যে কতদূর অনিষ্ট করেচেন তা আজকের ব্যাপার সবটা শুন্‌লে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌বেন!

পরেশবাবু পিছন দিকে তাঁহার চৌকির গাত্রে একটা ঈষৎ আন্দোলন অনুভব করিয়া তাড়াতাড়ি ললিতাকে তাঁহার পাশে টানিয়া আনিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, এবং একটু হাসিয়া হারানকে কহিলেন,—পানু বাবু, যখন সময় আসবে তখন আপনি জান্‌তে পারবেন, সন্তানকে মানুষ করতে স্নেহেরও প্রয়োজন হয়!

ললিতা এক হাতে তাহার পিতার গলা বেড়িয়া ধরিয়া নত হইয়া তাঁহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল—বাবা, তোমার জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে তুমি নাইতে যাও!

পরেশবাবু হারানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—আরেকটু পরে যাবো—তেমন বেলা হয়নি।

ললিতা স্নিগ্ধস্বরে কহিল,—না বাবা, তুমি স্নান করে এস—ততক্ষণ পানুবাবুর কাছে আমরা আছি।

পরেশ বাবু যখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তখন ললিতা একটা চৌকি অধিকার করিয়া দৃঢ় হইয়া বসিল এবং হারানবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির

করিয়া কহিল—আপনি মনে করেন সকলকেই আপনার সব কথা বলবার অধিকার আছে!

ললিতাকে সুচরিতা চিনিত। অন্যদিন হইলে ললিতার এরূপ মূর্ত্তি দেখিলে সে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিত। আজ সে জানালার ধারের চৌকিতে বসিয়া একটা বই খুলিয়া চুপ করিয়া তাহার পাতার দিকে চাহিয়া রহিল। নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখাই সুচরিতার চিরদিনের স্বভাব ও অভ্যাস। এই কয়দিন ধরিয়া নানাপ্রকার আঘাতের বেদনা তাহার মনে যতই বেশি করিয়া সঞ্চিত হইতেছিল ততই সে আরো বেশি করিয়া নীরব হইয়া উঠিতেছিল। আজ তাহার এই নীরবতার ভার দুর্ব্বিষহ হইয়াছে—এই জন্য ললিতা যখন হারানের নিকট তাহার মন্তব্য প্রকাশ করিতে বসিল তখন সুচরিতার রুদ্ধ হৃদয়ের বেগ যেন মুক্তিলাভ করিবার অবসর পাইল।

ললিতা কহিল—আমাদের সম্বন্ধে বাবার কি কর্ত্তব্য, আপনি মনে করেন, বাবার চেয়ে আপনি তা ভাল বোঝেন! সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের আপনিই হচ্চেন হেড্‌মাষ্টার!

ললিতার এই প্রকার ঔদ্ধত্য দেখিয়া হারানবাবু প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। এইবার তিনি তাহাকে খুব একটা কড়া জবাব দিতে যাইতেছিলেন—ললিতা তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে কহিল,—এতদিন আপনার শ্রেষ্ঠতা আমরা অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আপনি যদি বাবার চেয়েও বড় হতে চান তা হলে এবাড়িতে আপনাকে কেউ সহ্য করতে পারবে না—আমাদের বেয়ারাটা পর্য্যন্ত না।

হারান বাবু বলিয়া উঠিলেন—ললিতা তুমি—

ললিতা তাঁহাকে বাধা দিয়া তীব্রস্বরে কহিল—চুপ করুন। আপনার কথা আমরা অনেক শুনেছি আজ আমার কথাটা শুনুন্। যদি বিশ্বাস না করেন তবে সুচি দিদিকে জিজ্ঞাসা করবেন—আপনি নিজেকে যত বড়

বলে কল্পনা করেন আমার বাবা তার চেয়ে অনেক বেশি বড়। এইবার আপনার যা কিছু উপদেশ আমাকে দেবার আছে আপনি দিয়ে যান্।

হারান বাবুর মুখ কালো হইয়া উঠিল। তিনি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন—সুচরিতা!

সুচরিতা বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিল। হারান বাবু কহিলেন—তোমার সাম্‌নে ললিতা আমাকে অপমান করবে!

সুচরিতা ধীরস্বরে কহিল,—আপনাকে অপমান করা ওর উদ্দেশ্য নয়—ললিতা বলতে চায় বাবাকে আপনি সম্মান করে চলবেন। তাঁর মত সম্মানের যোগ্য আমরা ত কাউকেই জানিনে!

একবার মনে হইল হারান বাবু এখনি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া যাইবেন কিন্তু তিনি উঠিলেন না। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন। এ বাড়িতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট হইতেছে ইহা তিনি যতই অনুভব করিতেছেন ততই তিনি এখানে আপন আসন দখল করিয়া বসিবার জন্য আরো বেশি পরিমাণে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছেন; ভুলিতেছেন যে, যে আশ্রয় জীর্ণ তাহাকে যতই জোরের সঙ্গে আঁকড়িয়া ধরা যায় তাহা ততই ভাঙিতে থাকে।

হারান বাবু রুষ্ট গাম্ভীর্য্যের সহিত চুপ করিয়া রহিলেন দেখিয়া ললিতা উঠিয়া গিয়া সুচরিতার পাশে বসিল এবং তাহার সহিত মৃদুস্বরে এমন করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল যেন বিশেষ কিছুই ঘটে নাই।

ইতিমধ্যে সতীশ ঘরে ঢুকিয়া সুচরিতার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল,—বড় দিদি এস!

সুচরিতা কহিল,—কোথায় যেতে হবে?

সতীশ কহিল,—এস না, তোমাকে একটা জিনিষ দেখাব! ললিতা দিদি, তুমি বলে দাও নি?

ললিতা কহিল,—না।

তাহার মাসির কথা ললিতা সুচরিতার কাছে ফাঁস করিয়া দিবে না সতীশের সঙ্গে এইরূপ কথা ছিল; ললিতা আপন প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিল।

অতিথিকে ছাড়িয়া সুচরিতা যাইতে পারিল না—কহিল, বক্তিয়ার, আর একটু পরে যাচ্চি—বাবা আগে স্নান করে আসুন।

সতীশ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কোনোমতে হারান বাবুকে বিলুপ্ত করিতে পারিলে সে চেষ্টার ত্রুটি করিত না। হারান বাবুকে সে অত্যন্ত ভয় করিত বলিয়া তাঁহাকে কোনো কথা বলিতে পারিল না। হারান বাবু মাঝে মাঝে সতীশের স্বভাব সংশোধনের চেষ্টা করা ছাড়া তাহার সঙ্গে আর কোনো প্রকার সংস্রব রাখেন নাই।

পরেশ বাবু স্নান করিয়া আসিবামাত্র সতীশ তাহার দুই দিদিকে টানিয়া লইয়া গেল।

হারান কহিলেন—সুচরিতার সম্বন্ধে সেই যে প্রস্তাবটা ছিল, আমি আর বিলম্ব করতে চাইনে। আমার ইচ্ছা, আস্‌চে রবিবারেই সে কাজটা হয়ে যায়।

পরেশ বাবু কহিলেন,—আমার তাতে ত কোনো আপত্তি নেই, সুচরিতার মত হলেই হল।

হারান। তাঁর ত মত পূর্ব্বেই নেওয়া হয়েচে।

পরেশ বাবু। আচ্ছা তবে সেই কথাই রইল।

৩৬

সেদিন ললিতার নিকট হইতে আসিয়া পরেশ বাবুর বাড়ি যাওয়া বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব হইল এবং নিজের বাসার শূন্যতাও যেন একটা ভারের মত হইয়া তাহাকে চাপিতে লাগিল। পরদিন ভোরের বেলাই

সে আনন্দময়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল,—মা, কিছুদিন আমি তোমার এখানে থাক্‌ব।

আনন্দময়ীকে গোরার বিচ্ছেদশোকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ও বিনয়ের মনের মধ্যে ছিল। তাহা বুঝিতে পারিয়া আনন্দময়ীর হৃদয় বিগলিত হইল। কোনো কথা না বলিয়া তিনি সস্নেহে একবার বিনয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন।

বিনয় তাহার খাওয়া দাওয়া সেবাশুশ্রূষা লইয়া বহুবিধ আবদার জুড়িয়া দিল। এখানে তাহার যথোচিত যত্ন হইতেছে না বলিয়া সে মাঝে মাঝে আনন্দময়ীর সঙ্গে মিথ্যা কলহ করিতে লাগিল। সর্ব্বদাই সে গোলমাল বকাবকি করিয়া আনন্দময়ীকে ও নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। সন্ধ্যার সময় যখন মনকে বাঁধিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইত, তখন বিনয় উৎপাত করিয়া আনন্দময়ীকে তাঁহার সকল গৃহকর্ম্ম হইতে ছিনাইয়া লইয়া ঘরের সম্মুখের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিত; আনন্দময়ীকে তাঁহার ছেলেবেলার কথা, তাঁহার বাপের বাড়ির গল্প বলাইত; যখন তাঁহার বিবাহ হয় নাই, যখন তিনি তাঁহার অধ্যাপক পিতামহের টোলের ছাত্রদের অত্যন্ত আদরের শিশু ছিলেন, এবং পিতৃহীনা বালিকাকে সকলে মিলিয়া সকল বিষয়েই প্রশ্রয় দিত বলিয়া তাঁহার বিধবামাতার বিশেষ উদ্বেগের কারণ ছিলেন, সেই সকল দিনের কাহিনী। বিনয় বলিত,—মা, তুমি যে কোনো দিন আমাদের মা ছিলে না সে কথা মনে করলে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমার বোধ হয় টোলের ছেলেরা তোমাকে তাদের খুব ছোট্টো এতটুকু মা বলেই জান্‌ত। তোমার দাদামশায়কে বোধহয় তুমিই মানুষ করবার ভার নিয়েছিলে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মাদুরের উপরে প্রসারিত আনন্দময়ীর দুই পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া বিনয় কহিল,—মা, ইচ্ছা করে আমার সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি বিধাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে শিশু হয়ে তোমার ঐ কোলে

আশ্রয় গ্রহণ করি,—কেবল তুমি, সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কিছুই না থাকে।

বিনয়ের কণ্ঠে হৃদয়ভারাক্রান্ত একটা ক্লান্তি এমন করিয়া প্রকাশ পাইল যে আনন্দময়ী ব্যথার সঙ্গে বিস্ময় অনুভব করিলেন। তিনি বিনয়ের কাছে সরিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা কহিলেন,—বিনু, পরেশ বাবুদের বাড়ির সব খবর ভাল?

এই প্রশ্নে হঠাৎ বিনয় লজ্জিত হইয়া চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, মার কাছে কিছুই লুকানো চলে না, মা আমার অন্তর্যামী। কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, হাঁ, তাঁরা ত সকলেই ভাল আছেন।

আনন্দময়ী কহিলেন,—আমার বড় ইচ্ছা করে পরেশ বাবুর মেয়েদের সঙ্গে আমার চেনা পরিচয় হয়। প্রথমে ত তাঁদের উপর গোরার মনের ভাব ভাল ছিল না কিন্তু ইদানীং তাকে সুদ্ধ যখন তাঁরা বশ করতে পেরেছেন তখন তাঁরা সামান্য লোক হবেন না।

বিনয় উৎসাহিত হইয়া কহিল,—আমারো অনেক বার ইচ্ছা হয়েচে পরেশ বাবুর মেয়েদের সঙ্গে যদি কোনোমতে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারি। পাছে গোরা কিছু মনে করে বলে আমি কোনো কথা বলিনি।

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—বড় মেয়েটির নাম কি?

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে পরিচয় চলিতে চলিতে যখন ললিতার প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল তখন বিনয় সেটাকে কোনোমতে সংক্ষেপে সারিয়া দিবার চেষ্টা করিল। আনন্দময়ী বাধা মানিলেন না। তিনি মনে মনে হাসিয়া কহিলেন,—শুনেছি ললিতার খুব বুদ্ধি।

বিনয় কহিল,—তুমি কার কাছে শুনলে?

আনন্দময়ী কহিলেন—কেন, তোমারি কাছে!

পূর্ব্বে এমন এক সময় ছিল যখন ললিতার সম্বন্ধে বিনয়ের মনে কোনো প্রকার সঙ্কোচ ছিল না। সেই মোহমুক্ত অবস্থায় সে যে আনন্দময়ীর কাছে ললিতার তীক্ষ্ণবুদ্ধি লইয়া অবাধে আলোচনা করিয়াছিল সে কথা তাহার মনেই ছিল না।

আনন্দময়ী সুনিপুণ মাঝির মত সমস্ত বাধা বাঁচাইয়া ললিতার কথা এমন করিয়া চালনা করিয়া লইয়া গেলেন যে বিনয়ের সঙ্গে তাহার পরিচয়ের ইতিহাসের প্রধান অংশগুলি প্রায় সমস্তই প্রকাশ হইল। গোরার কারাদণ্ডের ব্যাপারে ব্যথিত হইয়া ললিতা যে ষ্টীমারে একাকিনী বিনয়ের সঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছে সে কথাও বিনয় আজ বলিয়া ফেলিল। বলিতে বলিতে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল—যে অবসাদে সন্ধ্যাবেলায় তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল তাহা কোথায় কাটিয়া গেল! সে যে ললিতার মত এমন একটি আশ্চর্য্য চরিত্রকে জানিয়াছে এবং এমন করিয়া তাহার কথা কহিতে পারিতেছে ইহাই তাহার কাছে একটা পরম লাভ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাত্রে যখন আহারের সংবাদ আসিল এবং কথা ভাঙিয়া গেল—তখন হঠাৎ যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বিনয় বুঝিতে পারিল তাহার মনে যাহা কিছু কথা ছিল আনন্দময়ীর কাছে তাহা সমস্তই বলা হইয়া গেছে। আনন্দময়ী এমন করিয়া সমস্ত শুনিলেন, এমন করিয়া সমস্ত গ্রহণ করিলেন যে, ইহার মধ্যে যে কিছু লজ্জা করিবার আছে তাহা বিনয়ের মনেই হইল না। আজ পর্য্যন্ত মার কাছে লুকাইবার কথা বিনয়ের কিছুই ছিল না—অতি তুচ্ছ কথাটিও সে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিত। কিন্তু পরেশ বাবুর পরিবারের সঙ্গে আলাপ হইয়া অবধি কোথায় একটা বাধা পড়িয়াছিল। সেই বাধা বিনয়ের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয় নাই। আজ ললিতার সম্বন্ধে তাহার মনের কথা সূক্ষ্ম-দর্শিনী আনন্দময়ীর কাছে একরকম করিয়া সমস্ত প্রকাশ হইয়া গেছে তাহা অনুভব করিয়া বিনয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। মাতার কাছে

তাহার জীবনের এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিবেদন করিতে না পারিলে কথাটা কোনোমতেই নির্ম্মল হইয়া উঠিত না—ইহা তাহার চিন্তার মধ্যে কালীর দাগ দিতে থাকিত।

রাত্রে আনন্দময়ী অনেকক্ষণ এই কথা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলেন। গোরার জীবনের যে সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছিল, পরেশ বাবুর ঘরেই তাহার একটা মীমাংসা ঘটিতে পারে এই কথা মনে করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন যেমন করিয়া হউক মেয়েদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে হইবে।

৩৭

শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ যেন একপ্রকার স্থির হইয়া গেছে এইভাবে মহিম এবং তাহার ঘরের লোকেরা চলিতেছিলেন। শশিমুখী ত বিনয়ের কাছে আসিত না। শশিমুখীর মার সঙ্গে বিনয়ের পরিচয় ছিল না বলিলেই হয়। তিনি যে ঠিক লাজুক ছিলেন তাহা নহে কিন্তু অস্বাভাবিক রকমের গোপনচারিণী ছিলেন। তাঁহার ঘরের দরজা প্রায়ই বন্ধ। স্বামী ছাড়া তাঁহার আর সমস্তই তালাচাবির মধ্যে। স্বামীও যে যথেষ্ট খোলা পাইতেন তাহা নহে—স্ত্রীর শাসনে তাঁহার গতিবিধি অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট এবং তাঁহার সঞ্চরণক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। এইরূপ ঘের দিয়া লওয়ার স্বভাববশত শশিমুখীর মা লক্ষ্মীমণির জগৎটি সম্পূর্ণ তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল—সেখানে বাহিরের লোকের ভিতরে এবং ভিতরের লোকের বাহিরে যাওয়ার পথ অবারিত ছিল না। এমন কি, গোরাও লক্ষ্মীমণির মহলে তেমন করিয়া আমল পাইত না। এই রাজ্যের বিধিব্যবস্থার মধ্যে কোনো দ্বৈধ ছিল না। কারণ, এখানকার বিধান-কর্ত্তাও লক্ষ্মীমণি এবং নিম্ন আদালত হইতে আপিল আদালত পর্য্যন্ত সমস্তই লক্ষ্মীমণি—একজিক্যুটিভ এবং জুডিশিয়ালে ত ভেদ ছিল না,

লেজিস্‌লেটিভ্‌ও তাহার সহিত জোড়া ছিল। বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে মহিমকে খুব শক্ত লোক বলিয়াই মনে হইত কিন্তু লক্ষ্মীমণির এলাকার মধ্যে তাঁহার নিজের ইচ্ছা খাটাইবার কোনো পথ ছিল না। সামান্য বিষয়েও না।

লক্ষ্মীমণি বিনয়কে আড়াল হইতে দেখিয়াছিলেন, পছন্দও করিয়াছিলেন। মহিম বিনয়ের বাল্যকাল হইতে গোরার বন্ধুরূপে তাহাকে এমন নিয়ত দেখিয়া আসিয়াছেন যে অতিপরিচয়বশতই তিনি বিনয়কে নিজের কন্যার পাত্র বলিয়া দেখিতেই পান নাই। লক্ষ্মীমণি যখন বিনয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন তখন সহধর্ম্মিণীর বুদ্ধির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। লক্ষ্মীমণি পাকা করিয়াই স্থির করিয়া দিলেন যে বিনয়ের সঙ্গেই তাঁহার কন্যার বিবাহ হইবে; এই প্রস্তাবের একটা মস্ত সুবিধার কথা তিনি তাঁহার স্বামীর মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন যে, বিনয় তাঁহাদের কাছ হইতে কোনো পণ দাবী করিতে পারিবেন না।

বিনয়কে বাড়িতে পাইয়াও দুই একদিন মহিম তাহাকে বিবাহের কথা বলিতে পারেন নাই। গোরার কারাবাসসম্বন্ধে তাহার মন বিষণ্ণ ছিল বলিয়া তিনি নিরস্ত ছিলেন।

আজ রবিবার ছিল। গৃহিণী মহিমের সাপ্তাহিক দিবানিদ্রাটি সম্পূর্ণ হইতে দিলেন না। বিনয় নূতন-প্রকাশিত বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন লইয়া আনন্দময়ীকে শুনাইতেছিল—পানের ডিবা হাতে লইয়া সেইখানে আসিয়া মহিম তক্তপোষের উপরে ধীরে ধীরে বসিলেন।

প্রথমত বিনয়কে একটা পান দিয়া তিনি গোরার উচ্ছৃঙ্খল নির্ব্বুদ্ধিতা লইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তাহার পরে তাহার খালাস হইতে আর কয়দিন বাকি তাহা আলোচনা করিতে গিয়া অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, অগ্রান মাসের প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া আসিয়াছে।

কহিলেন—বিনয় তুমি যে বলেছিলে, অগ্রান মাসে তোমাদের বংশে

বিবাহ নিষেধ আছে সেটা কোনো কাজের কথা নয়। একেত পাঁজি পুঁথিতে নিষেধ ছাড়া কথাই নেই তার উপরে যদি ঘরের শাস্ত্র বানাতে থাক তাহলে বংশ রক্ষা হবে কি করে ?

বিনয়ের সঙ্কট দেখিয়া আনন্দময়ী কহিলেন—শশিমুখীকে এতটুকু বেলা থেকে বিনয় দেখে আসচে—ওকে বিয়ে করার কথা ওর মনে লাগ্‌চে না ; সেই জন্যেই অঘ্রান মাসের ছুতো করে বসে আছে।

মহিম কহিলেন,—সে কথা ত গোড়ায় বল্লেই হত।

আনন্দময়ী কহিলেন,—নিজের মন বুঝতেও যে সময় লাগে। পাত্রের অভাব কি আছে মহিম! গোরা ফিরে আসুক—সে ত অনেক ভাল ছেলেকে জানে—সে একটা ঠিক করে দিতে পারবে।

মহিম মুখ অন্ধকার করিয়া কহিলেন,—হুঁ! খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পরে কহিলেন,—মা, তুমি যদি বিনয়ের মন ভাঙিয়ে না দিতে তাহলে ও একাজে আপত্তি করত না।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, আনন্দময়ী বাধা দিয়া কহিলেন—তা সত্য কথা বলচি মহিম, আমি ওকে উৎসাহ দিতে পারি নি। বিনয় ছেলেমানুষ, ও হয়ত না বুঝে একটা কাজ করে বসতেও পারত, কিন্তু শেষকালে ভাল হত না।

আনন্দময়ী বিনয়কে আড়ালে রাখিয়া নিজের পরেই মহিমের রাগের ধাক্কাটা গ্রহণ করিলেন। বিনয় তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া উঠিল। সে নিজের অসম্মতি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে মহিম আর অপেক্ষা না করিয়া মনে মনে এই বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল যে, বিমাতা কখনো আপন হয় না।

মহিম যে একথা মনে করিতে পারেন এবং বিমাতা বলিয়া তিনি যে সংসারের বিচারক্ষেত্রে বরাবর আসামী শ্রেণীতেই ভুক্ত আছেন আনন্দময়ী তাহা জানিতেন। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে একথা ভাবিয়া চলা

তাঁহার অভ্যাসই ছিল না। যেদিন তিনি গোরাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন সেইদিন হইতেই লোকের আচার লোকের বিচার হইতে তাঁহার প্রকৃতি একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া গেছে। সেদিন হইতে তিনি এমন সকল আচরণ করিয়া আসিয়াছেন যাহাতে লোকে তাঁহার নিন্দাই করে। তাঁহার জীবনের মর্ম্মস্থানে যে একটি সত্যগোপন তাঁহাকে সর্ব্বদা পীড়া দিতেছে, লোকনিন্দায় তাঁহাকে সেই পীড়া হইতে কতকটা পরিমাণে মুক্তিদান করে। লোকে যখন তাঁহাকে খৃষ্টান বলিত তিনি গোরাকে কোলে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন—ভগবান জানেন খৃষ্টান বলিলে আমার নিন্দা হয় না—এমনি করিয়া ক্রমে সকল বিষয়েই লোকের কথা হইতে নিজের ব্যবহারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল। এই জন্য মহিম তাঁহাকে মনে মনে বা প্রকাশ্যে বিমাতা বলিয়া লাঞ্ছিত করিলেও তিনি নিজের পথ হইতে বিচলিত হইতেন না।

আনন্দময়ী কহিলেন,—বিনু, তুমি পরেশবাবুদের বাড়ি অনেক দিন যাও নি।

বিনয় কহিল,—অনেক দিন আর কই হল ?

আনন্দময়ী। ষ্টীমার থেকে আসার পরদিন থেকেত একবারও যাওনি।

সেও ত বেশিদিন নহে কিন্তু বিনয় জানিত মাঝে পরেশবাবুর বাড়ি তাহার যাতায়াত এত বাড়িয়াছিল যে আনন্দময়ীর পক্ষেও তাহার দর্শন দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। সে হিসাবে পরেশবাবুর বাড়ি অনেক দিন যাওয়া হয় নাই এবং লোকের তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছে বটে !

বিনয়,নিজের ধুতির প্রান্ত হইতে একটা সূতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে চুপ করিয়া রহিল।

এমন সময় বেহারা আসিয়া খবর দিল,—মাজি, কাঁহাসে মায়ীলোক আয়া।

বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। কে আসিল, কোথা হইতে

আসিল, খবর লইতে লইতেই সুচরিতা ও ললিতা ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিনয়ের ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া ঘটিল না; সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দুজনে আনন্দময়ীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। ললিতা বিনয়কে বিশেষ লক্ষ্য করিল না; সুচরিতা তাহাকে নমস্কার করিয়া কহিল, ভাল আছেন? আনন্দময়ীর দিকে চাহিয়া সে কহিল—আমরা পরেশ বাবুর বাড়ি থেকে আসচি।

আনন্দময়ী তাহাদিগকে আদর করিয়া বসাইয়া কহিলেন,—আমাকে সে পরিচয় দিতে হবে না। তোমাদের দেখিনি, মা, কিন্তু তোমাদের আপনার ঘরের বলেই জানি।

দেখিতে দেখিতে কথা জমিয়া উঠিল। বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া সুচরিতা তাহাকে আলাপের মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল;—মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি অনেক দিন আমাদের ওখানে যান নি যে।

বিনয় ললিতার দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া লইয়া কহিল,—ঘন ঘন বিরক্ত করলে পাছে আপনাদের স্নেহ হারাই মনে এই ভয় হয়।

সুচরিতা একটু হাসিয়া কহিল—স্নেহও যে ঘন ঘন বিরক্তির অপেক্ষা রাখে সে আপনি জানেন না বুঝি?

আনন্দময়ী কহিলেন,—তা ও খুব জানে মা! কি বল্‌ব তোমাদের—সমস্ত দিন ওর ফরমাসে আর আব্দারে আমার যদি একটু অবসর থাকে! এই বলিয়া স্নিগ্ধদৃষ্টি দ্বারা বিনয়কে নিরীক্ষণ করিলেন।

বিনয় কহিল,—ঈশ্বর তোমাকে ধৈর্য্য দিয়েছেন, আমাকে দিয়ে তারই পরীক্ষা করিয়ে নিচ্চেন।

সুচরিতা ললিতাকে একটু ঠেলা দিয়া কহিল,—শুনচিস্ ভাই ললিতা, আমাদের পরীক্ষাটা বুঝি শেষ হয়ে গেল! পাস করতে পারিনি বুঝি?

ললিতা এ কথায় কিছুমাত্র যোগ দিল না দেখিয়া আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন,—এবার আমাদের বিনু নিজের ধৈর্য্যের পরীক্ষা করচেন। তোমাদের ওযে কি চক্ষে দেখেচে সে ত তোমরা জান না। সন্ধ্যেবেলায় তোমাদের কথা ছাড়া কথা নেই। আর পরেশবাবুর কথা উঠলে ও ত একেবারে গলে যায়।

আনন্দময়ী ললিতার মুখের দিকে চাহিলেন, সে খুব জোর করিয়া চোখ তুলিয়া রাখিল বটে, কিন্তু বৃথা লাল হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী কহিলেন,—তোমার বাবার জন্যে ও কত লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেচে! ওর দলের লোকেরা ত ওকে ব্রাহ্ম বলে জাতে ঠেলবার জো করেচে। বিনু, অমন অস্থির হয়ে উঠলে চলবে না বাছা—সত্যি কথাই বলচি। এতে লজ্জা করবারও ত কোনো কারণ দেখিনে। কি বল মা!

এবার ললিতার মুখের দিকে চাহিতেই তাহার চোখ নামিয়া পড়িল। সুচরিতা কহিল,—বিনয় বাবু যে আমাদের আপনার লোক বলে জানেন সে আমরা খুব জানি—কিন্তু সে যে কেবল আমাদেরই গুণে তা নয়, সে ওঁর নিজের ক্ষমতা।

আনন্দময়ী কহিলেন,—তা ঠিক বল্‌তে পারিনে মা। ওকে ত এতটুকুবেলা থেকে দেখচি, এতদিন ওর বন্ধুর মধ্যে এক আমার গোরাই ছিল; এমন কি, আমি দেখেছি ওদের নিজের দলের লোকের সঙ্গেও বিনয় মিল্‌তে পারে না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ওর দু'দিনের আলাপে এমন হয়েছে যে আমরাও ওর আর নাগাল পাইনে। ভেবেছিলুম এই নিয়ে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করব কিন্তু এখন দেখতে পাচ্চি আমাকেও ওরই দলে ভিড়তে হবে। তোমরা সকলকেই হার মানাবে।

এই বলিয়া আনন্দময়ী একবার ললিতার ও একবার সুচরিতার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা চুম্বন গ্রহণ করিলেন।

সুচরিতা বিনয়ের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া সদয়চিত্তে কহিল,—বিনয় বাবু, বাবা এসেচেন ; তিনি বাইরে কৃষ্ণদয়াল বাবুর সঙ্গে কথা কচ্চেন ।

শুনিয়া বিনয় তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। তখন গোরা ও বিনয়ের অসামান্য বন্ধুত্ব লইয়া আনন্দময়ী আলোচনা করিতে লাগিলেন। শ্রোতা দুই জনে যে উদাসীন নহে তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকি ছিল না। আনন্দময়ী জীবনে এই দুটি ছেলেকেই তাঁহার মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন, সংসারে ইহাদের চেয়ে বড় তাঁহার আর কেহ ছিল না। বালিকার পূজার শিবের মত ইহাদিগকে তিনি নিজের হাতেই গড়িয়াছেন বটে কিন্তু ইহারাই তাঁহার সমস্ত আরাধনা গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার মুখে তাঁহার এই দুটি ক্রোড়দেবতার কাহিনী স্নেহরসে এমন মধুর এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে সুচরিতা এবং ললিতা অতৃপ্তহৃদয়ে শুনিতে লাগিল। গোরা এবং বিনয়ের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না কিন্তু আনন্দময়ীর মত এমন মায়ের এমন স্নেহের ভিতর দিয়া তাহাদের সঙ্গে যেন আর একটু বিশেষ করিয়া নূতন করিয়া পরিচয় হইল।

আনন্দময়ীর সহিত আজ জানাশুনা হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি ললিতার রাগ আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। ললিতার মুখে উষ্ণবাক্য শুনিয়া আনন্দময়ী হাসিলেন। কহিলেন,—মা, গোরা আজ জেলখানায় এ দুঃখ যে আমাকে কি রকম বেজেছে তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু সাহেবের উপর আমি রাগ করতে পারিনি। আমি ত গোরাকে জানি, সে যেটাকে ভাল বোঝে তার কাছে আইন কানুন কিছুই মানে না ; গোরার কাজ গোরা করেচে—ওদেরও কর্ত্তব্য ওরা করেছে—এতে যাদের দুঃখ পাবার তারা দুঃখ পাবেই। আমার গোরার চিঠি যদি পড়ে দেখ, মা, তাহলে বুঝতে পারবে ও দুঃখকে ভয় করে নি, কারো উপর মিথ্যে রাগও করে নি—যাতে যা ফল হয় তা সমস্ত নিশ্চয় জেনেই কাজ করেছে। এই বলিয়া গোরার

সযত্নরচিত চিঠিখানি বাক্স হইতে বাহির করিয়া সুচরিতার হাতে দিলেন। কহিলেন—মা, তুমি চেঁচিয়ে পড় আমি আর একবার শুনি।

গোরার সেই আশ্চর্য্য চিঠিখানি পড়া হইয়া গেলে পর তিন জনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আনন্দময়ী তাঁহার চোখের প্রান্ত আঁচল দিয়া মুছিলেন। সে যে চোখের জল তাহাতে শুধু মাতৃহৃদয়ের ব্যথা নহে, তাহার সঙ্গে আনন্দ এবং গৌরব মিশিয়াছিল। তাঁহার গোরা কি যে-সে গোরা! ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার কসুর মাপ করিয়া তাহাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিবেন সে কি তেমনি গোরা! সে যে অপরাধ সমস্ত স্বীকার করিয়া জেলের দুঃখ ইচ্ছা করিয়া নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে! তাহার সে দুঃখের জন্য কাহারো সহিত কোনো কলহ করিবার নাই। গোরা তাহা অকাতরে বহন করিতেছে এবং আনন্দময়ীও ইহা সহ্য করিতে পারিবেন!

ললিতা আশ্চর্য্য হইয়া আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মপরিবারের সংস্কার ললিতার মনে খুব দৃঢ় ছিল; যে মেয়েরা আধুনিক প্রথায় শিক্ষা পায় নাই এবং যাহাদিগকে সে হিঁদুবাড়ির মেয়ে বলিয়া জানিত তাহাদের প্রতি ললিতার শ্রদ্ধা ছিল না। শিশুকালে বরদাসুন্দরী তাহাদের যে অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, হিঁদুবাড়ির মেয়েরাও এমন কাজ করে না, সে অপরাধের জন্য ললিতা বারবার একটু বিশেষ করিয়াই মাথা হেঁট করিয়াছে। আজ আনন্দময়ীর মুখের কয়টি কথা শুনিয়া তাহার অন্তঃকরণ বার বার করিয়া বিস্ময় অনুভব করিতেছে। যেমন বল, তেমনি শান্তি, তেমনি আশ্চর্য্য সদ্বিবেচনা! অসংযত হৃদয়াবেগের জন্য ললিতা নিজেকে এই রমণীর কাছে খুবই খর্ব্ব করিয়া অনুভব করিল। তাহার মনের ভিতর আজ ভারি একটা ক্ষুব্ধতা ছিল, সেই জন্য সে বিনয়ের মুখের দিকে চায় নাই, তাহার সঙ্গে কথাও কয় নাই। কিন্তু আনন্দময়ীর স্নেহে করুণায় ও শান্তিতে

মণ্ডিত মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার বুকের ভিতরকার সমস্ত বিদ্রোহের তাপ যেন জুড়াইয়া গেল—চারিদিকের সকলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সহজ হইয়া আসিল। ললিতা আনন্দময়ীকে কহিল,—গৌরবাবু যে এত শক্তি কোথা থেকে পেয়েছেন তা আপনাকে দেখে আজ বুঝ্‌তে পারলুম।

আনন্দময়ী কহিলেন,—ঠিক বোঝ নি। গোরা যদি আমার সাধারণ ছেলের মত হত তা'হলে আমি কোথা থেকে বল পেতুম! তা'হলে কি তার দুঃখ আমি এমন করে সহ্য করতে পারতুম!

ললিতার মনটা আজ কেন যে এতটা বিকল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার একটু ইতিহাস বলা আবশ্যক।

এ কয়দিন প্রত্যহ সকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই প্রথম কথা ললিতার মনে এই জাগিয়াছে যে, আজ বিনয় বাবু আসিবেন না। অথচ সমস্ত দিনই তাহার মন একমুহূর্ত্তের জন্যও বিনয়ের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে ছাড়ে নাই। ক্ষণে ক্ষণে কেবলি সে মনে করিয়াছে বিনয় হয়ত আসিয়াছে; হয়ত সে উপরে না আসিয়া নীচের ঘরে পরেশ বাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে। এই জন্য দিনের মধ্যে কতবার সে অকারণে এঘরে ওঘরে ঘুরিয়াছে তাহার ঠিক নাই। অবশেষে দিন যখন অবসান হয়, রাত্রে যখন সে বিছানায় শুইতে যায় তখন সে নিজের মনখানা লইয়া কি যে করিবে ভাবিয়া পায় না। বুক ফাটিয়া কান্না আসে;—সঙ্গে সঙ্গে রাগ হইতে থাকে; কাহার উপরে রাগ বুঝিয়া উঠাই শক্ত। রাগ বুঝি নিজের উপরেই! কেবলি মনে হয়, এ কি হইল! আমি বাঁচিব কি করিয়া! কোনো দিকে তাকাইয়া যে কোনো রাস্তা দেখিতে পাই না! এমন করিয়া কতদিন চলিবে!

ললিতা জানে, বিনয় হিন্দু; কোনোমতেই বিনয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না। অথচ নিজের হৃদয়কে কোনোমতেই বশ মানাইতে না পারিয়া লজ্জায় ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেছে। বিনয়ের

হৃদয় যে তাহার প্রতি বিমুখ নহে একথা সে বুঝিয়াছে; বুঝিয়াছে বলিয়াই নিজেকে সম্বরণ করা তাহার পক্ষে আজ এত কঠিন হইয়াছে। সেই জন্যই সে যখন উতলা হইয়া বিনয়ের আশাপথ চাহিয়া থাকে সেই সঙ্গেই তাহার মনের ভিতরে একটা ভয় হইতে থাকে পাছে বিনয় আসিয়া পড়ে। এম্‌নি করিয়া নিজের সঙ্গে টানাটানি করিতে করিতে আজ সকালে তাহার ধৈর্য্য আর বাঁধ মানিল না। তাহার মনে হইল বিনয় না আসাতেই তাহার প্রাণের ভিতরটা কেবলি অশান্ত হইয়া উঠিতেছে; একবার দেখা হইলেই এই অস্থিরতা দূর হইয়া যাইবে।

সকালবেলা সে সতীশকে নিজের ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল। সতীশ আজকাল মাসিকে পাইয়া বিনয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বচর্চ্চার কথা একরকম ভুলিয়াই ছিল। ললিতা তাহাকে কহিল—বিনয় বাবুর সঙ্গে তোর বুঝি ঝগড়া হয়ে গেছে!

সে এই অপবাদ সতেজে অস্বীকার করিল। ললিতা কহিল,—ভারি ত তোর বন্ধু! তুইই কেবল বিনয় বাবু বিনয় বাবু করিস্ তিনি ত ফিরেও তাকান না।

সতীশ কহিল,—ইস্! তাইত! কখ্‌খনো না।

পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সতীশকে নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার জন্য এমনি করিয়া বারম্বার গলার জোর প্রয়োগ করিতে হয়। আজ প্রমাণকে তাহার চেয়েও দৃঢ়তর করিবার জন্য সে তখনি বিনয়ের বাসায় ছুটিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া কহিল—তিনি যে বাড়িতে নেই, তারই জন্যে আস্‌তে পারেন নি!

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল—এ ক'দিন আসেন নি কেন?

সতীশ কহিল,—ক'দিনই যে ছিলেন না।

তখন ললিতা সুচরিতার কাছে গিয়া কহিল—দিদি ভাই, গৌর বাবুর মায়ের কাছে আমাদের কিন্তু একবার যাওয়া উচিত।

সুচরিতা কহিল—তাঁদের সঙ্গে যে পরিচয় নেই।

ললিতা কহিল—বাঃ গৌরবাবুর বাপ যে বাবার ছেলেবেলাকার বন্ধু ছিলেন।

সুচরিতার মনে পড়িয়া গেল—কহিল—হাঁ তা বটে!

সুচরিতাও অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল—ললিতা ভাই, তুমি যাও, বাবার কাছে বল গে!

ললিতা কহিল,—না, আমি বল্‌তে পারব না, তুমি বল গে!

শেষকালে সুচরিতাই পরেশ বাবুর কাছে গিয়া কথাটা পাড়িতেই তিনি বলিলেন,—ঠিক বটে, এতদিন আমাদের যাওয়া উচিত ছিল।

আহারের পর যাওয়ার কথাটা যখনি স্থির হইয়া গেল তখনি ললিতার মন বাঁকিয়া উঠিল। তখন আবার কোথা হইতে অভিমান এবং সংশয় আসিয়া তাহাকে উল্টাদিকে টানিতে লাগিল। সুচরিতাকে গিয়া সে কহিল—দিদি, তুমি বাবার সঙ্গে যাও। আমি যাব না।

সুচরিতা কহিল,—সে কি হয়! তুই না গেলে আমি একলা যেতে পারব না। লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার—চল্‌ ভাই, গোল করিস্‌নে।

অনেক অনুনয়ে ললিতা গেল। কিন্তু বিনয়ের কাছে সে যে পরাস্ত হইয়াছে; বিনয় অনায়াসেই তাহাদের বাড়ি না আসিয়া পারিল, আর, সে আজ বিনয়কে দেখিতে ছুটিয়াছে এই পরাভবের অপমানে তাহার বিষম একটা রাগ হইতে লাগিল। বিনয়কে দেখিতে পাইবার আশাতেই আনন্দময়ীর বাড়ি আসিবার জন্য যে তাহার একটা আগ্রহ জন্মিয়াছিল, এই কথাটা সে মনে মনে একেবারে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং নিজের সেই জিদ বজায় রাখিবার জন্য, না বিনয়ের দিকে তাকাইল, না তাহার নমস্কার ফিরাইয়া দিল, না তাহার সঙ্গে একটা কথা কহিল। বিনয় মনে করিল, ললিতার কাছে তাহার মনের গোপন

কথাটা ধরা পড়িয়াছে বলিয়াই সে অবজ্ঞার দ্বারা তাহাকে এমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছে। ললিতা যে তাহাকে ভাল বাসিতেও পারে একথা অনুমান করিবার উপযুক্ত আত্মাভিমান বিনয়ের ছিল না।

বিনয় আসিয়া সঙ্কোচে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, পরেশবাবু এখন বাড়ি যেতে চাচ্চেন, এঁদের সকলকে খবর দিতে বল্লেন। —ললিতা যাহাতে তাহাকে না দেখিতে পায় এমন করিয়াই বিনয় দাঁড়াইয়াছিল।

আনন্দময়ী কহিলেন সে কি হয়! কিছু মিষ্টিমুখ না করে বুঝি যেতে পাবেন! আর বেশি দেরি হবে না। তুমি এখানে একটু বোসো বিনয়, আমি একবার দেখে আসি। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ঘরের মধ্যে এসে বোস।

বিনয় ললিতার দিকে আড় করিয়া কোনোমতে দূরে এক জায়গায় বসিল। যেন বিনয়ের প্রতি তাহার ব্যবহারের কোনো বৈলক্ষণ্য হয় নাই এমনি সহজভাবে ললিতা কহিল, বিনয়বাবু, আপনার বন্ধু সতীশকে আপনি একেবারে ত্যাগ করেচেন কি না জান্‌বার জন্যে সে আজ সকালে আপনার বাড়ি গিয়েছিল যে!

হঠাৎ দৈববাণী হইলে মানুষ যেমন আশ্চর্য্য হইয়া যায় সেইরূপ বিস্ময়ে বিনয় চমকিয়া উঠিল। তাহার সেই চমকটা দেখা গেল বলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। তাহার স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যের সঙ্গে কোনো জবাব করিতে পারিল না; মুখ ও কর্ণমূল লাল করিয়া কহিল—সতীশ গিয়েছিল না কি! আমিত বাড়িতে ছিলুম না!

ললিতার এই সামান্য একটা কথায় বিনয়ের মনে একটা অপরিমিত আনন্দ জন্মিল। একমুহূর্ত্তে বিশ্বজগতের উপর হইতে একটা প্রকাণ্ড সংশয় যেন নিশ্বাসরোধকর দুঃস্বপ্নের মত দূর হইয়া গেল। যেন এইটুকু ছাড়া পৃথিবীতে তাহার কাছে প্রার্থনীয় আর কিছু ছিল না। তাহার

মন বলিতে লাগিল, বাঁচিলাম, বাঁচিলাম! ললিতা রাগ করে নাই, ললিতা তাহার প্রতি কোনো সন্দেহ করিতেছে না।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাধা কাটিয়া গেল। সুচরিতা হাসিয়া কহিল—বিনয়বাবু হঠাৎ আমাদের নখী দন্তী শৃঙ্গী অস্ত্রপাণি কিম্বা ঐরকম একটা কিছু বলে সন্দেহ করে বসেচেন।

বিনয় কহিল—পৃথিবীতে যারা মুখ ফুটে নালিশ করতে পারে না, চুপ করে থাকে, তারাই উল্টে আসামী হয়। দিদি, তোমার মুখে একথা শোভা পায় না,—তুমি নিজে কতদূরে চলে গিয়েছ এখন অন্যকে দূর বলে মনে করচ।

বিনয় আজ প্রথম সুচরিতাকে দিদি বলিল। সুচরিতার কানে তাহা মিষ্ট লাগিল। বিনয়ের প্রতি প্রথম পরিচয় হইতেই সুচরিতার যে একটি সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল এই দিদি সম্বোধনমাত্রেই তাহা যেন একটি স্নেহপূর্ণ বিশেষ আকার ধারণ করিল।

পরেশবাবু তাঁহার মেয়েদের লইয়া যখন বিদায় হইয়া গেলেন তখন দিন প্রায় শেষ হইয়া গেছে। বিনয় আনন্দময়ীকে কহিল, মা, আজ তোমাকে কোনো কাজ করতে দেব না। চল উপরের ঘরে।

বিনয় তাহার চিত্তের উদ্বেলতা সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। আনন্দময়ীকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া মেঝের উপরে নিজের হাতে মাছুর পাতিয়া তাঁহাকে বসাইল। আনন্দময়ী বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—বিনু, কি, তোর কথাটা কি?

বিনয় কহিল, আমার কোনো কথা নেই, তুমি কথা বল! পরেশবাবুর মেয়েদিগকে আনন্দময়ীর কেমন লাগিল সেই কথা শুনিবার জন্যই বিনয়ের মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, বেশ, এই জন্যে তুই বুঝি আমাকে ডেকে আনলি! আমি বলি, বুঝি কোনো কথা আছে।

বিনয় কহিল, না ডেকে আন্‌লে এমন সূর্য্যাস্তটিত দেখ্‌তে পেতে না।

সেদিন কলিকাতার ছাদগুলির উপরে অগ্রহায়ণের সূর্য্য মলিনভাবেই অস্ত যাইতেছিল—বর্ণচ্ছটার কোনো বৈচিত্র্য ছিল না—আকাশের প্রান্তে ধূমলবর্ণের বাষ্পের মধ্যে সোনার আভা অস্পষ্ট হইয়া জড়াইয়াছিল। কিন্তু এই ম্লান সন্ধ্যার ধূসরতাও আজ বিনয়ের মনকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, চারিদিক তাহাকে যেন নিবিড় করিয়া ঘিরিয়াছে আকাশ তাহাকে যেন স্পর্শ করিতেছে।

আনন্দময়ী কহিলেন, মেয়ে দুটি বড় লক্ষ্মী!

বিনয় এই কথাটাকে থামিতে দিল না। নানা দিক্ দিয়া এই আলোচনাকে জাগ্রত করিয়া রাখিল। পরেশ বাবুর মেয়েদের সম্বন্ধে কত দিনকার কত ছোটখাট ঘটনার কথা উঠিয়া পড়িল—তাহার অনেকগুলিই অকিঞ্চিৎকর কিন্তু সেই অগ্রহায়ণের ম্লায়মান নিভৃত সন্ধ্যায় নিরালাঘরে বিনয়ের উৎসাহ এবং আনন্দময়ীর ঔৎসুক্য দ্বারা এই সকল ক্ষুদ্র গৃহকোণের অখ্যাত ইতিহাসখণ্ড একটি গম্ভীর মহিমায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী হঠাৎ এক সময়ে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, সুচরিতার সঙ্গে যদি গোরার বিয়ে হতে পারে ত বড় খুসি হই।

বিনয় লাফাইয়া উঠিল, কহিল, মা, এ কথা আমি অনেক বার ভেবেছি। ঠিক গোরার উপযুক্ত সঙ্গিনী!

আনন্দময়ী। কিন্তু হবে কি?

বিনয়। কেন হবে না? আমার মনে হয় গোরা যে সুচরিতাকে পছন্দ করে না তা নয়!

গোরার মন যে কোনো একজায়গায় আকৃষ্ট হইয়াছে আনন্দময়ীর কাছে তাহা অগোচর ছিল না। সে মেয়েটি যে সুচরিতা তাহাও তিনি বিনয়ের নানা কথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আনন্দময়ী কহিলেন, কিন্তু সুচরিতা কি হিন্দুর ঘরে বিয়ে করবে?

বিনয় কহিল, আচ্ছা মা, গোরা কি ব্রাহ্মর ঘরে বিয়ে করতে পারে না? তোমার কি তাতে মত নেই?

আনন্দময়ী। আমার খুব মত আছে।

বিনয় পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল—আছে?

আনন্দময়ী কহিলেন, আছে বৈ কি বিনু! মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিল নিয়েই বিয়ে,—সে সময়ে কোন্ মন্তরটা পড়া হল তা নিয়ে কি আসে যায় বাবা! যেমন করে হোক্ ভগবানের নামটা নিলেই হল!

বিনয়ের মনের ভিতর হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। সে উৎসাহিত হইয়া কহিল, মা, তোমার মুখে যখন এ সব কথা শুনি আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়। এমন ঔদার্য্য তুমি পেলে কোথা থেকে?

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, গোরার কাছ থেকে পেয়েছি।

বিনয় কহিল, গোরা ত এর উল্টো কথাই বলে!

আনন্দময়ী। বল্লে কি হবে! আমার যা কিছু শিক্ষা সব গোরা থেকেই হয়েচে। মানুষ বস্তুটি যে কত সত্য আর মানুষ যা নিয়ে দলাদলি করে, ঝগড়া করে মরে, তা যে কত মিথ্যে, সে কথা, ভগবান গোরাকে যে দিন দিয়েচেন সেই দিনই বুঝিয়ে দিয়েচেন। বাবা, ব্রাহ্মই বা কে, আর হিন্দুই বা কে! মানুষের হৃদয়ের ত কোনো জাত নেই—সেই খানেই ভগবান সকলকে মেলান এবং নিজে এসেও মেলেন;—তাঁকে ঠেলে দিয়ে মন্তর আর মতের উপরেই মেলাবার ভার দিলে চলে কি?

বিনয় আনন্দময়ীর পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, মা, তোমার কথা আমার বড় মিষ্টি লাগ্‌ল! আমার দিনটা আজ সার্থক হয়েচে!

৩৮

সুচরিতার মাসি হরিমোহিনীকে লইয়া পরেশের পরিবারে একটা গুরুতর অশান্তি উপস্থিত হইল। তাহা বিবৃত করিয়া বলিবার পূর্ব্বে,

হরিমোহিনী সুচরিতার কাছে নিজের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাই সংক্ষেপ করিয়া নীচে লেখা গেল।

আমি তোমার মায়ের চেয়ে দুই বছরের বড় ছিলাম। বাপের বাড়িতে আমাদের দুই জনের আদরের সীমা ছিল না। কেননা, তখন আমাদের ঘরে কেবল আমরা দুই কন্যাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—বাড়িতে আর শিশু কেহ ছিল না। কাকাদের আদরে আমাদের মাটিতে পা ফেলিবার অবকাশ ঘটিত না।

আমার বয়স যখন আট তখন পাল্‌সার বিখ্যাত রায়চৌধুরীদের ঘরে আমার বিবাহ হয়। তাঁহারা কুলেও যেমন ধনেও তেমন। কিন্তু আমার ভাগ্যে সুখ ঘটিল না। বিবাহের সময় খরচপত্র লইয়া আমার শ্বশুরের সঙ্গে পিতার বিবাদ বাধিয়াছিল। আমার পিতৃগৃহের সেই অপরাধ আমার শ্বশুরবংশ অনেকদিন পর্য্যন্ত ক্ষমা করিতে পারেন নাই। সকলেই বলিত, আমাদের ছেলের আবার বিয়ে দেব, দেখি ও মেয়েটার কি দশা হয়। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়াই বাবা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কখনো ধনীর ঘরে মেয়ে দেবেন না। তাই তোমার মাকে গরীবের ঘরেই দিয়াছিলেন।

বহু পরিবারের ঘর ছিল, আমাকে আট নয় বৎসর বয়সের সময়েই রান্না করিতে হইত। প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন লোকে খাইত। সকলের পরিবেষণের পরে কোনো দিন শুধু ভাত, কোনো দিন বা ডাল ভাত খাইয়াই কাটাইতে হইত। কোনো দিন বেলা দুইটার সময়ে কোনো দিন বা একেবারে বেলা গেলে আহার করিতাম। আহার করিয়াই বৈকালের রান্না চড়াইতে যাইতে হইত। রাত এগারোটা বারোটার সময় খাইবার অবকাশ ঘটিত। শুইবার কোনো নির্দ্দিষ্ট জায়গা ছিল না। অন্তঃপুরে যাহার সঙ্গে যেদিন সুবিধা হইত তাহার সঙ্গেই শুইয়া পড়িতাম। কোনো দিন বা পিড়ি পাতিয়া নিদ্রা দিতে হইত।

বাড়িতে আমার প্রতি সকলের যে অনাদর ছিল আমার স্বামীর মনও তাহাতে বিকৃত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি আমাকে দূরে দূরেই রাখিয়াছিলেন।

এমন সময়ে আমার বয়স যখন সতেরো তখন আমার কন্যা মনোরমা জন্মগ্রহণ করে। মেয়েকে জন্ম দেওয়াতে শ্বশুরকুলে আমার গঞ্জনা আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। আমার সকল অনাদর সকল লাঞ্ছনার মধ্যে এই মেয়েটিই আমার একমাত্র সান্ত্বনা ও আনন্দ ছিল। মনোরমাকে তাহার বাপ এবং আর কেহ তেমন করিয়া আদর করে নাই বলিয়াই সে আমার প্রাণপণ আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল।

তিন বৎসর পরে যখন আমার একটি ছেলে হইল তখন হইতে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তখন আমি বাড়ির গৃহিণী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হইলাম। আমার শাশুড়ী ছিলেন না—আমার শ্বশুরও মনোরমা জন্মিবার দুই বৎসর পরেই মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরেই বিষয় লইয়া দেবরদের সঙ্গে মকদ্দমা বাধিয়া গেল। অবশেষে মামলায় অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া আমরা পৃথক হইলাম।

মনোরমার বিবাহের সময় আসিল। পাছে তাহাকে দূরে লইয়া যায়, পাছে তাহাকে আর দেখিতে না পাই এই ভয়ে পাল্‌সা হইতে ৫।৬ ক্রোশ তফাতে সিমুলে গ্রামে তাহার বিবাহ দিলাম। ছেলেটিকে কার্ত্তিকের মত দেখতে। যেমন রং তেম্‌নি চেহারা—খাওয়া পরার সঙ্গতিও তাহাদের ছিল।

একদিন আমার যেমন অনাদর ও কষ্ট গিয়াছে, কপাল ভাঙিবার পূর্ব্বে বিধাতা কিছুদিনের জন্ত আমাকে তেমনি সুখ দিয়াছিলেন। শেষাশেষি আমার স্বামী আমাকে বড়ই আদর ও শ্রদ্ধা করিতেন, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোনো কাজই করিতেন না। এত সৌভাগ্য আমার সহিবে কেন? কলেরা হইয়া চারিদিনের ব্যবধানে আমার

ছেলে এবং স্বামী মারা গেছেন। যে দুঃখ কল্পনা করিলেও অসহ্য বোধ হয় তাহাও যে মানুষের সয় ইহাই জানাইবার জন্ত ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন।

ক্রমেই জামাইয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। সুন্দর ফুলের মধ্যে যে এমন কাল সাপ লুকাইয়া থাকে তাহা কে মনে করিতে পারে? সে যে কুসংসর্গে পড়িয়া নেশা ধরিয়াছিল তাহা আমার মেয়েও কোন দিন আমাকে বলে নাই। জামাই যখন-তখন আসিয়া নানা অভাব জানাইয়া আমার কাছে টাকা চাহিয়া লইয়া যাইত। সংসারে আমার ত আর কাহারও জন্ত টাকা জমাইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না তাই জামাই যখন আবদার করিয়া আমার কাছ হইতে কিছু চাহিত সে আমার ভালই লাগিত। মাঝে মাঝে আমার মেয়ে আমাকে বারণ করিত—আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিত, তুমি অমনি করিয়া উঁহাকে টাকা দিয়া উঁহার অভ্যাস খারাপ করিয়া দিতেছ—টাকা হাতে পাইলে উনি কোথায় যে কেমন করিয়া উড়াইয়া দেন তাহার ঠিকানা নাই।—আমি ভাবিতাম তাহার স্বামী আমার কাছে এমন করিয়া টাকা লইলে তাহার শ্বশুরকুলের অগৌরব হইবে এই ভয়েই বুঝি মনোরমা আমাকে টাকা দিতে নিষেধ করে।

তখন আমার এমন বুদ্ধি হইল আমি আমার মেয়েকে লুকাইয়া জামাইকে নেশার কড়ি জোগাইতে লাগিলাম। মনোরমা যখন তাহা জানিতে পারিল তখন সে একদিন আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া তাহার স্বামীর কলঙ্কের কথা সমস্ত জানাইয়া দিল। তখন আমি কপাল চাপড়াইয়া মরি! দুঃখের কথা কি আর বলিব আমার একজন দেওরই কুসঙ্গ এবং কুবুদ্ধি দিয়া আমার জামাইয়ের মাথা খাইয়াছে!

টাকা দেওয়া যখন বন্ধ করিলাম এবং জামাই যখন সন্দেহ করিল যে, আমার মেয়েই আমাকে নিষেধ করিয়াছে তখন তাহার আর কোনো

আবরণ রহিল না। তখন সে এত অত্যাচার আরম্ভ করিল, আমার মেয়েকে পৃথিবীর লোকের সামনে এমন করিয়া অপমান করিতে লাগিল যে তাহাই নিবারণ করিবার জন্য আবার আমি আমার মেয়েকে লুকাইয়া তাহাকে টাকা দিতে লাগিলাম। জানিতাম আমি তাহাকে রসাতলে দিতেছি কিন্তু মনোরমাকে সে অসহ্য পীড়ন করিতেছে এ সংবাদ পাইলে আমি কোনো মতে স্থির থাকিতে পারিতাম না।

অবশেষে একদিন—সে দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। মাঘ মাসের শেষাশেষি, সে বছর সকাল সকাল গরম পড়িয়াছে; আমরা বলাবলি করিতেছিলাম এরি মধ্যে আমাদের খিড়কির বাগানের গাছগুলো আমের বোলে ভরিয়া গেছে! সেই মাঘের অপরাহ্ণে আমাদের দরজার কাছে পাল্কী আসিয়া থামিল। দেখি, মনোরমা হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, কি মনু, তোদের খবর কি? মনোরমা হাসি মুখে বলিল, খবর না থাকলে বুঝি মার বাড়িতে শুধু শুধু আসতে নেই!

আমার বেয়ান মন্দ লোক ছিলেন না। তিনি আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, বউমা পুত্রসম্ভাবিতা, সন্তান প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মার কাছে থাকিলেই ভাল। আমি ভাবিলাম সেই কথাটাই বুঝি সত্য। কিন্তু জামাই যে এই অবস্থাতেও মনোরমাকে মারধোর করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বিপৎপাতের আশঙ্কাতেই বেয়ান তাঁহার পুত্রবধূকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। মনু এবং তাহার শাশুড়ীতে মিলিয়া আমাকে এমনি করিয়াই লুকাইয়া রাখিল। মেয়েকে আমি নিজের হাতে তেল মাখাইয়া স্নান করাইতে চাহিলে মনোরমা নানা ছুতার কাটাইয়া দিত;—তাহার কোমল অঙ্গে যে সব আঘাতের দাগ পড়িয়াছিল সে তাহার মায়ের দৃষ্টির কাছেও প্রকাশ করিতে চাহে নাই।

জামাই মাঝে মাঝে আসিয়া মনোরমাকে বাড়ি ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য গোলমাল করিত। মেয়ে আমার কাছে থাকাতে টাকার আবদার করিতে তাহার ব্যাঘাত ঘটিত। ক্রমে সে বাধাও আর সে মানিল না। টাকার জন্য মনোরমার সাম্‌নেই আমার প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। মনোরমা জেদ করিয়া বলিত কোনোমতেই টাকা দিতে পারিবে না—কিন্তু আমার বড় দুর্ব্বল মন, পাছে জামাই আমার মেয়ের উপর অত্যন্ত বেশি বিরক্ত হইয়া উঠে এই ভয়ে আমি তাহাকে কিছু না দিয়া থাকিতে পারিতাম না।

মনোরমা একদিন বলিল, মা, তোমার টাকা কড়ি সমস্ত আমিই রাখিব। বলিয়া আমার চাবি ও বাক্স সব দখল করিয়া বসিল। জামাই আসিয়া যখন আমার কাছে আর টাকা পাইবার সুবিধা দেখিল না এবং যখন মনোরমাকে কিছুতেই নরম করিতে পারিল না—তখন সুর ধরিল মেজবৌকে বাড়িতে লইয়া যাইব। আমি মনোরমাকে বলিতাম, দে, মা, ওকে কিছু টাকা দিয়েই বিদায় করে দে,—নইলে ও কি করে বসে কে জানে। কিন্তু আমার মনোরমা একদিকে যেমন নরম আর একদিকে তেমনি শক্ত ছিল। সে বলিত, না, টাকা কোনোমতেই দেওয়া হবে না।

জামাই একদিন আসিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—কাল আমি বিকাল বেলা পাল্কী পাঠাইয়া দেব। বৌকে যদি ছেড়ে না দাও তবে ভাল হবে না, বলে রাখছি।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাল্কী আসিলে আমি মনোরমাকে বলিলাম, মা, আর দেরি করে কাজ নেই, আবার আস্‌চে হপ্তায় তোমাকে আনবার জন্য লোক পাঠাব।

মনোরমা কহিল, আজ থাক, আজ আমার যেতে ইচ্ছা হচ্চে না মা, আর দুদিন বাদে আস্‌তে বোলো।

আমি বলিলাম, মা, পাল্কী ফিরিয়ে দিলে কি আমার ক্ষেপা জামাই রক্ষা রাখ্‌বে? কাজ নেই, মনু, তুমি আজই যাও।

মনু বলিল, না, মা, আজ নয়; আমার শ্বশুর কলকাতায় গিয়েছেন ফাল্গুনের মাঝামাঝি তিনি ফিরে আসবেন তখন আমি যাব।

আমি তবু বলিলাম, না, কাজ নাই মা।

তখন মনোরমা প্রস্তুত হইতে গেল। আমি তাহার শ্বশুর বাড়ির চাকর ও পাল্কীর বেহারাদিগকে খাওয়াইবার আয়োজনে ব্যস্ত রহিলাম। যাইবার আগে একটু যে তাহার কাছে থাকিব, সে দিন যে তাহাকে একটু বিশেষ করিয়া যত্ন করিয়া লইব, নিজের হাতে তাহাকে সাজাইয়া দিব, সে যে খাবার ভালবাসে তাহাই তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়া বিদায় দিব, এমন অবকাশ পাইলাম না। ঠিক পাল্কীতে উঠিবার আগে আমাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া কহিল মা আমি তবে চলিলাম।

সে যে সত্যই চলিল সে কি আমি জানিতাম! সে যাইতে চাহে নাই আমি জোর করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছি—এই দুঃখে বুক আজ পর্য্যন্ত পুড়িতেছে; সে আর কিছুতেই শীতল হইল না!

সেই রাত্রেই গর্ভপাত হইয়া মনোরমার মৃত্যু হইল এই খবর যখন পাইলাম তাহার পূর্ব্বেই গোপনে তাড়াতাড়ি তাহার সৎকার শেষ হইয়া গেছে।

যাহার কিছু বলিবার নাই, করিবার নাই, ভাবিয়া যাহার কিনারা পাওয়া যায় না, কাঁদিয়া যাহার অন্ত হয় না, সেই দুঃখ যে কি দুঃখ, তাহা তোমরা বুঝিবে না—সে বুঝিয়া কাজ নাই।

আমার ত সবই গেল কিন্তু তবু আপদ চুকিল না। আমার স্বামী-পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই দেবররা আমার বিষয়ের প্রতি লোভ দিতেছিল। তাহারা জানিত আমার মৃত্যুর পরে বিষয়সম্পত্তি সমুদয় তাহাদেরই হইবে কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের সবুর সহিতেছিল না। ইহাতে কাহারো

দোষ দেওয়া চলে না; সত্যই আমার মত অভাগিনীর বাঁচিয়া থাকাই যে একটা অপরাধ। সংসারে যাহাদের নানা প্রয়োজন আছে, আমার মত প্রয়োজনহীন লোক বিনাহেতুতে তাহাদের জায়গা জুড়িয়া বাঁচিয়া থাকিলে লোকে সহ্য করে কেমন করিয়া!

মনোরমা যত দিন বাঁচিয়াছিল ততদিন আমি দেবরদের কোনো কথায় ভুলি নাই। আমার বিষয়ের অধিকার লইয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের সঙ্গে লড়িয়াছি! আমি যতদিন বাঁচি মনোরমার জন্য টাকা সঞ্চয় করিয়া তাহাকে দিয়া যাইব এই আমার পণ ছিল। আমি আমার কন্যার জন্য টাকা জমাইবার চেষ্টা করিতেছি ইহাই আমার দেবরদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাদের মনে হইত আমি তাহাদেরই ধন চুরি করিতেছি। নীলকান্ত বলিয়া কর্ত্তার একজন পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিল সেই আমার সহায় ছিল। আমি যদি বা আমার প্রাপ্য কিছু ছাড়িয়া দিয়া আপসে নিষ্পত্তির চেষ্টা করিতাম সে কোনোমতেই রাজি হইত না—সে বলিত আমাদের হকের এক পয়সা কে লয় দেখিব। এই হকের লড়াইয়ের মাঝখানেই আমার কন্যার মৃত্যু হইল। তাহার পরদিনেই আমার মেঝদেবর আসিয়া আমাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন। বলিলেন, বৌদিদি ঈশ্বর তোমার যা অবস্থা করিলেন তাহাতে তোমার আর সংসারে থাকা উচিত হয় না। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাক তীর্থে গিয়া ধর্ম্মেকর্ম্মে মন দাও আমরা তোমার খাওয়া পরার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

আমি আমাদের গুরুঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। বলিলাম ঠাকুর, অসহ্য দুঃখের হাত হইতে কি করিয়া বাঁচিব আমাকে বলিয়া দাও—উঠিতে বসিতে আমার কোথাও কোনো সান্ত্বনা নাই—আমি যেন বেড়া-আগুনের মধ্যে পড়িয়াছি, যেখানেই যাই, যেদিকেই ফিরি, কোথাও আমার যন্ত্রণার এতটুকু অবসানের পথ দেখিতে পাই না।

গুরু আমাকে আমাদের ঠাকুর ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, এই গোপীবল্লভই তোমার স্বামী পুত্র কন্যা সবই। ইঁহার সেবা করিয়াই তোমার সমস্ত শূন্য পূর্ণ হইবে।

আমি দিনরাত ঠাকুরঘরেই পড়িয়া রহিলাম। ঠাকুরকেই সমস্ত মন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম—কিন্তু তিনি নিজে না লইলে আমি দিব কেমন করিয়া? তিনি লইলেন কই?

নীলকান্তকে ডাকিয়া কহিলাম, নীলুদাদা আমার জীবনস্বত্ব আমি দেবরদেরই লিখিয়া দিব স্থির করিয়াছি। তাহারা খোরাকীবাবদ মাসে মাসে কিছু করিয়া টাকা দিবে।

নীলকান্ত কহিল, সে কখনো হইতেই পারে না। তুমি মেয়েমানুষ এ সব কথায় থাকিয়ো না।

আমি বলিলাম, আমার আর সম্পত্তিতে প্রয়োজন কি?

নীলকান্ত কহিল, তা বলিলে কি হয়! আমাদের যা হক্ তা ছাড়িব কেন? এমন পাগ্‌লামি করিয়ো না।

নীলকান্ত হকের চেয়ে বড় আর কিছুই দেখিতে পায় না। আমি বড় মুস্কিলেই পড়িলাম। বিষয় কর্ম্ম আমার কাছে বিষের মত ঠেকিতেছে;—কিন্তু জগতে আমার ঐ একমাত্র বিশ্বাসী নীলকান্তই আছে তাহার মনে আমি কষ্ট দিই কি করিয়া! সে যে বহু দুঃখে আমার ঐ এক 'হক্' বাঁচাইয়া আসিয়াছে।

শেষকালে একদিন নীলকান্তকে গোপন করিয়া একখানা কাগজে সহি দিলাম। তাহাতে কি যে লেখা ছিল তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার সই করিতে ভয় কি—আমি এমন কি রাখিতে চাই যাহা আর কেহ ঠকাইয়া লইলে সহ্য হইবে না। সবই ত আমার শ্বশুরের, তাঁহার ছেলেরা পাইবে পাক্।

লেখাপড়া রেজেষ্ট্রী হইয়া গেলে আমি নীলকান্তকে ডাকিয়া কহিলাম, নীলুদাদা, রাগ করিয়ো না, আমার যাহা কিছু ছিল লিখিয়া পড়িয়া দিয়াছি, আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

নীলকান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিল, অঁ্যা, করিয়াছ কি!

যখন দলিলের খস্‌ড়া পড়িয়া দেখিল সত্যই আমি আমার সমস্ত স্বত্বত্যাগ করিয়াছি তখন নীলকান্তের ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহার প্রভুর মৃত্যুর পর হইতে আমার ঐ 'হক্' বাঁচানোই তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তাহার সমস্ত বুদ্ধি সমস্ত শক্তি ইহাতেই অবিশ্রাম নিযুক্ত ছিল। এ লইয়া মাম্‌লা মকদ্দমা, উকীলবাড়ি হাঁটাহাঁটি, আইন খুঁজিয়া বাহির করা ইহাতেই সে সুখ পাইয়াছে—এমন কি, তাহার নিজের ঘরের কাজ দেখিবারও সময় ছিল না। সেই হক্ যখন নির্ব্বোধ মেয়েমানুষের কলমের এক আঁচড়েই উড়িয়া গেল তখন নীলকান্তকে শান্ত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সে কহিল, যাক এখানকার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ চুকিল, আমি চলিলাম।

অবশেষে নীলুদাদা এমন করিয়া রাগ করিয়া আমার কাছ হইতে বিদায় হইয়া যাইবে শ্বশুরবাড়ির ভাগ্যে এই কি আমার শেষ লিখন ছিল! আমি তাহাকে অনেক মিনতি করিয়া ডাকিয়া বলিলাম দাদা, আমার উপর রাগ করিও না। আমার কিছু জমানো টাকা আছে তাহা হইতে তোমাকে এই পাঁচশো টাকা দিতেছি—তোমার ছেলের বৌ যেদিন আসিবে সেই দিন আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া এই টাকা হইতে তাহার গহনা গড়াইয়া দিয়ো।

নীলকান্ত কহিল,—আমার আর টাকায় প্রয়োজন নাই। আমার মনিবের সবই যখন গেল তখন ও পাঁচশো টাকা লইয়া আমার সুখ হইবে না। ও থাক্!

এই বলিয়া আমার স্বামীর শেষ অকৃত্রিম বন্ধু আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আমি ঠাকুরঘরে আশ্রয় লইলাম। আমার দেবররা বলিল, তুমি তীর্থবাসে যাও।

আমি কহিলাম, আমার শ্বশুরের ভিটাই আমার তীর্থ, আর আমার ঠাকুর যেখানে আছে সেখানেই আমার আশ্রয়।

কিন্তু আমি যে বাড়ির কোনো অংশ অধিকার করিয়া থাকি তাহাও তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইতে লাগিল। তাহারা ইতিমধ্যে আমাদের বাড়িতে জিনিষপত্র আনিয়া কোন্ ঘর কে কিভাবে ব্যবহার করিবে তাহা সমস্তই ঠিক করিয়া লইয়াছিল। শেষকালে তাহারা বলিল,—তোমার ঠাকুর তুমি লইয়া যাইতে পার আমরা তাহাতে আপত্তি করিব না।

যখন তাহাতেও আমি সঙ্কোচ করিতে লাগিলাম তখন তাহারা কহিল,—এখানে তোমার খাওয়া পরা চলিবে কি করিয়া?

আমি বলিলাম,—কেন, তোমরা যা খোরাকী বরাদ্দ করিয়াছ তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে।

তাহারা কহিল,—কই খোরাকীর ত কোনো কথা নাই!

তাহার পর আমার ঠাকুর লইয়া আমার বিবাহের ঠিক চউত্রিশ বৎসর পরে একদিন শ্বশুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নীলুদাদার সন্ধান লইতে গিয়া শুনিলাম তিনি আমার পূর্ব্বেই বৃন্দাবনে চলিয়া গেছেন।

গ্রামের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আমি কাশীতে গেলাম। কিন্তু পাপমনে কোথাও শান্তি পাইলাম না। ঠাকুরকে প্রতিদিন ডাকিয়া বলি, ঠাকুর, আমার স্বামী আমার ছেলেমেয়ে আমার কাছে যেমন সত্য ছিল তুমি আমার কাছে তেমনি সত্য হয়ে ওঠ!—কিন্তু কই তিনি ত আমার প্রার্থনা শুনিলেন না! আমার বুক যে জুড়োয় না, আমার সমস্ত শরীর মন যে কাঁদিতে থাকে! বাপ্‌রে বাপ! মানুষের প্রাণ কি কঠিন!

সেই আটবৎসর বয়সে শ্বশুর বাড়ি গিয়াছি তাহার পরে একদিনের জন্যও বাপের বাড়ি আসিতে পাই নাই। তোমার মায়ের বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কোনো ফল হয় নাই। তাহার পর বাবার চিঠিতে তোমাদের জন্মের সংবাদ পাইলাম, আমার বোনের মৃত্যুসংবাদও পাইয়াছি। মায়ের কোলছাড়া তোদের যে আমার কোলে টানিব ঈশ্বর এ পর্য্যন্ত এমন সুযোগ ঘটান নাই।

তীর্থে ঘুরিয়া যখন দেখিলাম মায়া এখনো মন ভরিয়া আছে, কোনো একটা বুকের জিনিষকে পাইবার জন্য বুকের তৃষ্ণা এখনো মরে নাই—তখন তোদের খোঁজ করিতে লাগিলাম। শুনিয়াছিলাম তোদের বাপ ধর্ম্ম ছাড়িয়া সমাজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তা কি করিব! তোদের মা যে আমার এক মায়ের পেটের বোন।

কাশীতে এক ভদ্রলোকের কাছে তোমাদের খোঁজ পাইয়া এখানে আসিয়াছি। পরেশ বাবু শুনিয়াছি ঠাকুর দেবতা মানেন না, কিন্তু ঠাকুর যে উঁহার প্রতি প্রসন্ন সে উঁহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। পূজা পাইলেই ঠাকুর ভোলেন না, সে আমি খুব জানি—পরেশ বাবু কেমন করিয়া তাঁহাকে বশ করিলেন সেই খবর আমি লইব। যাই হোক্ বাছা, একলা থাকিবার সময় এখনো আমার হয় নাই—সে আমি পারি না—ঠাকুর যেদিন দয়া করেন করিবেন, কিন্তু তোমাদের কোলের কাছে না রাখিয়া আমি বাঁচিব না।

৩৯

পরেশ বরদাসুন্দরীর অনুপস্থিতিকালে হরিমোহিনীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ছাতের উপরকার নিভৃত ঘরে তাঁহাকে স্থান দিয়া যাহাতে তাঁহার আচার রক্ষা করিয়া চলার কোনো বিঘ্ন না ঘটে তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বরদাসুন্দরী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ঘর কন্নার মধ্যে এই একটি অভাবনীয় প্রাদুর্ভাব দেখিয়া একেবারে হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। তিনি পরেশকে খুব তীব্র স্বরেই কহিলেন, এ আমি পারব না।

পরেশ কহিলেন, তুমি আমাদের সকলকেই সহ্য করতে পারচ আর ঐ একটি বিধবা অনাথাকে সইতে পারবে না?

বরদাসুন্দরী জানিতেন পরেশের কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্র নাই, সংসারে কিসে সুবিধা ঘটে বা অসুবিধা ঘটে সে সম্বন্ধে তিনি কোনো দিন বিবেচনা মাত্র করেন না; হঠাৎ এক একটা কাণ্ড করিয়া বসেন। তাহার পরে রাগই করো, বকো আর কাঁদো একেবারে পাষাণের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া থাকেন। এমন লোকের সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে বল!" "প্রয়োজন হইলে যাহার সঙ্গে ঝগড়া করাও অসম্ভব তাহার সঙ্গে ঘর করিতে কোন্ স্ত্রীলোকে পারে!

সুচরিতা মনোরমার প্রায় একবয়সী ছিল। হরিমোহিনীর মনে হইতে লাগিল সুচরিতাকে দেখিতেও যেন অনেকটা সেই মনোরমারই মত; আর স্বভাবটিও তাহার সঙ্গে মিলিয়াছে। তেমনি শান্ত অথচ তেমনি দৃঢ়। হঠাৎ পিছন হইতে তাহাকে দেখিয়া এক এক সময়ে হরিমোহিনীর বুকের ভিতরটা যেন চমকিয়া উঠে। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে তিনি একলা বসিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছেন এমন সময় সুচরিতা কাছে আসিলে চোখ বুজিয়া তাহাকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন আহা আমার মনে হচ্চে যেন আমি তাকেই বুকের মধ্যে পেয়েছি। সে যেতে চায়নি আমি তাকে জোর করে বিদায় করে দিয়েছি, জগৎ সংসারে কি কোনো দিন কোনো মতেই আমার সে শাস্তির অবসান হবে না! দণ্ড যা পাবার তা পেয়েছি—এবার সে এসেছে; এই যে ফিরে এসেছে; তেমনি হাসিমুখ করে ফিরে এসেছে; এই যে আমার মা, এই যে আমার মণি, আমার ধন! এই বলিয়া সুচরিতার সমস্ত মুখে হাত বুলাইয়া তাহার চুমো খাইয়া

চোখের জলে ভাসিতে থাকিতেন; সুচরিতারও দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িত। সে তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিত,—মাসি, আমিও ত মায়ের আদর বেশি দিন ভোগ করতে পারিনি; আজ আবার সেই হারানো মা ফিরে এসেচেন। কতদিন কত দুঃখের সময় যখন ঈশ্বরকে ডাক্‌বার শক্তি ছিল না, যখন মনের ভিতরটা শুকিয়ে গিয়েছিল, তখন আমার মাকে ডেকেছি। সেই মা আজ আমার ডাক শুনে এসেচেন।

হরিমোহিনী বলিতেন, অমন করে বলিস্‌নে, বলিস্‌নে। তোর কথা শুন্‌লে আমার এত আনন্দ হয় যে আমার ভয় করতে থাকে! হে ঠাকুর, দৃষ্টি দিয়ো না ঠাকুর। আর মায়া করব না মনে করি—মনটাকে পাষাণ করেই থাক্‌তে চাই কিন্তু পারি নে যে! আমি বড় দুর্ব্বল, আমাকে দয়া কর, আমাকে আর মেরো না! ওরে রাধারাণী, যা, যা, আমার কাছ থেকে ছেড়ে যা! আমাকে আর জড়াস্‌নেরে জড়াস্‌নে! ও আমার গোপীবল্লভ, আমার জীবননাথ, আমার গোপাল, আমার নীলমণি, আমাকে এ আবার কি বিপদে ফেল্‌চ!

সুচরিতা কহিত, আমাকে তুমি জোর করে বিদায় করতে পারবে না মাসি! আমি তোমাকে কখনো ছাড়ব না—আমি বরাবর তোমার এই কাছেই রইলুম! বলিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া শিশুর মত চুপ করিয়া থাকিত।

দুই দিনের মধ্যেই সুচরিতার সঙ্গে তাহার মাসির এমন একটা গভীর সম্বন্ধ বাধিয়া গেল যে ক্ষুদ্র কালের দ্বারা তাহার পরিমাপ হইতে পারে না।

বরদাসুন্দরী ইহাতেও বিরক্ত হইয়া গেলেন। মেয়েটার রকম দেখ! যেন আমরা কোনো দিন উহার কোনো আদর যত্ন করি নাই! বলি, এত দিন মাসি ছিলেন কোথায়! ছোটো বেলা হইতে আমরা যে এত করিয়া মানুষ করিলাম আর আজ মাসি বলিতেই একেবারে অজ্ঞান। আমি

কর্ত্তাকে বরাবর বলিয়া আসিয়াছি ঐ যে সুচরিতাকে তোমরা সবাই ভাল ভাল কর ও কেবল বাহিরে ভালমানুষী করে কিন্তু উহার মন পাবার জো নাই। আমরা এতদিন উহার যা করিয়াছি সব বৃথাই হইয়াছে।

পরেশ যে বরদাসুন্দরীর দরদ বুঝিবেন না তাহা তিনি জানিতেন। শুধু তাই নহে হরিমোহিনীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি যে পরেশের কাছে খাটো হইয়া যাইবেন ইহাতেও তাঁহার সন্দেহ ছিল না। সেই জন্যই তাঁর রাগ আরো বাড়িয়া উঠিল। পরেশ যাহাই বলুন কিন্তু অধিকাংশ বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গেই যে বরদাসুন্দরীর মত মেলে ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তিনি দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমাজের প্রধান অপ্রধান সকল লোকের কাছেই হরিমোহিনীর ব্যাপার লইয়া সমালোচনা জুড়িয়া দিলেন। হরিমোহিনীর হিঁদুয়ানি, তাঁহার ঠাকুর পূজা, বাড়িতে ছেলে মেয়ের কাছে তাঁহার কুদৃষ্টান্ত, ইহা লইয়া তাঁহার আক্ষেপ অভিযোগের অন্ত রহিল না।

শুধু লোকের কাছে অভিযোগ নহে, বরদাসুন্দরী সকল প্রকারে হরিমোহিনীর অসুবিধা ঘটাইতে লাগিলেন। হরিমোহিনীর রন্ধনাদির জল তুলিয়া দিবার জন্য যে একজন গোয়ালা বেহারা ছিল তাহাকে তিনি ঠিক সময় বুঝিয়া অন্য কাজে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। সে সম্বন্ধে কোনো কথা উঠিলে বলিতেন, কেন, রামদীন আছে ত? রামদীন জাতে দোসাদ; তিনি জানিতেন তাহার হাতের জল হরিমোহিনী ব্যবহার করিবেন না। সে কথা কেহ বলিলে বলিতেন—অত বামনাই করতে চান ত আমাদের ব্রাহ্ম বাড়িতে এলেন কেন? আমাদের এখানে ও সমস্ত জাতের বিচার করা চলবে না। আমি কোনো মতেই এতে প্রশ্রয় দেব না। এইরূপ উপলক্ষে তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে সামাজিক শৈথিল্য অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেছে; এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজ যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করিতে পারিতেছে না। তাঁহার

সাধ্যমত তিনি এরূপ শৈথিল্যে যোগ দিতে পারিবেন না। না কিছুতেই না। ইহাতে যদি কেহ তাঁহাকে ভুল বোঝে তবে সেও স্বীকার, যদি আত্মীয়েরাও বিরুদ্ধ হইয়া উঠে তবে সেও তিনি মাথা পাতিয়া লইবেন। পৃথিবীতে মহাপুরুষেরা যাঁহারা কোনো মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই যে নিন্দা ও বিরোধ সহ্য করিতে হইয়াছে সেই কথাই তিনি সকলকে স্মরণ করাইতে লাগিলেন।

কোনো অসুবিধায় হরিমোহিনীকে পরাস্ত করিতে পারিত না। তিনি কৃচ্ছ্র সাধনের চূড়ান্ত সীমায় উঠিবেন বলিয়াই যেন পণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরে যে অসহ্য দুঃখ পাইয়াছেন বাহিরেও যেন তাহার সহিত ছন্দরক্ষা করিবার জন্য কঠোর আচারের দ্বারা অহরহ কষ্ট সৃজন করিয়া চলিতেছিলেন। এইরূপে দুঃখকে নিজের ইচ্ছার দ্বারা বরণ করিয়া তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইয়া তাহাকে বশ করিবার এই সাধনা।

হরিমোহিনী যখন দেখিলেন জলের অসুবিধা হইতেছে তখন তিনি রন্ধন একেবারে ছাড়িয়াই দিলেন। তাঁহার ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া প্রসাদ স্বরূপে দুধ এবং ফল খাইয়া কাটাইতে লাগিলেন। সুচরিতা ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইল। মাসি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন—মা, এ আমার বড় ভাল হয়েছে। এই আমার প্রয়োজন ছিল। এতে আমার কোনো কষ্ট নেই, আমার আনন্দই হয়!

সুচরিতা কহিল, মাসি আমি যদি অন্য জাতের হাতে জল বা খাবার না খাই তাহলে তুমি আমাকে তোমার কাজ করতে দেবে?

হরিমোহিনী কহিল—কেন মা, তুমি যে ধর্ম্ম মান সেই মতেই তুমি চল—আমার জন্যে তোমাকে অন্য পথে যেতে হবে না। আমি তোমাকে কাছে পেয়েছি, বুকে রাখচি, প্রতিদিন দেখতে পাই এই আমার আনন্দ। পরেশ বাবু তোমার গুরু তোমার বাপের মত, তিনি তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েচেন তুমি সেই মেনে চল, তাতেই ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

হরিমোহিনী বরদাসুন্দরীর সমস্ত উপদ্রব এমন করিয়া সহিতে লাগিলেন যেন তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পরেশ বাবু যখন প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন কেমন আছেন, কোনো অসুবিধা হইতেছে না ত,—তিনি বলিতেন আমি খুব সুখে আছি।

কিন্তু বরদাসুন্দরীর সমস্ত অন্যায় সুচরিতাকে প্রতিমুহূর্ত্তে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। সে ত নালিশ করিবার মেয়ে নয়; বিশেষত পরেশ বাবুর কাছে বরদাসুন্দরীর ব্যবহারের কথা বলা তাহার দ্বারা কোনোমতেই ঘটিতে পারে না। সে নিঃশব্দে সমস্ত সহ্য করিতে লাগিল—এসম্বন্ধে কোনো প্রকার আক্ষেপ প্রকাশ করিতেও তাহার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইত।

ইহার ফল হইল এই যে, সুচরিতা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবেই তাহার মাসির কাছে আসিয়া পড়িল। মাসির বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও আহার পান সম্বন্ধে সে তাঁহারই সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিল। শেষকালে সুচরিতার কষ্ট হইতেছে দেখিয়া দায়ে পড়িয়া হরিমোহিনীকে পুনরায় রন্ধনাদিতে মন দিতে হইল। সুচরিতা কহিল,—মাসি, তুমি আমাকে যেমন করে থাকতে বল আমি তেমনি করেই থাকব, কিন্তু তোমার জল আমি নিজে তুলে দেব, সে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

হরিমোহিনী কহিলেন,—মা তুমি কিছু মনে কোরো না কিন্তু ঐ জলে যে আমার ঠাকুরের ভোগ হয়!

সুচরিতা কহিল—মাসি, তোমার ঠাকুরও কি জাত মানেন, তাঁকেও কি পাপ লাগে? তাঁরও কি সমাজ আছে না কি?

অবশেষে একদিন সুচরিতার নিষ্ঠার কাছে হরিমোহিনীকে হার মানিতে হইল। সুচরিতার সেবা তিনি সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিলেন। সতীশও দিদির অনুকরণে মাসির রান্না খাইব বলিয়া ধরিয়া পড়িল। এমন করিয়া এই তিনটিতে মিলিয়া পরেশ বাবুর ঘরের কোণে আর

একটি ছোট সংসার জমিয়া উঠিল। কেবল ললিতা এই দুটি সংসারের মাঝখানে সেতুস্বরূপ বিরাজ করিতে লাগিল। বরদাসুন্দরী তাঁহার আর কোনো মেয়েকে এদিকে ঘেঁসিতে দিতেন না—কিন্তু ললিতাকে নিষেধ করিয়া পারিয়া উঠিবার শক্তি তাঁহার ছিল না।

৪০

বরদাসুন্দরী তাঁহার ব্রাহ্মিকাবন্ধুদিগকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহাদের ছাতের উপরেই সভা হইত। হরিমোহিনী তাঁহার স্বাভাবিক গ্রাম্য সরলতার সহিত মেয়েদের আদর অভ্যর্থনা করিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু ইহারা যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে তাহা তাঁহার কাছে গোপন রহিল না। এমন কি, হিন্দুদের সামাজিক আচার ব্যবহার লইয়া তাঁহার সমক্ষেই বরদাসুন্দরী তীব্র সমালোচনা উত্থাপিত করিতেন এবং অনেক রমণী হরিমোহিনীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সেই সমালোচনায় যোগ দিতেন।

সুচরিতা তাহার মাসির কাছে থাকিয়া এই সমস্ত আক্রমণ নীরবে সহ্য করিত। কেবল, সেও যে তাহার মাসির দলে, ইহাই সে যেন গায়ে পড়িয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত। যেদিন আহারের আয়োজন থাকিত সেদিন সুচরিতাকে সকলে খাইতে ডাকিলে সে বলিত—না, আমি খাইনে!

সে কি! তুমি বুঝি আমাদের সঙ্গে বসে খাবে না!

না।

বরদাসুন্দরী বলিতেন, আজকাল সুচরিতা যে মস্ত হিঁদু হয়ে উঠেচেন তা বুঝি জান না। উনি যে আমাদের ছোঁয়া খান না!

সুচরিতাও হিঁদু হয়ে উঠ্‌লো! কালে কালে কতই যে দেখতে হবে তাই ভাবি।

হরিমোহিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিতেন, রাধারাণী মা, যাও মা। তুমি খেতে যাও মা!

দলের লোকের কাছে যে সুচরিতা তাঁহার জন্য এমন করিয়া খোঁটা খাইতেছে ইহা তাঁহার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুচরিতা অটল হইয়া থাকিত। একদিন কোনো ব্রাহ্মমেয়ে কৌতূহলবশত হরিমোহিনীর ঘরের মধ্যে জুতা লইয়া প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সুচরিতা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ও ঘরে যেয়ো না।

কেন?

ওঘরে ওঁর ঠাকুর আছে।

ঠাকুর আছে! তুমি বুঝি রোজ ঠাকুর পূজো কর।

হরিমোহিনী বলিলেন—হাঁ; মা, পূজো করি বই কি!

ঠাকুরকে তোমার ভক্তি হয়?

পোড়া কপাল আমার! ভক্তি আর কই হল? ভক্তি হলে ত বেঁচেই যেতুম!

সেদিন ললিতা উপস্থিত ছিল। সে মুখ লাল করিয়া প্রশ্নকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাঁর উপাসনা কর তাঁকে ভক্তি কর?

বাঃ ভক্তি করিনে ত কি।

ললিতা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, ভক্তি ত করই না, আর, ভক্তি যে কর না, সেটা তোমার জানাও নেই।

সুচরিতা যাহাতে আচার ব্যবহারে তাহার দল হইতে পৃথক্ না হয় সেজন্য হরিমোহিনী অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ইতিপূর্ব্বে হারান বাবুতে বরদাসুন্দরীতে ভিতরে ভিতরে একটা বিরোধের ভাবই ছিল। বর্ত্তমান ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে খুব মিল হইল। বরদাসুন্দরী কহিলেন, যিনি যাই বলুন না কেন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে

বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য যদি কাহারো দৃষ্টি থাকে ত সে পানুবাবুর। হারান বাবুও, ব্রাহ্মপরিবারকে সর্ব্বপ্রকারে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার প্রতি বরদাসুন্দরীর একান্ত বেদনাপূর্ণ সচেতনতাকে ব্রাহ্মগৃহিণী মাত্রেরই পক্ষে একটি সুদৃষ্টান্ত বলিয়া সকলের কাছে প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই প্রশংসার মধ্যে পরেশ বাবুর প্রতি বিশেষ একটু খোঁচা ছিল।

হারান বাবু একদিন পরেশ বাবুর সম্মুখেই সুচরিতাকে কহিলেন, শুনলুম না কি আজকাল তুমি ঠাকুরের প্রসাদ খেতে আরম্ভ করেচ?

সুচরিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল কিন্তু যেন সে কথাটা শুনিতেই পাইল না এমনিভাবে টেবিলের উপরকার দোয়াতদানিতে কলমগুলা গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। পরেশ বাবু একবার করুণনেত্রে সুচরিতার মুখের দিকে চাহিয়া হারান বাবুকে কহিলেন, পানুবাবু, আমরা যা কিছু খাই সবই ত ঠাকুরের প্রসাদ।

হারান বাবু কহিলেন, কিন্তু সুচরিতা যে আমাদের ঠাকুরকে পরিত্যাগ করবার উদ্যোগ করচেন।

পরেশ বাবু কহিলেন, তাও যদি সম্ভব হয় তবে তা নিয়ে উৎপাত করলে কি তার কোনো প্রতিকার হবে?

হারান বাবু কহিলেন, স্রোতে যে লোক ভেসে যাচ্চে তাকে কি ডাঙায় তোলবার চেষ্টাও করতে হবে না?

পরেশবাবু কহিলেন—সকলে মিলে তার মাথার উপর ঢেলা ছুঁড়ে মারাকেই ডাঙায় তোলবার চেষ্টা বলা যায় না। পানুবাবু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি এতটুকু বেলা থেকেই সুচরিতাকে দেখে আসচি। ও যদি জলেই পড়ত তাহলে আমি আপনাদের সকলের আগেই জানতে পারতুম এবং আমি উদাসীন থাকতুম না।

হারান বাবু কহিলেন—সুচরিতা ত এখানেই রয়েচেন আপনি ওঁকেই

জিজ্ঞাসা করুন না। শুনতে পাই উনি সকলের ছোঁয়া খান না। সে কথা কি মিথ্যা?

সুচরিতা দোয়াতদানের প্রতি অনাবশ্যক মনোযোগ দূর করিয়া কহিল, বাবা জানেন আমি সকলের ছোঁয়া খাইনে। উনি যদি আমার এই আচরণ সহ্য করে থাকেন তাহলেই হল। আপনাদের যদি ভাল না লাগে আপনারা যত খুসি আমার নিন্দা করুন কিন্তু বাবাকে বিরক্ত করচেন কেন? উনি আপনাদের কত ক্ষমা করে চলেন তা আপনারা জানেন? একি তারই প্রতিফল?

হারান বাবু আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—সুচরিতাও আজকাল কথা কহিতে শিখিয়াছে!

পরেশ বাবু শান্তিপ্রিয় লোক; তিনি নিজের বা পরের সম্বন্ধে অধিক আলোচনা ভাল বাসেন না। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে তিনি কোনো কাজে কোনো প্রধান পদ গ্রহণ করেন নাই; নিজেকে কাহারো লক্ষ্যগোচর না করিয়া নিভৃতে জীবন যাপন করিয়াছেন। হারান বাবু পরেশের এই ভাবকেই উৎসাহহীনতা ও ঔদাসীন্য বলিয়া গণ্য করিতেন, এমন কি, পরেশ বাবুকে তিনি ইহা লইয়া ভর্ৎসনাও করিয়াছেন। ইহার উত্তরে পরেশবাবু বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর, সচল এবং অচল এই দুই শ্রেণীর পদার্থই সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি নিতান্তই অচল। আমার মত লোকের দ্বারা যে কাজ পাওয়া সম্ভব ঈশ্বর তাহা আদায় করিয়া লইবেন। যাহা সম্ভব নহে তাহার জন্য চঞ্চল হইয়া কোনো লাভ নাই। আমার বয়স যথেষ্ট হইয়াছে; আমার কি শক্তি আছে আর কি নাই তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এখন আমাকে ঠেলাঠেলি করিয়া কোনো ফল পাওয়া যাইবে না।

হারান বাবুর ধারণা ছিল তিনি অসাড় হৃদয়েও উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারেন; জড়চিত্তকে কর্ত্তব্যের পথে ঠেলিয়া দেওয়া এবং স্খলিতজীবনকে অনুতাপে বিগলিত করা তাঁর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা;

তাঁহার অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং একাগ্র শুভ ইচ্ছাকে কেহই অধিকদিন প্রতিরোধ করিতে পারে না এইরূপ তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার সমাজের লোকের ব্যক্তিগত চরিত্রে যে সকল ভাল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তিনি নিজেকেই কোনো না কোনো প্রকারে তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছেন। তাঁহার অলক্ষ্য প্রভাবও যে ভিতরে ভিতরে কাজ করে ইহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত সুচরিতাকে যখনি তাঁহার সম্মুখে কেহ বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছে তিনি এমনভাব ধারণ করিয়াছেন যেন সে প্রশংসা সম্পূর্ণই তাঁহার। তিনি উপদেশ, দৃষ্টান্ত এবং স্বন্দ তেজের দ্বারা সুচরিতার চরিত্রকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন যে এই সুচরিতার জীবনের দ্বারাই লোকসমাজে তাঁহার আশ্চর্য্য প্রভাব প্রমাণিত হইবে এইরূপ তাঁহার আশা ছিল।

সেই সুচরিতার শোচনীয় পতনে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহার গর্ব্ব কিছুমাত্র হ্রাস হইল না, তিনি সমস্ত দোষ চাপাইলেন পরেশ বাবুর স্কন্ধে। পরেশ বাবুকে লোকে বরাবর প্রশংসা করিয়া আসিয়াছে কিন্তু হারান বাবু কখনো তাহাতে যোগ দেন নাই; ইহাতেও তাঁহার কতদূর প্রাজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এইবার সকলে বুঝিতে পারিবে এইরূপ তিনি আশা করিতেছেন।

হারান বাবুর মত লোক আর সকলি সহ্য করিতে পারেন কিন্তু যাহাদিগকে বিশেষরূপে হিতপথে চালাইতে চেষ্টা করেন তাহারা যদি নিজের বুদ্ধি অনুসারে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে তবে সে অপরাধ তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। সহজে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য; যতই দেখেন তাঁহার উপদেশে ফল হইতেছে না ততই তাঁহার জেদ বাড়িয়া যাইতে থাকে; তিনি ফিরিয়া ফিরিয়া বারম্বার আক্রমণ করিতে থাকেন। কল যেমন দম না ফুরাইলে থামিতে পারে না তিনিও তেমনি কোনোমতেই নিজেকে সম্বরণ করিতে

পারেন না; বিমুখ কর্ণের কাছে এক কথা সহস্রবার আবৃত্তি করিয়াও হার মানিতে চাহেন না।

ইহাতে সুচরিতা বড় কষ্ট পাইতে লাগিল,—নিজের জন্য নহে, পরেশ বাবুর জন্য। পরেশ বাবু যে ব্রাহ্মসমাজের সকলের সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছেন এই অশান্তি নিবারণ করা যাইবে কি উপায়ে? অপর পক্ষে সুচরিতার মাসিও প্রতিদিন বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, তিনি একান্ত নম্র হইয়া নিজেকে যতই আড়ালে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন ততই এই পরিবারের পক্ষে উপদ্রব স্বরূপ হইয়া উঠিতেছেন। এজন্য তাহার মাসির অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ সুচরিতাকে প্রত্যহ দগ্ধ করিতে লাগিল। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধারের যে পথ কোথায় তাহা সুচরিতা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না।

এদিকে সুচরিতার শীঘ্র বিবাহ দিয়া ফেলিবার জন্য বরদাসুন্দরী পরেশ বাবুকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন সুচরিতার দায়িত্ব আর আমাদের বহন করা চলে না, সে এখন নিজের মতে চল্‌তে আরম্ভ করেচে। তার বিবাহের যদি দেরি থাকে তাহা হলে মেয়েদের নিয়ে আমি অন্য কোথাও যাব—সুচরিতার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত মেয়েদের পক্ষে বড় অনিষ্টের কারণ হচ্চে। দেখো এর জন্য পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবেই। ললিতা আগেত এরকম ছিল না; এখন ও যে আপন ইচ্ছামত যা খুসি একটা কাণ্ড করে বসে কাকেও মানে না তার মূলে কে? সেদিন যে ব্যাপারটা বাধিয়ে বসল, যার জন্য আমি লজ্জায় মরে যাচ্চি; তুমি কি মনে কর তার মধ্যে সুচরিতার কোনো হাত ছিল না? তুমি নিজের মেয়েদের চেয়ে সুচরিতাকে বরাবর বেশি ভালবাস তাতে আমি কোনোদিন কোনো কথা বলিনি কিন্তু আর চলে না সে আমি স্পষ্টই বলে রাখচি।

সুচরিতার জন্য নহে কিন্তু পারিবারিক অশান্তির জন্য পরেশ বাবু

চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বরদাসুন্দরী যে উপলক্ষটি পাইয়া বসিয়াছেন ইহা লইয়া তিনি যে হুলস্থূল কাণ্ড বাধাইয়া বসিবেন এবং যতই দেখিবেন আন্দোলনে কোন ফল হইতেছে না ততই দুর্ব্বার হইয়া উঠিতে থাকিবেন ইহাতে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না। যদি সুচরিতার বিবাহ সত্বর সম্ভবপর হয় তবে বর্ত্তমান অবস্থায় সুচরিতার পক্ষেও তাহা শান্তিজনক হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বরদাসুন্দরীকে বলিলেন, পানুবাবু যদি সুচরিতাকে সম্মত করতে পারেন তাহলে আমি বিবাহ সম্বন্ধে কোনো আপত্তি করব না।

বরদাসুন্দরী কহিলেন—আবার কতবার করে সম্মত করতে হবে? তুমি ত অবাক্ করলে! এত সাধাসাধিই বা কেন? পানুবাবুর মত পাত্র উনি পাবেন কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করি। তুমি রাগ কর আর যাই কর সত্যি কথা বলতে কি, সুচরিতা পানুবাবুর যোগ্য মেয়ে নয়!

পরেশ বাবু কহিলেন, পানুবাবুর প্রতি সুচরিতার মনের ভাব যে কি তা আমি স্পষ্ট করে বুঝতে পারিনি। অতএব তারা নিজেদের মধ্যে যতক্ষণ কথাটা পরিষ্কার করে না নেবে ততক্ষণ আমি এবিষয়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারব না।

বরদাসুন্দরী কহিলেন, বুঝতে পারনি! এতদিন পরে স্বীকার করলে! ঐ মেয়েটিকে বোঝা বড় সহজ নয়! ও বাইরে এক রকম ভিতরে এক রকম।

বরদাসুন্দরী হারান বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সেদিন কাগজে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দুর্গতির আলোচনা ছিল। তাহার মধ্যে পরেশ বাবুর পরিবারের প্রতি এমন ভাবে লক্ষ্য করা ছিল যে, কোনো নাম না থাকা সত্ত্বেও আক্রমণের বিষয় যে কে তাহা সকলের কাছেই বেশ স্পষ্ট হইয়াছিল; এবং লেখক যে কে তাহাও লেখার ভঙ্গীতে অনুমান করা কঠিন হয় নাই। কাগজখানায় কোনোমতে চোখ বুলাইয়াই

সুচরিতা তাহা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতেছিল। ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কাগজের অংশগুলিকে যেন পরমাণুতে পরিণত করিবার জন্য তাহার রোখ চড়িয়া যাইতেছিল।

এমন সময় হারান বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া সুচরিতার পাশে একটা চৌকি টানিয়া বসিলেন! সুচরিতা একবার মুখ তুলিয়াও চাহিল না, সে যেমন কাগজ ছিঁড়িতেছিল তেমনি ছিঁড়িতেই লাগিল।

হারান বাবু কহিলেন, সুচরিতা, আজ একটা গুরুতর কথা আছে। আমার কথায় একটু মন দিতে হবে।

সুচরিতা কাগজ ছিঁড়িতেই লাগিল। নখে ছেঁড়া যখন অসম্ভব হইল তখন থলে হইতে কাঁচি বাহির করিয়া কাঁচিটা দিয়া কাটিতে লাগিল। ঠিক এই মুহূর্ত্তে ললিতা ঘরে প্রবেশ করিল।

হারান বাবু কহিলেন, ললিতা, সুচরিতার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

ললিতা ঘর হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সুচরিতা তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। ললিতা কহিল, তোমার সঙ্গে পানুবাবুর যে কথা আছে! সুচরিতা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া ললিতার আঁচল চাপিয়াই রহিল—তখন ললিতা সুচরিতার আসনের এক পাশে বসিয়া পড়িল।

হারান বাবু কোনো বাধাতেই দমিবার পাত্র নহেন। তিনি আর ভূমিকামাত্র না করিয়া একেবারে কথাটা পাড়িয়া বসিলেন। কহিলেন, আমাদের বিবাহে আর বিলম্ব হওয়া আমি উচিত মনে করিনে। পরেশ বাবুকে জানিয়েছিলাম; তিনি বল্লেন, তোমার সম্মতি পেলেই আর কোনো বাধা থাক্‌বে না। আমি স্থির করেছি, আগামী রবিবারের পরের রবিবারেই—

সুচরিতা কথা শেষ করিতে না দিয়াই কহিল, না।

সুচরিতার মুখে এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট এবং উদ্ধত "না" শুনিয়া হারান বাবু থমকিয়া গেলেন। সুচরিতাকে তিনি অত্যন্ত বাধ্য বলিয়া জানিতেন। সে যে একমাত্র "না" বাণের দ্বারা তাঁহার প্রস্তাবটিকে এক মুহূর্ত্তে অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিবে ইহা তিনি মনেও করেন নাই। তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন—না! না মানে কি? তুমি আরো দেরি করতে চাও?

সুচরিতা আবার কহিল, না।

হারান বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, তবে?

সুচরিতা মাথা নত করিয়া কহিল, বিবাহে আমার মত নেই।

হারান বাবু হতবুদ্ধির ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মত নেই তার মানে?

ললিতা ঠোকর দিয়া কহিল, পানুবাবু, আপনি আজ বাংলা ভাষা ভুলে গেলেন না কি?

হারান বাবু কঠোর দৃষ্টির দ্বারা ললিতাকে আঘাত করিয়া কহিলেন, বরঞ্চ মাতৃভাষা ভুলে গেছি একথা স্বীকার করা সহজ কিন্তু যে মানুষের কথায় বরাবর শ্রদ্ধা করে এসেছি তাকে ভুল বুঝেছি একথা স্বীকার করা সহজ নয়।

ললিতা কহিল, মানুষকে বুঝতে সময় লাগে, আপনার সম্বন্ধেও হয় ত সেকথা খাটে।

হারান বাবু কহিলেন, প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার কথার বা মতের বা ব্যবহারের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি—আমি আমাকে ভুল বোঝাবার কোনো উপলক্ষ কাউকে দিইনি একথা আমি জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি—সুচরিতাই বলুন আমি ঠিক বলচি কি না!

ললিতা আবার কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল—সুচরিতা তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল—আপনি ঠিক বলচেন! আপনাকে আমি কোনো দোষ দিতে চাইনে!

হারান বাবু কহিলেন, দোষ যদি না দেবে তবে আমার প্রতি অন্যায়ই বা করবে কেন?

সুচরিতা দৃঢ়স্বরে কহিল, যদি একে অন্যায় বলেন তবে আমি অন্যায়ই করব—কিন্তু—

বাহির হইতে ডাক আসিল, দিদি, ঘরে আছেন।

সুচরিতা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—আসুন, বিনয় বাবু আসুন।

ভুল করেচেন দিদি, বিনয় বাবু আসেননি, আমি বিনয় মাত্র, আমাকে সমাদর করে লজ্জা দেবেন না—বলিয়া বিনয় ঘরে প্রবেশ করিয়াই হারান বাবুকে দেখিতে পাইল। হারান বাবুর মুখের অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া কহিল—অনেক দিন আসিনি বলে রাগ করেচেন বুঝি!

হারান বাবু পরিহাসে যোগ দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, রাগ করবারই কথা বটে! কিন্তু আজ আপনি একটু অসময়ে এসেচেন—সুচরিতার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা হচ্ছিল!

বিনয় শশব্যস্ত হইয়া উঠিল কহিল—ঐ দেখুন, আমি কখন্ এলে যে অসময়ে আসা হয় না তা আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝতেই পারলুম না! এই জন্যই আস্‌তে সাহসই হয় না! বলিয়া বিনয় বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

সুচরিতা কহিল, বিনয় বাবু, যাবেন না। আমাদের যা কথা ছিল শেষ হয়ে গেছে। আপনি বসুন।

বিনয় বুঝিতে পারিল সে আসাতে সুচরিতা একটা বিশেষ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। খুসি হইয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িল এবং কহিল আমাকে প্রশ্রয় দিলে আমি কিছুতেই সাম্‌লাতে পারিনে। আমাকে বস্‌তে বল্‌লে আমি বস্‌বই এই রকম আমার স্বভাব। অতএব, দিদির প্রতি নিবেদন এই যে, এসব কথা যেন বুঝে সুঝে বলেন, নইলে বিপদে পড়বেন।

হারান বাবু কোনো কথা না বলিয়া আসন্ন ঝড়ের মত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি নীরবে প্রকাশ করিলেন, আচ্ছা বেশ, আমি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম—আমার যা কথা আছে তাহা শেষ পর্য্যন্ত বলিয়া তবে আমি উঠিব।

দ্বারের বাহির হইতে বিনয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই ললিতার বুকের ভিতরকার সমস্ত রক্ত যেন চমক খাইয়া উঠিয়াছিল। সে বহুকষ্টে আপনার স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই পারিল না। বিনয় যখন ঘরে প্রবেশ করিল ললিতা বেশ সহজে তাহাদের পরিচিত বন্ধুর মত তাহাকে কোনো কথা বলিতে পারিল না। কোন্ দিকে চাহিবে, নিজের হাতখানা লইয়া কি করিবে সে যেন একটা ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িল। একবার উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সুচরিতা কোনমতেই তাহার কাপড় ছাড়িল না।

বিনয়ও যাহা কিছু কথাবার্ত্তা সমস্ত সুচরিতার সঙ্গেই চালাইল—ললিতার নিকট কোনো কথা ফাঁদা তাহার মত বাক্পটু লোকের কাছেও আজ শক্ত হইয়া উঠিল। এই জন্যই সে যেন ডবল্ জোরে সুচরিতার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল—কোথাও কোনো ফাঁক পড়িতে দিল না।

কিন্তু হারান বাবুর কাছে ললিতা ও বিনয়ের এই নূতন সঙ্কোচ অগোচর রহিল না। যে ললিতা তাঁহার সম্বন্ধে আজকাল এমন প্রখর ভাবে প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিয়াছে সে আজ বিনয়ের কাছে এমন সঙ্কুচিত ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন্ এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোকের সহিত কন্যাদের অবাধ পরিচয়ের অবকাশ দিয়া পরেশ বাবু যে নিজের পরিবারকে কিরূপ কদাচারের মধ্যে লইয়া যাইতেছেন তাহা মনে করিয়া পরেশ বাবুর প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরো বাড়িয়া উঠিল এবং পরেশ বাবুকে যেন একদিন এজন্য বিশেষ অনুতাপ করিতে হয় এই কামনা তাঁহার মনের মধ্যে অভিশাপের মত জাগিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ এইভাবে চলিলে পর স্পষ্টই বুঝা গেল হারান বাবু উঠিবেন না। তখন সুচরিতা বিনয়কে কহিল, মাসির সঙ্গে অনেক দিন আপনার দেখা হয়নি। তিনি আপনার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না?

বিনয় চৌকি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—মাসির কথা আমার মনে ছিল না এমন অপবাদ আমাকে দেবেন না।

সুচরিতা যখন বিনয়কে তাহার মাসির কাছে লইয়া গেল তখন ললিতা উঠিয়া কহিল, পানুবাবু, আমার সঙ্গে আপনার বোধ হয় বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই।

হারান বাবু কহিলেন—না। তোমার বোধ হয় অন্যত্র বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি যেতে পার!

ললিতা কথাটার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল। সে তৎক্ষণাৎ উদ্ধত ভাবে মাথা তুলিয়া ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করিয়া দিয়া কহিল—বিনয় বাবু আজ অনেক দিন পরে এসেচেন, তাঁর সঙ্গে গল্প করতে যাচ্চি। ততক্ষণ আপনি নিজের লেখা যদি পড়তে চান তাহলে—না, ঐ যা, সে কাগজখানা দিদি দেখ্‌চি কুটি কুটি করে ফেলেচেন। পরের লেখা যদি সহ্য করতে পারেন তাহলে এইগুলি দেখ্‌তে পারেন।

বলিয়া কোণের টেবিল হইতে সযত্নরক্ষিত গোরার রচনাগুলি আনিয়া হারান বাবুর সম্মুখে রাখিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হরিমোহিনী বিনয়কে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন। কেবল যে এই প্রিয়দর্শন যুবকের প্রতি স্নেহবশত তাহা নহে। এবাড়িতে বাহিরের লোক যে কেহ হরিমোহিনীর কাছে আসিয়াছে সকলেই তাঁহাকে যেন কোন্ এক ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মত দেখিয়াছে। তাহারা কলিকাতার লোক, প্রায় সকলেই ইংরেজি ও বাংলা লেখাপড়ায় তাঁহার

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তাহাদের দূরত্ব ও অবজ্ঞার আঘাতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলেন। বিনয়কে তিনি আশ্রয়ের মত অনুভব করিলেন। বিনয়ও কলিকাতার লোক, হরিমোহিনী শুনিয়াছেন লেখাপড়াতেও সে বড় কম নয়, অথচ এই বিনয় তাঁহাকে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা করে না; তাঁহাকে আপন লোকের মত দেখে ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মান একটা নির্ভর পাইল। বিশেষ করিয়া এই জন্যই অল্প পরিচয়েই বিনয় তাঁহার নিকট আত্মীয়ের স্থান লাভ করিল।

হরিমোহিনীর কাছে বিনয় যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই ললিতা সেখানে কখনই সহজে যাইত না—কিন্তু আজ হারান বাবুর গুপ্ত বিদ্রূপের আঘাতে সে সমস্ত সঙ্কোচ ছিন্ন করিয়া যেন জোর করিয়া উপরের ঘরে গেল। সুধু গেল তাহা নহে, গিয়াই বিনয়ের সঙ্গে অজস্র কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের সভা খুব জমিয়া উঠিল; এমন কি, মাঝে মাঝে তাহাদের হাসির শব্দ নীচের ঘরে একাকী আসীন হারান বাবুর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বেশিক্ষণ একলা থাকিতে পারিলেন না, বরদাসুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করিয়া মনের আক্ষেপ নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বরদাসুন্দরী শুনিলেন যে সুচরিতা হারান বাবুর সঙ্গে বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। শুনিয়া তাঁহার পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইল। তিনি কহিলেন, পানু বাবু, আপনি ভালমানুষি করলে চলবে না! ও যখন বারবার সম্মতি প্রকাশ করেচে এবং ব্রাহ্মসমাজসুদ্ধ সকলেই যখন এই বিষয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছে তখন ও আজ মাথা নাড়ল বলেই যে সমস্ত উল্টে যাবে এ কখনই হতে দেওয়া চলবে না। আপনার দাবি আপনি কিছুতেই ছাড়বেন না বলে রাখ্‌চি, দেখি ও কি করতে পারে!

এ সম্বন্ধে হারান বাবুকে উৎসাহ দেওয়া বাহুল্য—তিনি তখন কাঠের মতন শক্ত হইয়া বসিয়া মাথা তুলিয়া মনে মনে বলিতেছিলেন, অন্ প্রিন্সিপ্‌ল্

এ দাবি ছাড়া চলিবে না—আমার পক্ষে সুচরিতাকে ত্যাগ করা বেশি কথা নয় কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মাথা হেঁট করিয়া দিতে পারিব না।

বিনয় হরিমোহিনীর সহিত আত্মীয়তাকে পাকা করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে আহারের আবদার করিয়া বসিয়াছিল। হরিমোহিনী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া একটি ছোট থালায় কিছু ভিজানো ছোলা, ছানা, মাখন, একটু চিনি, একটি কলা, এবং কাঁসার বাটিতে কিছু দুধ আনিয়া সযত্নে বিনয়ের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। বিনয় হাসিয়া কহিল, অসময়ে ক্ষুধা জানাইয়া মাসিকে বিপদে ফেলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমিই ঠকিলাম—এই বলিয়া খুব আড়ম্বর করিয়া বিনয় আহারে বসিয়াছে এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনয় তাহার থালার উপরে যথাসম্ভব নত হইয়া নমস্কারের চেষ্টা করিয়া কহিল—অনেকক্ষণ নীচে ছিলুম; আপনার সঙ্গে দেখা হল না। বরদাসুন্দরী তাহার কোনো উত্তর না করিয়া সুচরিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এই যে ইনি এখানে! আমি যা ঠাউরেছিলুম তাই! সভা বসেচে! আমোদ করচেন! এদিকে বেচারা হারানবাবু সকাল থেকে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করে বসে রয়েচেন, যেন তিনি ওঁর বাগানের মালী! ছেলেবেলা থেকে ওদের মানুষ করলুম—কই বাপু, এতদিন ত ওদের এরকম ব্যবহার কখনো দেখিনি। কে জানে আজকাল এসব শিক্ষা কোথা থেকে পাচ্চে। আমাদের পরিবারে যা কখনো ঘটতে পারত না আজকাল তাই আরম্ভ হয়েছে—সমাজের লোকের কাছে যে আমাদের মুখ দেখাবার জো রইল না! এতদিন ধরে এত করে যা শেখানো গেল সে সমস্তই দুদিনে বিসর্জ্জন দিলে! এ কি সব কাণ্ড!

হরিমোহিনী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুচরিতাকে কহিলেন, নীচে কেউ বসে আছেন আমি ত জানতেম না! বড় অন্যায় হয়ে গেছে ত! মা, যাও তুমি শীঘ্র যাও! আমি অপরাধ করে ফেলেচি!

অপরাধ যে হরিমোহিনীর লেশমাত্র নহে ইহাই বলিবার জন্ত ললিতা মুহূর্ত্তের মধ্যে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। সুচরিতা গোপনে সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল এবং কোনো প্রতিবাদমাত্র না করিয়া নীচে চলিয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিনয় বরদাসুন্দরীর স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। বিনয় যে তাঁহাদের পরিবারের প্রভাবে পড়িয়া ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবে এ সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। বিনয়কে তিনি যেন নিজের হাতে গড়িয়া তুলিতেছেন বলিয়া একটা বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতে-ছিলেন; সে গর্ব্ব তিনি তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে কারো কারো কাছে প্রকাশও করিয়াছিলেন। সেই বিনয়কে আজ শত্রুপক্ষের শিবিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার মনের মধ্যে যেন একটা দাহ উপস্থিত হইল এবং নিজের কন্যা ললিতাকে বিনয়ের পুনঃপতনের সহায়কারী দেখিয়া তাঁহার চিত্তজ্বালা যে আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল সে কথা বলা বাহুল্য। তিনি রুক্ষস্বরে কহিলেন, ললিতা, এখানে কি তোমার কোনো কাজ আছে?

ললিতা কহিল—হাঁ, বিনয়বাবু এসেচেন তাই—

বরদাসুন্দরী কহিলেন, বিনয়বাবু যাঁর কাছে এসেচেন তিনি ওঁর আতিথ্য করবেন, তুমি এখন নীচে এস, কাজ আছে!

ললিতা স্থির করিল, হারানবাবু নিশ্চয়ই বিনয় ও তাহার দুইজনের নাম লইয়া মাকে এমন কিছু বলিয়াছেন যাহা বলিবার অধিকার তাঁহার নাই। এই অনুমান করিয়া তাহার মন অত্যন্ত শক্ত হইয়া উঠিল। সে অনাবশ্যক প্রগল্ভতার সহিত কহিল, বিনয়বাবু অনেক দিন পরে এসেচেন ওঁর সঙ্গে একটু গল্প করে নিয়ে তার পরে আমি যাচ্চি।

বরদাসুন্দরী ললিতার কথার স্বরে বুঝিলেন জোর খাটিবে না। হরিমোহিনীর সম্মুখেই পাছে তাঁহার পরাভব প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে

তিনি আর কিছু না বলিয়া এবং বিনয়কে কোনো প্রকার সম্ভাষণ না করিয়া চলিয়া গেলেন।

ললিতা বিনয়ের সঙ্গে গল্প করিবার উৎসাহ তাহার মার কাছে প্রকাশ করিল বটে কিন্তু বরদাসুন্দরী চলিয়া গেলে সে উৎসাহের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিনজনেই কেমন একপ্রকার কুণ্ঠিত হইয়া রহিল এবং অল্পক্ষণপরেই ললিতা উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

এ বাড়িতে হরিমোহিনীর যে কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা বিনয় স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। কথা পাড়িয়া ক্রমশ হরিমোহিনীর পূর্ব্ব ইতিহাস সমস্তই সে শুনিয়া লইল। সকল কথার শেষে হরিমোহিনী কহিলেন, বাবা, আমার মত অনাথার পক্ষে সংসার ঠিক স্থান নয়। কোনো তীর্থে গিয়ে দেবসেবায় মন দিতে পারলেই আমার পক্ষে ভাল হত। আমার অল্প যে কটি টাকা বাকি রয়েছে—তাতে আমার কিছুদিন চলে যেত, তার পরেও যদি বেঁচে থাকতুম ত পরের বাড়িতে রেঁধে খেয়েও আমার কোনোমতে দিন কেটে যেত। কাশীতে দেখে এলুম, এমন ত কত লোকের বেশ চলে যাচ্চে! কিন্তু আমি পাপিষ্ঠা বলে সে কোনোমতেই পেরে উঠ্‌লুম না। একলা থাক্‌লেই আমার সমস্ত দুঃখের কথা আমাকে যেন ঘিরে বসে, ঠাকুর দেবতা কাউকে আমার কাছে আস্‌তে দেয় না। ভয় হয় পাছে পাগল হয়ে যাই। যে মানুষ ডুবে মরচে তার পক্ষে ভেলা যেমন, রাধারাণী আর সতীশ আমার পক্ষে তেমনি হয়ে উঠেছে,—ওদের ছাড়বার কথা মনে করতে গেলেই দেখি আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। তাই আমার দিন রাত্রি ভয় হয় ওদের ছাড়তেই হবে—নইলে সব খুইয়ে আবার এই ক'দিনের মধ্যেই ওদের এত ভাল বাস্‌তে গেলুম কি জন্যে? বাবা, তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই, এদের দুটিকে পাওয়ার পর থেকে ঠাকুরের পূজো আমি মনের সঙ্গে

করতে পেরেছি—এরা যদি যায় তবে আমার ঠাকুর তখনি কঠিন পাথর হয়ে যাবে।

এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে হরিমোহিনী দুই চক্ষু মুছিলেন।

৪১

সুচরিতা নীচের ঘরে আসিয়া হারান বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল—কহিল আপনার কি কথা আছে বলুন!

হারান বাবু কহিলেন—বোস।

সুচরিতা বসিল না, স্থির দাঁড়াইয়া রহিল।

হারান বাবু কহিলেন, সুচরিতা, তুমি আমার প্রতি অন্যায় করচ।

সুচরিতা কহিল, আপনিও আমার প্রতি অন্যায় করচেন!

হারান বাবু কহিলেন, কেন, আমি তোমাকে যা কথা দিয়েছি এখনো তা—

সুচরিতা মাঝখানে বাধা দিয়া কহিল—ন্যায় অন্যায় কি শুধু কেবল কথায়? সেই কথার উপর জোর দিয়ে আপনি কাজে আমার প্রতি অত্যাচার করতে চান? একটা সত্য কি সহস্র মিথ্যার চেয়ে বড় নয়? আমি যদি একশো বার ভুল করে থাকি তবে কি আপনি জোর করে আমার সেই ভুলকেই অগ্রগণ্য করবেন? আজ আমার যখন সেই ভুল ভেঙেছে তখন আমি আমার আগেকার কোনো কথাকে স্বীকার করব না—করলে আমার অন্যায় হবে!

সুচরিতার যে এমন পরিবর্ত্তন কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে তাহা হারান বাবু কোনো মতেই বুঝিতে পারিলেন না। তাহার স্বাভাবিক স্তব্ধতা ও নম্রতা আজ এমন করিয়া ভাঙিয়া গেছে ইহা যে তাঁহারই দ্বারা ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করিবার শক্তি ও বিনয় তাঁহার ছিল

না। সুচরিতার নূতন সঙ্গীগুলির প্রতি মনে মনে দোষারোপ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি ভুল করেছিলে?

সুচরিতা কহিল—সে কথা কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করচেন? পূর্ব্বে মত ছিল এখন আমার মত নেই এই কি যথেষ্ট নয়?

হারান বাবু কহিলেন—ব্রাহ্মসমাজের কাছে যে আমাদের জবাবদিহি আছে! সমাজের লোকের কাছে তুমিই বা কি বল্‌বে আমিই বা কি বল্‌ব?

সুচরিতা কহিল, আমি কোনো কথাই বল্‌ব না। আপনি যদি বল্‌তে ইচ্ছা করেন তবে বল্‌বেন, সুচরিতার বয়স অল্প, ওর বুদ্ধি নেই, ওর মতি অস্থির। যেমন ইচ্ছা তেমনি বল্‌বেন! কিন্তু এ সম্বন্ধে এই আমাদের শেষ কথা হয়ে গেল!

হারান বাবু কহিলেন, শেষ কথা হতেই পারে না। পরেশ বাবু যদি—

বলিতে বলিতে পরেশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, কি পানু বাবু, আমার কথা কি বল্‌চেন?

সুচরিতা তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। হারান বাবু ডাকিয়া কহিলেন, সুচরিতা যেয়োনা, পরেশবাবুর কাছে কথাটা হয়ে যাক্।

সুচরিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। হারান বাবু কহিলেন, পরেশ বাবু, এতদিন পরে আজ সুচরিতা বল্‌চেন বিবাহে ওঁর মত নেই! এত বড় গুরুতর বিষয় নিয়ে কি এত দিন ওঁর খেলা করা উচিত ছিল? এই যে কদর্য্য উপসর্গটা ঘট্‌ল এজন্যে কি আপনাকেও দায়ী হতে হবে না?

পরেশ বাবু সুচরিতার মাথায় হাত বুলাইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, মা তোমার এখানে থাকবার দরকার নেই, তুমি যাও!

এই সামান্য কথাটুকু শুনিবামাত্র এক মুহূর্ত্তে অশ্রুজলে সুচরিতার দুই চোখ ভাসিয়া গেল এবং সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

পরেশ বাবু কহিলেন, সুচরিতা যে নিজের মন ভাল করে না বুঝেই বিবাহে সম্মতি দিয়েছিল এই সন্দেহ অনেক দিন থেকে আমার মনে উদয় হওয়াতেই সমাজের লোকের সামনে আপনাদের সম্বন্ধ পাকা করার বিষয়ে আমি আপনার অনুরোধ পালন করেতে পারিনি।

হারান বাবু কহিলেন, সুচরিতা তখন নিজের মন ঠিক বুঝেই সম্মতি দিয়েছিল, এখনই না বুঝে অসম্মতি দিচ্চে এরকম সন্দেহ আপনার মনে উদয় হচ্চে না ?

পরেশ বাবু কহিলেন, দুটোই হতে পারে কিন্তু এ রকম সন্দেহের স্থলে ত বিবাহ হতে পারে না।

হারান বাবু কহিলেন, আপনি সুচরিতাকে সৎপরামর্শ দেবেন না ?

পরেশ বাবু কহিলেন, আপনি নিশ্চয় জানেন সুচরিতাকে আমি কখনো সাধ্যমত অসৎ পরামর্শ দিতে পারি নে !

হারান বাবু কহিলেন, তাই যদি হত, তা'হলে সুচরিতার এ রকম পরিণাম কখনই ঘট্‌তে পারত না। আপনার পরিবারে আজ কাল যে সব ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে এ যে সমস্তই আপনার অবিবেচনার ফল এ কথা আমি আপনাকে মুখের সাম্‌নেই বল্‌চি !

পরেশ বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এ ত আপনি ঠিক কথাই বলচেন,—আমার পরিবারের সমস্ত ফলাফলের দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে ?

হারান বাবু কহিলেন, এজন্যে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে—সে আমি বলে রাখ্‌চি।

পরেশ বাবু কহিলেন, অনুতাপ ত ঈশ্বরের দয়া। অপরাধকেই ভয় করি, পানু বাবু, অনুতাপকে নয়।

সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়া পরেশ বাবুর হাত ধরিয়া কহিল, বাবা, তোমার উপাসনার সময় হয়েছে।

পরেশ বাবু কহিলেন, পানু বাবু, তবে কি একটু বস্‌বেন ?

হারান বাবু কহিলেন, না। বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

৪২

একই সময়ে নিজের অন্তরের সঙ্গে, আবার নিজের বাহিরের সঙ্গে সুচরিতার যে সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহাকে ভীত করিয়া তুলিয়াছে। গোরার প্রতি তাহার যে মনের ভাব এতদিন তাহার অলক্ষ্যে বল পাইয়া উঠিয়াছিল এবং গোরার জেলে যাবার পর হইতে যাহা তাহার নিজের কাছে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট এবং দুর্নিবাররূপে দেখা দিয়াছে তাহা লইয়া সে যে কি করিবে, তাহার পরিণাম যে কি তাহা সে কিছুই ভাবিয়া পায় না, সে কথা কাহাকেও বলিতে পারে না, নিজের কাছে নিজে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। এই নিগূঢ় বেদনাটাকে লইয়া সে গোপনে বসিয়া নিজের সঙ্গে যে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবে তাহার সে নিভৃত অবকাশটুকুও নাই—হারান বাবু তাহার দ্বারের কাছে তাঁহাদের সমস্ত সমাজকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছেন; এমন কি, ছাপার কাগজের ঢাকেও কাঠি পড়িবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহার উপরেও তাহার মাসির সমস্যা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে অতি সত্বর তাহার একটা কোনো মীমাংসা না করিলে একদিনও আর চলে না। সুচরিতা বুঝিয়াছে এবার তাহার জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে, চিরপরিচিত পথে চিরাভ্যস্ত ভাবে চলিবার দিন আর নাই।

এই তাহার সঙ্কটের সময় তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল পরেশবাবু। তাঁহার কাছে সে পরামর্শ চাহে নাই, উপদেশ চাহে নাই; অনেক কথা ছিল যাহা পরেশবাবুর সম্মুখে সে উপস্থিত করিতে পারিত না এবং এমন অনেক কথা ছিল যাহা লজ্জাকর হীনতাবশতই পরেশবাবুর কাছে প্রকাশের অযোগ্য। কেবল পরেশবাবুর জীবন, পরেশ বাবুর সঙ্গমাত্র

তাহাকে যেন নিঃশব্দে কোন্ পিতৃক্রোড়ে কোন্ মাতৃবক্ষে আকর্ষণ করিয়া লইত।

এখন শীতের দিন সন্ধ্যার সময় পরেশবাবু বাগানে যাইতেন না। বাড়ির পশ্চিমদিকের একটি ছোট ঘরে মুক্তদ্বারের সম্মুখে একখানি আসন পাতিয়া তিনি উপাসনায় বসিতেন; তাঁহার শুক্লকেশমণ্ডিত শান্তমুখের উপর সূর্য্যাস্তের আভা আসিয়া পড়িত। সেই সময়ে সুচরিতা নিঃশব্দপদে চুপ করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিত। নিজের অশান্ত ব্যথিত চিত্তটিকে সে যেন পরেশের উপাসনার গভীরতার মাঝখানে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। আজকাল উপাসনান্তে, প্রায়ই পরেশ দেখিতে পাইতেন তাঁহার এই কন্যাটি এই ছাত্রীটি স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কাছে বসিয়া আছে; তখন তিনি একটি অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিক মাধুর্য্যের দ্বারা এই বালিকাটিকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া নিঃশব্দে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

ভূমার সহিত মিলনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিল বলিয়া যাহা শ্রেয়তম এবং সত্যতম পরেশের চিত্ত সর্ব্বদাই তাহার অভিমুখ ছিল। এই জন্য সংসার কোনোমতেই তাঁহার কাছে অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিতে পারিত না। এইরূপে নিজের মধ্যে তিনি একটি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই মত বা আচরণ লইয়া তিনি অন্যের প্রতি কোন প্রকার জবরদস্তি করিতে পারিতেন না। মঙ্গলের প্রতি নির্ভর এবং সংসারের প্রতি ধৈর্য্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। ইহা তাঁহার এত অধিক পরিমাণে ছিল যে সাম্প্রদায়িক লোকের কাছে তিনি নিন্দিত হইতেন, কিন্তু নিন্দাকে তিনি এমন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন যে হয়ত তাহা তাঁহাকে আঘাত করিত কিন্তু তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া থাকিত না। তিনি মনের মধ্যে এই কথাটাই কেবলি থাকিয়া থাকিয়া আবৃত্তি করিতেন—আমি আর

কাহারও হাত হইতে কিছু লইব না আমি তাঁহার হাত হইতেই সমস্ত লইব।

পরেশের জীবনের এই গভীর নিস্তব্ধ শান্তির স্পর্শলাভ করিবার জন্যই আজকাল সুচরিতা নানা উপলক্ষেই তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অনভিজ্ঞ বালিকাবয়সে তাহার বিরুদ্ধ হৃদয় এবং বিরুদ্ধ সংসার যখন তাহাকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে তখন সে বারবার কেবল মনে করিয়াছে বাবার পা দুখানা মাথায় চাপিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণের জন্য যদি মাটিতে পড়িয়া থাকিতে পারি তাব আমার মন শান্তিতে ভরিয়া উঠে।

এইরূপে সুচরিতা মনে ভাবিতেছিল সে মনের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত আঘাতকে ঠেকাইয়া রাখিবে অবশেষে সমস্ত প্রতিকূলতা আপনি পরাস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিল না তাহাকে অপরিচিত পথে বাহির হইতে হইল।

বরদাসুন্দরী যখন দেখিলেন রাগ করিয়া ভৎর্সনা করিয়া সুচরিতাকে টলানো সম্ভব নহে এবং পরেশকেও সহায়রূপে পাইবার কোনো আশা নাই তখন হরিমোহিনীর প্রতি তাঁহার ক্রোধ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার গৃহের মধ্যে হরিমোহিনীর অস্তিত্ব তাঁহাকে উঠিতে বসিতে যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

সেদিন তাঁহার পিতার মৃত্যুদিনের বার্ষিক উপাসনা উপলক্ষে তিনি বিনয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উপাসনা সন্ধ্যার সময় হইবে, তৎপূর্ব্বেই তিনি সভাগৃহ সাজাইয়া রাখিতেছিলেন; সুচরিতা এবং অন্য মেয়েরাও তাঁহার সহায়তা করিতেছিল।

এমন সময় তাঁহার চোখে পড়িল বিনয় পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে হরিমোহিনীর নিকট যাইতেছে। মন যখন ভারাক্রান্ত থাকে তখন ক্ষুদ্র ঘটনাও বড় হইয়া উঠে। বিনয়ের এই উপরের ঘরে যাওয়া একমুহূর্ত্তে

তাঁহার কাছে এমন অসহ্য হইয়া উঠিল যে তিনি ঘর সাজানো ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ হরিমোহিনীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বিনয় মাদুরে বসিয়া আত্মীয়ের ন্যায় বিশ্রব্ধভাবে হরিমোহিনীর সহিত কথা কহিতেছে।

বরদাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, দেখ তুমি আমাদের এখানে যতদিন খুসি থাক আমি তোমাকে আদর যত্ন করেই রাখ্‌ব। কিন্তু আমি বলচি তোমার ঐ ঠাকুরকে এখানে রাখা চলবে না।

হরিমোহিনী চিরকাল পাড়াগাঁয়েই থাকিতেন। ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল যে তাহারা খৃষ্টানেরই শাখা বিশেষ। সুতরাং তাঁহাদেরই সংস্রব সম্বন্ধে বিচার করিবার বিষয় আছে কিন্তু তাহারাও যে তাঁহার সম্বন্ধে সঙ্কোচ অনুভব করিতে পারে ইহা তিনি এই কয়দিনে ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছিলেন। কি করা কর্ত্তব্য ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময়ে আজ বরদাসুন্দরীর মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে আর চিন্তা করিবার সময় নাই যাহা হয় একটা কিছু স্থির করিতে হইবে। প্রথমে ভাবিলেন কলিকাতায় একটা কোথাও বাসা লইয়া থাকিবেন তাহা হইলে মাঝে মাঝে সুচরিতা ও সতীশকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তাঁহার যে অল্প সম্বল, তাহাতে কলিকাতার খরচ চলিবে না।

বরদাসুন্দরী অকস্মাৎ ঝড়ের মত আসিয়া যখন চলিয়া গেলেন তখন বিনয় মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরিমোহিনী বলিয়া উঠিলেন—আমি তীর্থে যাব তোমরা কেউ আমাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে পারবে বাবা ?

বিনয় কহিল—খুব পারব। কিন্তু তার আয়োজন করতে ত দু চার দিন দেরি হবে, ততদিন চল মাসি তুমি আমার মার কাছে গিয়ে থাকবে।

হরিমোহিনী কহিলেন বাবা, আমার ভার বিষম ভার। বিধাতা আমার কপালের উপর কি বোঝা চাপিয়েছেন জানিনে, আমাকে কেউ বইতে পারে না। আমার শ্বশুর বাড়িতেও যখন আমার ভার সইল না তখনি আমার বোঝা উচিত ছিল! কিন্তু বড় অবুঝ মন বাবা—বুক যে খালি হয়ে গেছে সেইটে ভরাবার জন্যে কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি আমার পোড়া ভাগ্যও যে সঙ্গে সঙ্গে চলেচে। আর থাক্‌ বাবা, আর কারো বাড়িতে গিয়ে কাজ নেই—যিনি বিশ্বের বোঝা বন তাঁরি পাদপদ্মে এবার আমি আশ্রয় গ্রহণ করব—আর আমি পারিনে।—বলিয়া বারবার করিয়া দুই চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

বিনয় কহিল—সে বল্লে হবে না মাসি। আমার মার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা করলে চল্‌বে না। যিনি নিজের জীবনের সমস্ত ভার ভগবানকে সমর্পণ করতে পেরেচেন তিনি অন্যের ভার বইতে ক্লেশ বোধ করেন না। যেমন আমার মা—আর যেমন এখানে দেখ্‌লেন পরেশবাবু। সে আমি শুন্‌ব না—একবার আমার তীর্থে তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব তার পরে তোমার তীর্থ আমি দেখ্‌তে যাব।

হরিমোহিনী কহিলেন, তাঁদের তা হলে ত একবার খবর দিয়ে—

বিনয় কহিল—আমরা গেলেই মা খবর পাবেন—সেইটেই হবে পাকা খবর!

হরিমোহিনী কহিলেন—তা হলে কাল সকালে—

বিনয় কহিল, দরকার কি! আজ রাত্রেই গেলে হবে!

সন্ধ্যার সময় সুচরিতা আসিয়া কহিল, বিনয় বাবু, মা আপনাকে ডাকতে পাঠালেন। উপাসনার সময় হয়েছে।

বিনয় কহিল মাসির সঙ্গে কথা আছে, আজ আমি যেতে পারব না।

আসল কথা, আজ বিনয় বরদাসুন্দরীর উপাসনার নিমন্ত্রণ কোনোমতে স্বীকার করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল সমস্তই বিড়ম্বনা।

হরিমোহিনী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল, বাবা তুমি যাও। আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সে পরে হবে। তোমাদের কাজকর্ম্ম আগে হয়ে যাক তার পরে তুমি এসো।

সুচরিতা কহিল, আপনি এলে কিন্তু ভাল হয়।

বিনয় বুঝিল সে সভাক্ষেত্রে না গেলে এই পরিবারে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে তাহাকে কিছু পরিমাণে আরো অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। এইজন্য সে উপাসনাস্থলে গেল কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ ফল লাভ হইল না।

উপাসনার পর আহার ছিল—বিনয় কহিল আজ আমার ক্ষুধা নেই।

বরদাসুন্দরী কহিলেন—ক্ষুধার অপরাধ নেই। আপনি ত উপরেই খাওয়া সেরে এসেচেন।

বিনয় হাসিয়া কহিল, হাঁ, লোভী লোকের এই রকম দশাই ঘটে! উপস্থিতের প্রলোভনে ভবিষ্যৎ খুইয়ে বসে। এই বলিয়া বিনয় প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, উপরে যাচ্চেন বুঝি?

বিনয় সংক্ষেপে কেবল হাঁ বলিয়া বাহির হইয়া গেল; দ্বারের কাছে সুচরিতা ছিল তাহাকে মৃদুস্বরে কহিল, দিদি একবার মাসির কাছে যাবেন বিশেষ কথা আছে।

ললিতা আতিথ্যে নিযুক্ত ছিল। একসময় সে হারান বাবুর কাছে আসিতেই তিনি অকারণে বলিয়া উঠিলেন, বিনয় বাবু ত এখানে নেই তিনি উপরে গিয়েচেন।

শুনিয়াই ললিতা সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া অসঙ্কোচে কহিল, জানি। তিনি আমার সঙ্গে না দেখা করে যাবেন না। আমার এখানকার কাজ সারা হলেই উপরে যাব এখন!

ললিতাকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত করিতে না পারিয়া হারানের অন্তররুদ্ধ

দাহ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিনয় সুচরিতাকে হঠাৎ কি একটা বলিয়া গেল এবং সুচরিতা অনতিকাল পরেই তাহার অনুসরণ করিল ইহাও হারানবাবুর লক্ষ্য এড়াইতে পারে নাই। তিনি আজ সুচরিতার সহিত আলাপের উপলক্ষ্য সন্ধান করিয়া বারম্বার অকৃতার্থ হইয়াছেন—দুই একবার সুচরিতা তাঁহার সুস্পষ্ট আহ্বান এমন করিয়া এড়াইয়া গেছে যে সভাস্থ লোকের কাছে হারানবাবু নিজেকে অপদস্থ জ্ঞান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মন সুস্থ ছিল না।

সুচরিতা উপরে গিয়া দেখিল হরিমোহিনী তাঁহার জিনিষপত্র গুছাইয়া এমনভাবে বসিয়া আছেন যেন এখনি কোথায় যাইবেন। সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল মাসি এ কি?

হরিমোহিনী তাহার কোনো উত্তর দিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কহিলেন, সতীশ কোথায় আছে তাকে একবার ডেকে দাও মা!

সুচরিতা বিনয়ের মুখের দিকে চাইতেই বিনয় কহিল—এবাড়িতে মাসি থাকলে সকলেরি অসুবিধে হয় তাই আমি ওঁকে মার কাছে নিয়ে যাচ্চি।

হরিমোহিনী কহিলেন, সেখানে থেকে আমি তীর্থে যাব মনে করেচি। আমার মত লোকের কারো বাড়িতে এরকম করে থাকা ভাল হয় না। চিরদিন লোকে আমাকে এমন করে সহ্যই বা করবে কেন?

সুচরিতা নিজেই একথা কয়েক দিন হইতে ভাবিতেছিল। এবাড়িতে বাস করা যে তাহার মাসির পক্ষে অপমান তাহা সে অনুভব করিয়াছিল সুতরাং সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। চুপ করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রি হইয়াছে; ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। কলিকাতার হেমন্তের অস্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি বাষ্পাচ্ছন্ন। কাহাদের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল তাহা সেই অন্ধকারে দেখা গেল না।

সিঁড়ি হইতেই সতীশের উচ্চকণ্ঠে মাসিমা ধ্বনি শুনা গেল। কি

বাবা, এস বাবা বলিয়া হরিমোহিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন! সুচরিতা কহিল, মাসিমা, আজ রাত্রে কোথাও যাওয়া হতেই পারে না, কাল সকালে সমস্ত ঠিক করা যাবে। বাবাকে ভাল করে না বলে তুমি কি করে যেতে পারবে বল! সে যে বড় অন্যায় হবে।

বিনয় বরদাসুন্দরী কর্ত্তৃক হরিমোহিনীর অপমানে উত্তেজিত হইয়া একথা ভাবে নাই। সে স্থির করিয়াছিল এক রাত্রিও মাসির এবাড়িতে থাকা উচিত হইবে না—এবং আশ্রয়ের অভাবেই যে হরিমোহিনী সমস্ত সহ্য করিয়া এবাড়িতে রহিয়াছেন বরদাসুন্দরীর সেই ধারণা দূর করিবার জন্য বিনয় হরিমোহিনীকে এখান হইতে লইয়া যাইতে লেশমাত্র বিলম্ব করিতে চাহিতেছিল না। সুচরিতার কথা শুনিয়া বিনয়ের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, এবাড়িতে বরদাসুন্দরীর সঙ্গেই যে হরিমোহিনীর একমাত্র এবং সর্ব্বপ্রধান সম্বন্ধ তাহা নহে। যে ব্যক্তি অপমান করিয়াছে তাহাকেই বড় করিয়া দেখিতে হইবে আর যে লোক উদারভাবে আত্মীয়ের মত আশ্রয় দিয়াছে তাহাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে এ ত ঠিক নহে।

বিনয় বলিয়া উঠিল, সে ঠিক কথা। পরেশ বাবুকে না জানিয়ে কোনোমতেই যাওয়া যায় না।

সতীশ আসিয়াই কহিল, মাসিমা, জান রাশিয়ানরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসচে? ভারি মজা হবে!

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কার দলে?

সতীশ কহিল—আমি রাশিয়ানের দলে।

বিনয় কহিল—তাহলে রাশিয়ানের আর ভাবনা নেই।

এইরূপে সতীশ মাসিমার সভা জমাইয়া তুলিতেই সুচরিতা আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

সুচরিতা জানিত শুইতে যাইবার পুর্ব্বে পরেশবাবু তাঁহার কোনো একটি প্রিয় বই খানিকটা করিয়া পড়িতেন। কতদিন এইরূপ সময়ে

সুচরিতা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়াছে এবং সুচরিতার অনুরোধে পরেশবাবু তাহাকেও পড়িয়া শুনাইয়াছেন।

আজও তাঁহার নির্জ্জন ঘরে পরেশবাবু আলোটি জ্বালাইয়া এমার্সনের গ্রন্থ পড়িতেছিলেন। সুচরিতা ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। পরেশবাবু বইখানি রাখিয়া একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সুচরিতার সঙ্কল্প ভঙ্গ হইল—সে সংসারের কোনো কথাই তুলিতে পারিল না! কহিল, বাবা, আমাকে পড়ে শোনাও।

পরেশবাবু তাহাকে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা বাজিয়া গেলে পড়া শেষ হইল। তখনো সুচরিতা নিদ্রার পূর্ব্বে পরেশ বাবুর মনে কোনোপ্রকার ক্ষোভ পাছে জন্মে এইজন্য কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল।

পরেশবাবু তাহাকে স্নেহস্বরে ডাকিলেন—রাধে।

সে তখন ফিরিয়া আসিল। পরেশবাবু কহিলেন—তুমি তোমার মাসির কথা আমাকে বলতে এসেছিলে ?

পরেশবাবু তাহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন জানিয়া সুচরিতা বিস্মিত হইয়া বলিল, হাঁ বাবা, কিন্তু আজ থাক্ কাল সকালে কথা হবে।

পরেশবাবু কহিলেন—বোস।

সুচরিতা বসিলে তিনি কহিলেন—তোমার মাসির এখানে কষ্ট হচ্চে সে কথা আমি চিন্তা করেছি। তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচরণ লাবণ্যর মার সংস্কারে যে এত বেশি আঘাত দেবে তা আমি আগে ঠিক জান্‌তে পারিনি! যখন দেখচি তাঁকে পীড়া দিচ্চে তখন এ বাড়িতে তোমার মাসিকে রাখ্‌লে তিনি সঙ্কুচিত হয়ে থাক্‌বেন।

সুচরিতা কহিল—আমার মাসি এখান থেকে যাবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েচেন।

পরেশবাবু কহিলেন, আমি জান্‌তুম যে তিনি যাবেন। তোমরা দুজনেই তাঁর একমাত্র আত্মীয়—তোমরা তাঁকে এমন অনাথার মত বিদায় দিতে পারবে না সেও আমি জানি। তাই আমি এ কয়দিন এসম্বন্ধে ভাবছিলুম।

তাহার মাসি কি সঙ্কটে পড়িয়াছেন পরেশবাবু যে তাহা বুঝিয়াছেন ও তাহা লইয়া ভাবিতেছেন একথা সুচরিতা একেবারেই অনুমান করে নাই। পাছে তিনি জানিতে পারিয়া বেদনা বোধ করেন এই ভয়ে সে এতদিন অত্যন্ত সাবধানে চলিতেছিল—আজ পরেশবাবুর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং তাহার চোখের পাতা ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল।

পরেশবাবু কহিলেন—তোমার মাসির জন্যে আমি একটি বাড়ি ঠিক করে রেখেছি।

সুচরিতা কহিল—কিন্তু তিনি ত—

পরেশবাবু। ভাড়া দিতে পারবেন না! ভাড়া তিনি কেন দেবেন? তুমি ভাড়া দেবে।

সুচরিতা অবাক্ হইয়া পরেশবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরেশবাবু হাসিয়া কহিলেন, তোমারই বাড়িতে থাক্‌তে দিয়ো, ভাড়া দিতে হবে না।

সুচরিতা আরো বিস্মিত হইল। পরেশবাবু কহিলেন, কলকাতায় তোমাদের দুটো বাড়ি আছে জান না! একটি তোমার একটি সতীশের। মৃত্যুর সময়ে তোমার বাবা আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যান। আমি তাই খাটিয়ে বাড়িয়ে তুলে কলকাতায় দুটো বাড়ি কিনেছি। এত দিন তার ভাড়া পাচ্ছিলুম, তাও জমছিল। তোমার বাড়ির ভাড়াটে অল্পদিন হল উঠে গেছে—সেখানে তোমার মাসির থাকবার কোনো অসুবিধা হবে না।

সুচরিতা কহিল, সেখানে তিনি কি একলা থাক্‌তে পারবেন?

পরেশবাবু কহিলেন, তোমরা তাঁর আপনার লোক থাক্‌তে তাঁকে একলা থাকতে হবে কেন?

সুচরিতা কহিল, সেই কথাই তোমাকে বলবার জন্যে আজ এসেছিলুম। মাসি চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েচেন, আমি ভাব্‌ছিলুম আমি একলা কি করে তাঁকে যেতে দেব। তাই তোমার উপদেশ নেব বলে এসেচি। তুমি যা বল্‌বে আমি তাই করব।

পরেশবাবু কহিলেন, আমাদের বাসার গায়েই এই যে গলি, এই গলির দুটো তিনটে বাড়ি পরেই তোমার বাড়ি—ঐ বারান্দায় দাঁড়ালে সে বাড়ি দেখা যায়। সেখানে তোমরা থাক্‌লে নিতান্ত অরক্ষিত অবস্থায় থাক্‌তে হবে না। আমি তোমাদের দেখ্‌তে শুন্‌তে পারব।

সুচরিতার বুকের উপর হইতে একটা মস্ত পাথর নামিয়া গেল। বাবাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া যাইব এই চিন্তার সে কোনো অবধি পাইতেছিল না। কিন্তু যাইতেই হইবে ইহাও তাহার কাছে নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সুচরিতা আবেগপরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া চুপ করিয়া পরেশবাবুর কাছে বসিয়া রহিল। পরেশবাবুও স্তব্ধ হইয়া নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে নিহিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচরিতা তাঁহার শিষ্যা, তাঁহার কন্যা, তাঁহার সুহৃদ্‌। সে তাঁহার জীবনের, এমন কি, তাঁহার ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। যে দিন সে নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার উপাসনার সহিত যোগ দিত—সে দিন তাঁহার উপাসনা যেন বিশেষ পূর্ণতা লাভ করিত। প্রতিদিন সুচরিতার জীবনকে মঙ্গলপূর্ণ স্নেহের দ্বারা গড়িতে গড়িতে তিনি নিজের জীবনকেও একটি বিশেষ পরিণতি দান করিতেছিলেন। সুচরিতা যেমন ভক্তি যেমন একান্ত নম্রতার সহিত তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এমন করিয়া আর কেহ তাঁহার কাছে আসে নাই;—ফুল যেমন করিয়া আকাশের দিকে তাকায় সে

তেমনি করিয়া তাঁহার দিকে তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে উন্মুখ এবং উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। এমন একাগ্রভাবে কেহ কাছে আসিলে মানুষের দান করিবার শক্তি আপনি বাড়িয়া যায়—অন্তঃকরণ জলভারনম্র মেঘের মত পরিপূর্ণতার দ্বারা নত হইয়া পড়ে। নিজের যাহা কিছু সত্য যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা কোনো অনুকূল চিত্তের নিকট প্রতিদিন দান করিবার সুযোগের মত এমন শুভযোগ মানুষের কাছে আর কিছু হইতেই পারে না; সেই দুর্লভ সুযোগ সুচরিতা পরেশকে দিয়াছিল। এজন্য সুচরিতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীর হইয়াছিল। আজ সেই সুচরিতার সঙ্গে তাঁহার বাহ্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে;—ফলকে নিজের জীবনরসে পরিপক করিয়া তুলিয়া তাহাকে গাছের নিকট হইতে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এজন্য তিনি মনের মধ্যে যে বেদনা অনুভব করিতেছিলেন সেই নিগূঢ় বেদনাটিকে তিনি অন্তর্যামীর নিকট নিবেদন করিয়া দিতেছিলেন। সুচরিতার পাথেয় সঞ্চয় হইয়াছে এখন নিজের শক্তিতে প্রশস্ত পথে সুখে দুঃখে আঘাত প্রতিঘাতে নূতন অভিজ্ঞতা লাভের দিকে যে তাহার আহ্বান আসিয়াছে তাহার আয়োজন কিছুদিন হইতেই পরেশ লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, বৎসে যাত্রা কর—তোমার চিরজীবন যে কেবল আমার বুদ্ধি এবং আমার আশ্রয়ের দ্বারাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব এমন কখনই হইতে পারিবে না—ঈশ্বর আমার নিকট হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়া বিচিত্রের ভিতর দিয়া তোমাকে চরম পরিণামে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান—তাঁহার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হউক! এই বলিয়া আশৈশব-স্নেহপালিত সুচরিতাকে তিনি মনের মধ্যে নিজের দিক হইতে ঈশ্বরের দিকে পবিত্র উৎসর্গ সামগ্রীর মত তুলিয়া ধরিতেছিলেন। পরেশ বরদাসুন্দরীর প্রতি রাগ করেন নাই, নিজের সংসারের প্রতি মনকে কোনো প্রকার বিরোধ অনুভব করিতে প্রশ্রয় দেন নাই; তিনি জানিতেন সঙ্কীর্ণ উপকূলের

মাঝখানে নূতন বর্ষণের জলরাশি হঠাৎ আসিয়া পড়িলে অত্যন্ত একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়—তাহার একমাত্র প্রতিকার তাকে প্রশস্ত ক্ষেত্রে মুক্ত করিয়া দেওয়া। তিনি জানিতেন অল্প দিনের মধ্যে সুচরিতাকে আশ্রয় করিয়া এই ছোট পরিবারটির মধ্যে যে সকল অপ্রত্যাশিত সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহা এখানকার বাঁধা সংস্কারকে পীড়িত করিতেছে, তাহাকে এখানে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া মুক্তিদান করিলেই তবেই স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য ঘটিয়া সমস্ত শান্ত হইতে পারিবে। ইহা জানিয়া যাহাতে সহজে সেই শান্তি ও সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে নীরবে তাহারই আয়োজন করিতেছিলেন।

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ঘড়িতে এগারোটা বাজিয়া গেল। তখন পরেশবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুচরিতার হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়িবারান্দার ছাদে লইয়া গেলেন। সন্ধ্যাকাশের বাষ্প কাটিয়া গিয়া তখন নির্ম্মল অন্ধকারের মধ্যে তারাগুলি দীপ্তি পাইতেছিল। সুচরিতাকে পাশে লইয়া পরেশ সেই নিস্তব্ধ রাত্রে প্রার্থনা করিলেন—সংসারের সমস্ত অসত্য কাটিয়া পরিপূর্ণ সত্য আমাদের জীবনের মাঝখানে নির্ম্মল মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুন্।

৪৩

পরদিন প্রাতে হরিমোহিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া পরেশকে প্রণাম করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া সরিয়া গিয়া কহিলেন, করেন কি?

হরিমোহিনী অশ্রুনেত্রে কহিলেন, আপনার ঋণ আমি কোনো জন্মে শোধ করতে পারব না। আমার মত এত বড় নিরুপায়ের আপনি উপায় করে দিয়েচেন এ আপনি ভিন্ন আর কেউ করতে পারত না। ইচ্ছে করলেও আমার ভাল কেউ করতে পারে না এ আমি দেখেচি—তোমার

উপর ভগবানের খুব অনুগ্রহ আছে তাই তুমি আমার মত লোকের উপরেও অনুগ্রহ করতে পেরেচ!

পরেশবাবু অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, আমি বিশেষ কিছুই করিনি—এ সমস্ত রাধারাণী—

হরিমোহিনী বাধা দিয়া কহিলেন, জানি জানি—কিন্তু রাধারাণীই যে তোমার—ও যা করে সে যে তোমারি করা। ওর যখন মা গেল, ওর বাপও রইল না তখন ভেবেছিলুম মেয়েটা বড় দুর্ভাগিনী—কিন্তু ওর দুঃখের কপালকে ভগবান যে এমন ধন্য করে তুল্‌বেন তা কেমন করে জান্‌ব বল! দেখ, ঘুরে ফিরে শেষে আজ তোমার দেখা যখন পেয়েছি তখন বেশ বুঝতে পেরেছি ভগবান আমাকেও দয়া করেচেন।

মাসি, মা এসেচেন তোমাকে নেবার জন্যে—বলিয়া বিনয় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুচরিতা উঠিয়া পড়িয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, কোথায় তিনি?

বিনয় কহিল নীচে আপনার মার কাছে বসে আছেন।

সুচরিতা তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল।

পরেশবাবু হরিমোহিনীকে কহিলেন আমি আপনার বাড়িতে জিনিষ-পত্র সমস্ত গুছিয়ে দিয়ে আসিগে।

পরেশবাবু চলিয়া গেলে বিস্মিত বিনয় কহিল—মাসি, তোমার বাড়ির কথা ত জানতুম না।

হরিমোহিনী কহিলেন আমিও যে জানতুম না বাবা। জান্‌তেন কেবল পরেশবাবু। আমাদের রাধারাণীর বাড়ি।

বিনয় সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কহিল, ভেবেছিলুম পৃথিবীতে বিনয় একজন কারো একটা কোনো কাজে লাগবে। তাও ফস্‌কে গেল। এ পর্য্যন্ত মায়ের ত কিছুই করতে পারিনি, যা করবার সে তিনিই আমার করেন—মাসিরও কিছু করতে পারব না তাঁর কাছ থেকেই আদায় করব। আমার ঐ নেবারই কপাল, দেবার নয়।

কিছুক্ষণ পরে ললিতা ও সুচরিতার সঙ্গে আনন্দময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিমোহিনী অগ্রসর হইয়া গিয়া কহিলেন—ভগবান যখন দয়া করেন তখন আর কৃপণতা করেন না—দিদি তোমাকেও আজ পেলুম। বলিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে আনিয়া মাদুরের পরে বসাইলেন।

হরিমোহিনী কহিলেন, দিদি তোমার কথা ছাড়া বিনয়ের মুখে আর কোনো কথা নেই।

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন—ছেলে বেলা থেকেই ওর ঐ রোগ, যে কথা ধরে সে কথা শীঘ্র ছাড়ে না। শীঘ্র মাসির পালাও সুরু হবে।

বিনয় কহিল—তা হবে, সে আমি আগে থাকতেই বলে রাখ্‌চি। আমার অনেক বয়সের মাসি, নিজে সংগ্রহ করেছি, এতদিন যে বঞ্চিত ছিলুম নানা রকম করে সেটা পুষিয়ে নিতে হবে।

আনন্দময়ী ললিতার দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন—আমাদের বিনয়, ওর যা অভাব তা সংগ্রহ করতেও জানে আর সংগ্রহ করে প্রাণ মনে তার আদর করতেও জানে। তোমাদের ও যে কি চোখে দেখেচে সে আমিই জানি—যা কখনো ভাবতে পারত না তারই যেন হঠাৎ সাক্ষাৎ পেয়েছে! তোমাদের সঙ্গে ওদের জানাশোনা হওয়াতে আমি যে কত খুসি হয়েছি সে আর কি বল্‌ব মা! তোমাদের এই ঘরে যে এমন করে বিনয়ের মন বসেছে তাতে ওর ভারি উপকার হয়েছে। সে কথা ও খুব বোঝে আর স্বীকার করতেও ছাড়ে না।

ললিতা একটা কিছু উত্তর করিবার চেষ্টা করিয়াও কথা খুঁজিয়া পাইল না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সুচরিতা ললিতার বিপদ দেখিয়া কহিল—সকল মানুষের ভিতরকার ভালটি বিনয় বাবু দেখ্‌তে পান, এই জন্যই সকল মানুষের যেটুকু ভাল সেটুকু ওঁর ভোগে আসে। সে অনেকটা ওঁর গুণ।

বিনয় কহিল মা, তুমি বিনয়কে যত বড় আলোচনার বিষয় বলে ঠিক

করে রেখেচ সংসারে তার তত বড় গৌরব নেই। একথাটা তোমাকে বোঝাব মনে করি নিতান্তই অহঙ্কারবশতই পারিনে। কিন্তু আর চল্‌ না। মা আর নয়, বিনয়ের কথা আজ এই পর্য্যন্ত!

এমন সময় সতীশ তাহার অচিরজাত কুক্কুরশাবকটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিমোহিনী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন—বাবা সতীশ, লক্ষ্মী বাপ আমার, ও কুকুরটাকে নিয়ে যাও বাবা।

সতীশ কহিল, ও কিছু করবে না মাসি। ও তোমার ঘরে যাবে না। তুমি ওকে একটু আদর কর, ও কিছু বল্‌বে না।

হরিমোহিনী সরিয়া গিয়া কহিলেন, না, বাবা, না ওকে নিয়ে যাও!

তখন আনন্দময়ী কুকুরসুদ্ধ সতীশকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন। কুকুরকে কোলের উপর লইয়া সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সতীশ, না? আমাদের বিনয়ের বন্ধু?

বিনয়ের বন্ধু বলিয়া নিজের পরিচয়কে সতীশ কিছুই অসঙ্গত মনে করিত না সুতরাং সে অসঙ্কোচে বলিল—হাঁ। বলিয়া আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, আমি যে বিনয়ের মা হই।

কুকুরশাবক আনন্দময়ীর হাতের বালা চর্ব্বণের চেষ্টা করিয়া আত্ম-বিনোদনে প্রবৃত্ত হইল। সুচরিতা কহিল, বক্তিয়ার, মাকে প্রণাম কর্!

সতীশ লজ্জিতভাবে কোনোমতে প্রণামটা সারিয়া লইল।

এমন সময় বরদাসুন্দরী উপরে আসিয়া হরিমোহিনীর দিকে দৃক্‌পাত-মাত্র না করিয়া আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি আমাদের এখানে কিছু খাবেন?

আনন্দময়ী কহিলেন, খাওয়া ছোঁওয়া নিয়ে আমি কিছু বাছ বিচার করিনে। কিন্তু আজকে থাক্—গোরা ফিরে আসুক তার পরে খাব।

আনন্দময়ী গোরার অসাক্ষাতে গোরার অপ্রিয় কোনো আচরণ করিতে পারিলেন না।

বরদাসুন্দরী বিনয়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, এই যে বিনয় বাবু এখানে; আমি বলি আপনি আসেন নি বুঝি?

বিনয় তৎক্ষণাৎ বলিল, আমি যে এসেছি সে বুঝি আপনাকে না জানিয়ে যাব ভেবেচেন?

বরদাসুন্দরী কহিলেন, কাল ত নিমন্ত্রণের খাওয়া ফাঁকি দিয়েচেন আজ না হয় বিনা নিমন্ত্রণের খাওয়া খাবেন।

বিনয় কহিল—সেইটেতেই আমার লোভ বেশি। মাইনের চেয়ে উপ্‌রি পাওনার টান বড়।

হরিমোহিনী মনে মনে বিস্মিত হইলেন। বিনয় এবাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে—আনন্দময়ীও বাছ বিচার করেন না। ইহাতে তাঁহার মন প্রসন্ন হইল না।

বরদাসুন্দরী চলিয়া গেলে হরিমোহিনী সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন—দিদি, তোমার স্বামী কি—

আনন্দময়ী কহিলেন,—আমার স্বামী খুব হিন্দু।

হরিমোহিনী অবাক্ হইয়া রহিলেন। আনন্দময়ী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—বোন, যতদিন সমাজ আমার সক্‌লের চেয়ে বড় ছিল ততদিন সমাজকেই মেনে চলতুম কিন্তু একদিন ভগবান আমার ঘরে হঠাৎ এমন করে দেখা দিলেন যে আমাকে আর সমাজ মান্‌তে দিলেন না। তিনি নিজে এসে আমার জাত কেড়ে নিয়েচেন তখন আমি আর কাকে ভয় করি!

হরিমোহিনী এ কৈফিয়তের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন—তোমার স্বামী?

আনন্দময়ী কহিলেন, আমার স্বামী রাগ করেন।

হরিমোহিনী। ছেলেরা?

আনন্দময়ী। ছেলেরাও খুসি নয়। কিন্তু তাদের খুসি করেই কি বাঁচব? বোন্ আমার এ কথা কাউকে বোঝাবার নয়—যিনি সব জানেন তিনিই বুঝ্‌বেন।

বলিয়া আনন্দময়ী হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

হরিমোহিনী ভাবিলেন হয় ত কোনো মিশনারির মেয়ে আসিয়া আনন্দময়ীকে খৃষ্টানি ভজাইয়া গেছে। তাঁহার মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা সঙ্কোচ উপস্থিত হইল।

৪৪

লাবণ্য ললিতা লীলা সুচরিতার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত উৎসাহ করিয়া তাহার নূতন বাড়ির ঘর সাজাইতে গেল কিন্তু সেই উৎসাহের ভিতরেও অব্যক্ত বেদনার অশ্রুজল প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল।

এতদিন পর্য্যন্ত সুচরিতা নানা ছুতা করিয়া পরেশ বাবুর কত কি ছোটখাট কাজ করিয়া আসিয়াছে। হয় ত ফুলদানিতে ফুল সাজাইয়াছে, টেবিলের উপর বই গুছাইয়াছে, নিজের হাতে বিছানা রৌদ্রে দিয়াছে, স্নানের সময় প্রত্যহ তাঁহাকে খবর দিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছে—এই সমস্ত অভ্যস্ত কাজের কোনো গুরুত্বই প্রতিদিন কোনো পক্ষ অনুভব করে না। কিন্তু এ সকল অনাবশ্যক কাজও যখন বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হয় তখন এই সকল ছোটখাট সেবা, যাহা একজনে না করিলেও অনায়াসে আর একজন করিতে পারে, যাহা না করিলেও কাহারো বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না, এই গুলিই দুই পক্ষের চিত্তকে মথিত করিতে থাকে। সুচরিতা আজ কাল যখন পরেশের ঘরের কোনো সামান্য কাজ করিতে আসে তখন সেই কাজটা পরেশের কাছে মস্ত হইয়া দেখা দেয় ও তাঁহার বক্ষের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস

জমা হইয়া উঠে। এবং এই কাজ আজ বাদে কাল অন্যের হাতে সম্পন্ন হইতে থাকিবে এই কথা মনে করিয়া সুচরিতার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসে।

যেদিন মধ্যাহ্নে আহার করিয়া সুচরিতাদের নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাইবার কথা সেদিন প্রাতঃকালে পরেশ বাবু তাঁহার নিভৃত ঘরটিতে উপাসনা করিতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার আসনের সম্মুখদেশ ফুল দিয়া সাজাইয়া ঘরের একপ্রান্তে সুচরিতা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। লাবণ্যলীলারাও উপাসনাস্থলে আজ আসিবে এইরূপ তাহারা পরামর্শ করিয়াছিল কিন্তু ললিতা তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া আসিতে দেয় নাই। ললিতা জানিত, পরেশ বাবুর নির্জ্জন উপাসনায় যোগ দিয়া সুচরিতা যেন বিশেষভাবে তাঁহার আনন্দের অংশ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিত—আজ প্রাতঃকালে সেই আশীর্ব্বাদ সঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য সুচরিতার যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাহাই অনুভব করিয়া ললিতা অদ্যকার উপাসনার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতে দেয় নাই।

উপাসনা শেষ হইয়া গেলে যখন সুচরিতার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল তখন পরেশ বাবু কহিলেন, মা, পিছন দিকে ফিরে তাকিয়ো না, সম্মুখের পথে অগ্রসর হয়ে যাও—মনে সঙ্কোচ রেখো না। যাই ঘটুক, যাই তোমার সম্মুখে উপস্থিত হোক, তার থেকে সম্পূর্ণ নিজের শক্তিতে ভালোকে গ্রহণ করবে এই পণ করে আনন্দের সঙ্গে বেরিয়ে পড়! ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে তাঁকেই নিজের একমাত্র সহায় কর—তাহলে ভুল ত্রুটি ক্ষতির মধ্যে দিয়েও লাভের পথে চল্‌তে পারবে —আর যদি নিজেকে আধাআধি ভাগ কর, কতক ঈশ্বরে কতক অন্যত্রে, তাহলে সমস্ত কঠিন হয়ে উঠ্‌বে। ঈশ্বর এই করুন তোমার পক্ষে আমাদের ক্ষুদ্র আশ্রয়ের আর যেন প্রয়োজন না হয়।

উপাসনার পরে উভয়ে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বসিবার ঘরে

হারানবাবু অপেক্ষা করিয়া আছেন। সুচরিতা আজ কাহারও বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহভাব মনে রাখিবে না পণ করিয়া হারানবাবুকে নম্রভাবে নমস্কার করিল। হারানবাবু তৎক্ষণাৎ চৌকির উপরে নিজেকে শক্ত করিয়া তুলিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে কহিলেন—সুচরিতা, এতদিন তুমি যে সত্যকে আশ্রয় করে ছিলে আজ তার থেকে পিছিয়ে পড়তে যাচ্চ, আজ আমাদের শোকের দিন।

সুচরিতা কোনো উত্তর করিল না—কিন্তু যে রাগিণী তাহার মনের মধ্যে আজ শান্তির সঙ্গে করুণা মিশাইয়া সঙ্গীতে জমিয়া উঠিতেছিল তাহাতে একটা বেসুর আসিয়া পড়িল।

পরেশবাবু কহিলেন—অন্তর্যামী জানেন কে এগচ্চে, কে পিছচ্চে, বাইরে থেকে বিচার করে আমরা বৃথা উদ্বিগ্ন হই।

হারানবাবু কহিলেন—তাহলে আপনি কি বলতে চান আপনার মনে কোনো আশঙ্কা নেই? আর আপনার অনুতাপেরও কোনো কারণ ঘটেনি?

পরেশবাবু কহিলেন—পানুবাবু, কাল্পনিক আশঙ্কাকে আমি মনে স্থান দিইনে এবং অনুতাপের কারণ ঘটেছে কি না তা তখনি বুঝব যখন অনুতাপ জন্মাবে।

হারানবাবু কহিলেন—এই যে আপনার কন্যা ললিতা একলা বিনয় বাবুর সঙ্গে ষ্টীমারে করে চলে এলেন এটাও কি কাল্পনিক?

সুচরিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। পরেশবাবু কহিলেন—পানুবাবু আপনার মন যে-কোনো কারণে হোক্ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এই জন্যে এখন এসম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলাপ করলে আপনার প্রতি অন্যায় করা হবে।

হারান বাবু মাথা তুলিয়া বলিলেন—আমি উত্তেজনার বেগে কোনো কথা বলিনে—আমি যা বলি সে সম্বন্ধে আমার দায়িত্ববোধ যথেষ্ট আছে;

সে জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনাকে যা বল্‌চি সে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলচিনে, আমি ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে বলচি—না বলা অন্যায় বলেই বল্‌চি। আপনি যদি অন্ধ হয়ে না থাকৃতেন তা হলে, ঐ যে বিনয়বাবুর সঙ্গে ললিতা একলা চলে এল এই একটি ঘটনা থেকেই আপনি বুঝ্‌তে পারতেন আপনার এই পরিবার ব্রাহ্মসমাজের নোঙর ছিঁড়ে ভেসে চলে যাবার উপক্রম করচে। এতে যে শুধু আপনারই অনুতাপের কারণ ঘট্‌বে তা নয় এতে ব্রাহ্মসমাজেরও অগৌরবের কথা আছে।

পরেশবাবু কহিলেন, নিন্দা করতে গেলে বাইরে থেকে করা যায় কিন্তু বিচার করতে গেলে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। কেবল ঘটনা থেকে মানুষকে দোষী করবেন না।

হারানবাবু কহিলেন—ঘটনা শুধু শুধু ঘটেনা, তাকে আপনারা ভিতরের থেকেই ঘটিয়ে তুলেচেন। আপনি এমন সব লোককে পরিবারের মধ্যে আত্মীয়ভাবে টান্‌চেন যারা আপনার পরিবারকে আপনার আত্মীয় সমাজ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়। দূরেই ত নিয়ে গেল সে কি আপনি দেখ্‌তে পাচ্চেন না?

পরেশবাবু একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—আপনার সঙ্গে আমার দেখ্‌বার প্রণালী মেলে না।

হারানবাবু কহিলেন—আপনার না মিল্‌তে পারে। কিন্তু আমি সুচরিতাকেই সাক্ষী মান্‌চি উনিই সত্য করে বলুন দেখি, ললিতার সঙ্গে বিনয়ের যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, সে কি শুধু বাইরের সম্বন্ধ? তাদের অন্তরকে কোনোখানেই স্পর্শ করেনি? না, সুচরিতা, তুমি চলে গেলে হবে না—একথার উত্তর দিতে হবে! এ গুরুতর কথা!

সুচরিতা কঠোর হইয়া কহিল—যতই গুরুতর হোক্ একথায় আপনার কোনো অধিকার নেই!

হারানবাবু কহিলেন—অধিকার না থাক্‌লে আমি যে শুধু চুপ করে থাক্‌তুম তা নয়, চিন্তাও করতুম না। সমাজকে তোমরা গ্রাহ্য না করতে পার কিন্তু যতদিন সমাজে আছ ততদিন সমাজ তোমাদের বিচার করতে বাধ্য।

ললিতা ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—সমাজ যদি আপনাকেই বিচারক পদে নিযুক্ত করে থাকেন তবে এ সমাজ থেকে নির্ব্বাসনই আমাদের পক্ষে শ্রেয়।

হারানবাবু চৌকি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন ললিতা, তুমি এসেছ আমি খুসি হয়েছি। তোমার সম্বন্ধে যা নালিশ তোমার সাম্‌নেই তার বিচার হওয়া উচিত।

ক্রোধে সুচরিতার মুখ চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে কহিল—হারানবাবু, আপনার ঘরে গিয়ে আপনার বিচারশালা আহ্বান করুন। গৃহস্থের ঘরের মধ্যে চড়ে তাদের অপমান করবেন আপনার এ অধিকার আমরা কোনো মতেই মানব না। আয় ভাই ললিতা।

ললিতা এক পা নড়িল না—কহিল—না দিদি, আমি পালাব না। পানুবাবুর যা কিছু বলবার আছে সব আমি শুনে যেতে চাই। বলুন, কি বলবেন, বলুন!

হারানবাবু থমকিয়া গেলেন। পরেশবাবু কহিলেন—না, ললিতা, আজ সুচরিতা আমাদের বাড়ি থেকে যাবে—আজ সকালে আমি কোনো রকম অশান্তি ঘট্‌তে দিতে পারব না। হারানবাবু, আমাদের যতই অপরাধ থাক্ তবু আজকের মত আমাদের মাপ কর্‌তে হবে।

হারান চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। সুচরিতা যতই তাঁহাকে বর্জ্জন করিতেছিল সুচরিতাকে ধরিয়া রাখিবার জেদ ততই তাঁহার বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল অসামান্য নৈতিক জোরের দ্বারা তিনি নিশ্চয়ই জিতিবেন। এখনো তিনি যে হাল ছাড়িয়া

দিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু মাসির সঙ্গে সুচরিতা অন্য বাড়িতে গেলে সেখানে তাঁহার শক্তি প্রতিহত হইতে থাকিবে এই আশঙ্কায় তাঁহার মন ক্ষুব্ধ ছিল। এই জন্য আজ তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রগুলিকে শান দিয়া আনিয়াছিলেন। কোনোমতে আজ সকালবেলাকার মধ্যেই খুব কড়া রকম করিয়া বোঝাপড়া করিয়া লইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। আজ সমস্ত সঙ্কোচ তিনি দূর করিয়াই আসিয়াছিলেন—কিন্তু অপর পক্ষেও যে এমন করিয়া সঙ্কোচ দূর করিতে পারে, ললিতা সুচরিতাও যে হঠাৎ তূণ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দাঁড়াইবে তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার নৈতিক অগ্নিবাণ যখন তিনি মহাতেজে নিক্ষেপ করিতে থাকিবেন অপর পক্ষের মাথা একেবারে হেঁট হইয়া যাইবে। ঠিক তেমনটি হইল না—অবসরও চলিয়া গেল। কিন্তু হারানবাবু হার মানিবেন না। তিনি মনে মনে কহিলেন, সত্যের জয় হইবেই অর্থাৎ হারানবাবুর জয় হইবেই। কিন্তু জয় ত শুধু শুধু হয় না। লড়াই করিতে হইবে। হারানবাবু কোমর বাঁধিয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

সুচরিতা কহিল—মাসি, আজ আমি সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খাব—তুমি কিছু মনে করলে চল্‌বে না!

হরিমোহিনী চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন সুচরিতা সম্পূর্ণই তাঁহার হইয়াছে—বিশেষত নিজের সম্পত্তির জোরে স্বাধীন হইয়া সে স্বতন্ত্র ঘর করিতে চলিয়াছে এখন হরিমোহিনীকে আর কোনো সঙ্কোচ করিতে হইবে না—ষোল আনা নিজের মত করিয়া চলিতে পারিবেন। তাই, আজ যখন সুচরিতা শুচিতা বিসর্জ্জন করিয়া আবার সকলের সঙ্গে একত্রে অন্নগ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিল তখন তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

সুচরিতা তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিল—আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি এ'তে ঠাকুর খুসি হবেন। সেই আমার অন্তর্য্যামী ঠাকুর

আমাকে সকলের সঙ্গে আজ এক সঙ্গে খেতে বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা না মান্‌লে তিনি রাগ করবেন। তাঁর রাগকে আমি তোমার রাগের চেয়ে ভয় করি।

যতদিন হরিমোহিনী বরদাসুন্দরীর কাছে অপমানিত হইতেছিলেন ততদিন সুচরিতা তাঁহার অপমানের অংশ লইবার জন্য তাঁহার আচার গ্রহণ করিয়াছিল এবং আজ সেই অপমান হইতে যখন নিষ্কৃতির দিন উপস্থিত হইল তখন সুচরিতা যে আচার সম্বন্ধে স্বাধীন হইতে দ্বিধা বোধ করিবে না, হরিমোহিনী তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। হরিমোহিনী সুচরিতাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়া লন নাই, বোঝাও তাঁহার পক্ষে শক্ত ছিল।

হরিমোহিনী সুচরিতাকে স্পষ্ট করিয়া নিষেধ করিলেন না কিন্তু মনে মনে রাগ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—মা গো, মানুষের ইহাতে যে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না! ব্রাহ্মণের ঘরে ত জন্ম বটে!

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—একটা কথা বলি বাছা, যা কর তা কর তোমাদের ঐ বেহারাটার হাতে জল খেয়ো না!

সুচরিতা কহিল—কেন মাসি, ঐ রামদীন বেহারাই ত তার নিজের গোরু দুইয়ে তোমাকে দুধ দিয়ে যায়!

হরিমোহিনী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, অবাক্ করলি! দুধ আর জল এক হল!

সুচরিতা হাসিয়া কহিল—আচ্ছা মাসি রামদীনের ছোঁয়া জল আজ আমি খাবনা। কিন্তু সতীশকে যদি তুমি বারণ কর তবে সে ঠিক তার উল্‌টো কাজটি করবে।

হরিমোহিনী কহিলেন—সতীশের কথা আলাদা।

হরিমোহিনী জানিতেন পুরুষমানুষের সম্বন্ধে নিয়ম সংযমের ত্রুটি মাপ করিতেই হয়।

৪৫

হারানবাবু রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

আজ প্রায় পনেরো দিন হইয়া গিয়াছে ললিতা ষ্টীমারে করিয়া বিনয়ের সঙ্গে আসিয়াছে। কথাটা দুই এক জনের কানে গিয়াছে এবং অল্পে অল্পে ব্যাপ্ত হইবারও চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি দুই দিনের মধ্যেই এই সংবাদ শুক্‌নো খড়ে আগুন লাগার মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মপরিবারের ধর্ম্মনৈতিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই প্রকারের কদাচারকে যে দমন করা কর্ত্তব্য হারানবাবু তাহা অনেককেই বুঝাইয়াছেন। এসব কথা বুঝাইতেও বেশি কষ্ট পাইতে হয় না। যখন আমরা সত্যের অনুরোধে কর্ত্তব্যের অনুরোধে পরের স্খলন লইয়া ঘৃণা প্রকাশ ও দণ্ডবিধান করিতে উদ্যত হই তখন সত্যের ও কর্ত্তব্যের অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হয় না। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজে হারানবাবু যখন অপ্রিয় সত্য ঘোষণা ও কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন এত বড় অপ্রিয়তা ও কঠোরতার ভয়ে তাঁহার সঙ্গে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে অধিকাংশ লোক পরান্মুখ হইল না। ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী লোকেরা গাড়ি পাল্কি ভাড়া করিয়া পরস্পরের বাড়ি গিয়া বলিয়া আসিলেন, আজকাল যখন এমন সকল ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সঙ্গে, সুচরিতা যে হিন্দু হইয়াছে, এবং হিন্দুমাসির ঘরে আশ্রয় লইয়া যাগযজ্ঞ তপজপ ও ঠাকুর সেবা লইয়া দিন যাপন করিতেছে একথাও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

অনেক দিন হইতে ললিতার মনে একটা লড়াই চলিতেছিল। সে প্রতিরাত্রে শুইতে যাইবার আগে বলিতেছিল কখনই আমি হার মানিব না এবং প্রতিদিন ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় বসিয়া বলিয়াছে কোনো মতেই আমি

হার মানিব না। এই যে বিনয়ের চিন্তা তাহার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে—বিনয় নীচের ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছে জানিতে পারিলে তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্ত উতলা হইয়া উঠিতেছে, বিনয় দুই দিন তাহাদের বাড়িতে না আসিলে অবরুদ্ধ অভিমানে তাহার মন নিপীড়িত হইতেছে, মাঝে মাঝে সতীশকে নানা উপলক্ষ্যে বিনয়ের বাসায় যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে এবং সতীশ ফিরিয়া আসিলে, বিনয় কি করিতেছিল বিনয়ের সঙ্গে কি কথা হইল তাহার আদ্যোপান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে ইহা ললিতার পক্ষে যতই অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে ততই পরাভবের গ্লানিতে তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। বিনয় ও গোরার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বাধা দেন নাই বলিয়া এক একবার পরেশ বাবুর প্রতি তাহার রাগও হইত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে লড়াই করিবে, মরিবে তবু হারিবে না, এই তাহার পণ ছিল। জীবন যে কেমন করিয়া কাটাইবে সে সম্বন্ধে নানা প্রকার কল্পনা তাহার মনের মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। য়ুরোপের লোকহিতৈষিণী রমণীদের জীবনচরিতে যে সকল কীর্ত্তিকাহিনী সে পাঠ করিয়াছিল সেইগুলি তাহার নিজের পক্ষে সাধ্য ও সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

একদিন সে পরেশ বাবুকে গিয়া কহিল, বাবা, আমি কি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে শেখাবার ভার নিতে পারিনে?

পরেশবাবু তাঁহার মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ক্ষুধাতুর হৃদয়ের বেদনায় তাহার সকরুণ দুটি চক্ষু যেন কাঙাল হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, কেন পারবে না মা? কিন্তু তেমন মেয়ে-ইস্কুল কোথায়?

যে সময়ের কথা হইতেছে তখন মেয়ে-ইস্কুল বেশি ছিল না, সামান্য পাঠশালা ছিল এবং ভদ্র ঘরের মেয়েরা শিক্ষয়িত্রীর কাজে তখনও অগ্রসর হন নাই। ললিতা ব্যাকুল হইয়া কহিল, ইস্কুল নেই বাবা?

পরেশবাবু কহিলেন, কই, দেখিনে ত!

ললিতা কহিল, আচ্ছা, বাবা, মেয়ে-ইস্কুল কি একটা করা যায় না?

পরেশবাবু কহিলেন, অনেক খরচের কথা, এবং অনেক লোকের সহায়তা চাই।

ললিতা জানিত সৎকর্ম্মের সংকল্প জাগাইয়া তোলাই কঠিন কিন্তু তাহা সাধন করিবার পথেও যে এত বাধা তাহা সে পূর্ব্বে ভাবে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার এই প্রিয়তমা কন্যাটির হৃদয়ের ব্যথা কোন্‌খানে পরেশবাবু তাহাই বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিনয়ের সম্বন্ধে হারানবাবু সে দিন যে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন তাহাও তাঁহার মনে পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি অবিবেচনার কাজ করিয়াছি? তাঁহার অন্য কোনো মেয়ে হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না—কিন্তু ললিতার জীবন যে ললিতার পক্ষে অত্যন্ত সত্য পদার্থ; সে ত আধাআধি কিছুই জানে না; সুখ দুঃখ তাহার পক্ষে কিছু-সত্য-কিছু-ফাঁকি নহে।

সেইদিনই মধ্যাহ্নে ললিতা সুচরিতার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে গৃহসজ্জা বিশেষ কিছুই নাই। মেঝের উপর একটি ঘর জোড়া সতরঞ্চ, তাহারই একদিকে সুচরিতার বিছানা পাতা ও অন্য দিকে হরিমোহিনীর বিছানা। হরিমোহিনী খাটে শোন না বলিয়া সুচরিতাও তাঁহার সঙ্গে এক ঘরে নীচে বিছানা করিয়া শুইতেছে। দেয়ালে পরেশ বাবুর একখানি ছবি টাঙানো। পাশের একটি ছোটো ঘরে সতীশের খাট পড়িয়াছে এবং একধারে একটি ছোটো টেবিলের উপর দোয়াতে কলম খাতা বই শ্লেট বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো রহিয়াছে সতীশ ইস্কুলে গিয়াছে। বাড়ি নিস্তব্ধ।

আহারান্তে হরিমোহিনী তাঁহার মাদুরের উপর শুইয়া নিদ্রার উপক্রম করিতেছেন, এবং সুচরিতা পিঠে মুক্তচুল মেলিয়া দিয়া সতরঞ্চে বসিয়া

কোলের উপর বালিশ লইয়া একমনে কি পড়িতেছে। সম্মুখে আরো কয়খানা বই পড়িয়া আছে।

ললিতাকে হঠাৎ ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সুচরিতা যেন লজ্জিত হইয়া প্রথমটা বই বন্ধ করিল, পরক্ষণে লজ্জার দ্বারাই লজ্জাকে দমন করিয়া বই যেমন ছিল তেমনিই রাখিল। এই বইগুলি গোরার রচনাবলী।

হরিমোহিনী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—এস, এস, মা ললিতা এস। তোমাদের বাড়ি ছেড়ে সুচরিতার মনের মধ্যে কেমন করচে সে আমি জানি। ওর মন খারাপ হলেই ঐ বইগুলো নিয়ে পড়তে বসে। এখনি আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম তোমরা কেউ এলে ভাল হয়—অমনি তুমি এসে পড়েছ—অনেকদিন বাঁচবে মা!

ললিতার মনে যে কথাটা ছিল, সুচরিতার কাছে বসিয়া সে একেবারেই তাহা আরম্ভ করিয়া দিল। সে কহিল সুচিদিদি, আমাদের পাড়ায় মেয়েদের জন্যে যদি একটা ইস্কুল করা যায় তাহলে কেমন হয়?

হরিমোহিনী অবাক্ হইয়া কহিলেন—শোনো একবার কথা! তোমরা ইস্কুল করবে কি!

সুচরিতা কহিল—কেমন করে করা যাবে বল্? কে আমাদের সাহায্য করবে? বাবাকে বলেছিস্ কি?

ললিতা কহিল—আমরা দুজনে ত পড়াতে পারব। হয়ত বড়দিদিও রাজি হবে।

সুচরিতা কহিল—শুধু পড়ানো নিয়ে ত কথা নয়। কি রকম করে ইস্কুলের কাজ চালাতে হবে তার সব নিয়ম বেঁধে দেওয়া চাই, বাড়ি ঠিক করতে হবে, ছাত্রী সংগ্রহ করতে হবে, খরচ জোগাতে হবে। আমরা দুজন মেয়েমানুষ এর কি করতে পারি!

ললিতা কহিল—দিদি, ওকথা বল্লে চল্বে না। মেয়েমানুষ হয়ে

জন্মেছি বলেই কি নিজের মনখানাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছাড় খেতে থাক্‌ব ? পৃথিবীর কোনো কাজেই লাগব না ?

ললিতার কথাটার মধ্যে যে বেদনা ছিল সুচরিতার বুকের মধ্যে গিয়া তাহা বাজিয়া উঠিল। সে কোনো উত্তর না করিয়া ভাবিতে লাগিল।

ললিতা কহিল—পাড়ায় ত অনেক মেয়ে আছে। আমরা যদি তাদের অম্‌নি পড়াতে চাই বাপ মারা ত খুসি হবে। তাদের যে ক'জনকে পাই তোমার এই বাড়িতে এনে পড়ালেই হবে। এতে খরচ কিসের ?

এই বাড়িতে রাজ্যের অপরিচিত ঘরের মেয়ে জড় করিয়া পড়াইবার প্রস্তাবে হরিমোহিনী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি নিরিবিলি পূজা অর্চ্চনা লইয়া শুদ্ধ শুচি হইয়া থাকিতে চান, তাহার ব্যাঘাতের সম্ভাবনায় আপত্তি করিতে লাগিলেন।

সুচরিতা কহিল, মাসি তোমার ভয় নেই, যদি ছাত্রী জোটে তাদের নিয়ে আমাদের নীচের তলার ঘরেই কাজ চালাতে পারব, তোমার উপরের ঘরে আমরা উৎপাত কর্‌তে আস্‌ব না। তা ভাই ললিতা, যদি ছাত্রী পাওয়া যায়, তা হলে আমি রাজি আছি।

ললিতা কহিল—আচ্ছা দেখাই যাক্‌না।

হরিমোহিনী বারবার কহিতে লাগিলেন—মা সকল বিষয়েই তোমরা খৃষ্টানের মত হলে চল্‌বে কেন ? গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ইস্কুল পড়ায় এ ত বাপের বয়সে শুনিনি !

পরেশ বাবুর ছাতের উপর হইতে আশপাশের বাড়ির ছাতে মেয়েদের মধ্যে আলাপ পরিচয় চলিত। এই পরিচয়ের একটা মস্ত কণ্টক ছিল, পাশের বাড়ির মেয়েরা এ বাড়ির মেয়েদের এত বয়সে এখনো বিবাহ হইল না বলিয়া প্রায়ই প্রশ্ন এবং বিস্ময় প্রকাশ করিত। ললিতা এই কারণে এই ছাতের আলাপে পারৎপক্ষে যোগ দিত না।

এই ছাতে ছাতে বন্ধুত্ব বিস্তারে লাবণ্যই ছিল সকলের চেয়ে উৎসাহী।

অন্য বাড়ির সাংসারিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের সীমা ছিল না। তাহার প্রতিবেশীদের দৈনিক জীবনযাত্রার প্রধান ও অপ্রধান অনেক বিষয়ই দূর হইতে বায়ুযোগে তাহার নিকট আলোচিত হইত। চিরুণী হস্তে কেশসংস্কার করিতে করিতে মুক্ত আকাশ তলে প্রায়ই তাহার অপরাহ্নসভা জমিত।

ললিতা তাহার সংকল্পিত মেয়ে ইস্কুলের ছাত্রীসংগ্রহের ভার লাবণ্যের উপর অর্পণ করিল। লাবণ্য ছাতে ছাতে যখন এই প্রস্তাব ঘোষণা করিয়া দিল তখন অনেক মেয়েই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ললিতা খুসি হইয়া সুচরিতার বাড়ির একতালার ঘর ঝাঁট দিয়া ধুইয়া সাজাইয়া প্রস্তুত করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার ইস্কুলঘর শূন্যই রহিয়া গেল। বাড়ির কর্ত্তারা তাঁদের মেয়েদের ভুলাইয়া পড়াইবার ছলে ব্রাহ্মবাড়িতে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এমন কি, এই উপলক্ষ্যেই যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন পরেশ বাবুর মেয়েদের সঙ্গে তাঁহাদের মেয়েদের আলাপ চলে তখন তাহাতে বাধা দেওয়াই তাঁহারা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। তাঁহাদের মেয়েদের ছাতে ওঠা বন্ধ হইবার জো হইল এবং ব্রাহ্মপ্রতি-বেশীর মেয়েদের সাধু সংকল্পের প্রতি তাঁহারা সাধুভাষা প্রয়োগ করিলেন না। বেচারা লাবণ্য যথাসময়ে চিরুণী হাতে ছাতে উঠিয়া দেখে পার্শ্ববর্ত্তী ছাতগুলিতে নবীনাদের পরিবর্ত্তে প্রবীণাদের সমাগম হইতেছে এবং তাঁহাদের একজনের নিকট হইতেও সে সাদর সম্ভাষণ লাভ করিল না।

ললিতা ইহাতেও ক্ষান্ত হইল না। সে কহিল অনেক গরীব ব্রাহ্ম মেয়েদের বেথুন ইস্কুলে গিয়া পড়া দুঃসাধ্য, তাহাদের পড়াইবার ভার লইলে উপকার হইতে পারিবে।

এইরূপ ছাত্রী সন্ধানে সে নিজেও লাগিল সুধীরকেও লাগাইয়া দিল।

সেকালে পরেশ বাবুর মেয়েদের পড়াশুনার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। এমন কি, সে খ্যাতি সত্যকেও অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এ জন্য ইঁহারা মেয়েদের বিনা বেতনে পড়াইবার ভার লইবেন শুনিয়া অনেক পিতামাতাই খুসি হইয়া উঠিলেন।

প্রথমে পাঁচ ছয়টি মেয়ে লইয়া দুই চার দিনেই ললিতার ইস্কুল বসিয়া গেল। পরেশ বাবুর সঙ্গে এই ইস্কুলের কথা আলোচনা করিয়া ইহার নিয়ম বাঁধিয়া ইহার আয়োজন করিয়া সে নিজেকে একমুহূর্ত্ত সময় দিল না। এমন কি, বৎসরের শেষে পরীক্ষা হইয়া গেলে মেয়েদের কিরূপ প্রাইজ দিতে হইবে তাহা লইয়া লাবণ্যের সঙ্গে ললিতার রীতিমত তর্ক বাধিয়া গেল—ললিতা যে বইগুলার কথা বলে লাবণ্যর তাহা পছন্দ হয় না, আবার লাবণ্যর সঙ্গে ললিতার পছন্দরও মিল হয় না। পরীক্ষা কে কে করিবে তাহা লইয়াও একটু তর্ক হইয়া গেল। লাবণ্য মোটের উপরে যদিও হারান বাবুকে দেখিতে পারিত না কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে সে অভিভূত ছিল। হারান বাবু তাহাদের বিদ্যালয়ের পরীক্ষা অথবা শিক্ষা অথবা কোনো একটা কাজে নিযুক্ত থাকিলে সেটা যে বিশেষ গৌরবের বিষয় হইবে এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র ছিল না। কিন্তু ললিতা কথাটাকে একেবারেই উড়াইয়া দিল—হারান বাবুর সঙ্গে তাহাদের এ বিদ্যালয়ের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

দুই তিন দিনের মধ্যেই তাহার ছাত্রীর দল কমিতে কমিতে ক্লাস শূন্য হইয়া গেল। ললিতা তাহার নির্জ্জন ক্লাসে বসিয়া পদশব্দ শুনিবামাত্র ছাত্রী সম্ভাবনায় সচকিত হইয়া উঠে কিন্তু কেহই আসে না। এমন করিয়া দুই প্রহর যখন কাটিয়া গেল তখন সে বুঝিল একটা কিছু গোল হইয়াছে।

নিকটে যে ছাত্রীটি ছিল ললিতা তাহার বাড়িতে গেল। ছাত্রী কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিল—মা আমাকে যেতে দিচ্ছে না। মা কহিলেন, অসুবিধা হয়। অসুবিধাটা যে কি তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। ললিতা

অভিমানিনী মেয়ে; সে অন্য পক্ষে অনিচ্ছার লেশমাত্র লক্ষণ দেখিলে জেদ করিতে বা কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেই না। সে কহিল, যদি অসুবিধা হয় তা হলে কাজ কি!

ললিতা ইহার পরে যে বাড়িতে গেল সেখানে স্পষ্ট কথাই শুনিতে পাইল। তাহারা কহিল, সুচরিতা আজকাল হিন্দু হইয়াছে, সে জাত মানে, তাহার বাড়িতে ঠাকুর পূজা হয়, ইত্যাদি।

ললিতা কহিল সে জন্য যদি আপত্তি থাকে তবে না হয় আমাদের বাড়িতে ইস্কুল বসবে।

কিন্তু ইহাতেও আপত্তির খণ্ডন হইল না, আরো একটা কিছু বাকি আছে? ললিতা অন্য বাড়িতে না গিয়া সুধীরকে ডাকাইয়া পাঠাইল। জিজ্ঞাসা করিল, সুধীর, কি হয়েছে সত্য করে বল ত?

সুধীর কহিল—পানু বাবু তোমাদের এই স্কুলের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছেন।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, কেন, দিদির বাড়িতে ঠাকুর পূজো হয় বলে?

সুধীর কহিল—শুধু তাই নয়

ললিতা অধীর হইয়া কহিল—আর কি, বলই না।

সুধীর কহিল সে—অনেক কথা!

ললিতা কহিল—আমারো অপরাধ আছে বুঝি!

সুধীর চুপ করিয়া রহিল। ললিতা মুখ লাল করিয়া বলিল—এ আমার সেই ষ্টীমার যাত্রার শাস্তি! যদি অবিবেচনার কাজ করেই থাকি তবে ভাল কাজ করে প্রায়শ্চিত্ত করবার পথ আমাদের সমাজে একবারেই বন্ধ বুঝি! আমার পক্ষে সমস্ত শুভকর্ম্ম এ সমাজে নিষিদ্ধ? আমার এবং আমাদের সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির এই প্রণালী তোমরা ঠিক করেছ!

সুধীর কথাটাকে একটু নরম করিবার জন্য কহিল—ঠিক সে জন্যে

নয়। বিনয় বাবুরা পাছে ক্রমে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন ওঁরা সেই ভয় করেন।

ললিতা একেবারে আগুন হইয়া কহিল, সে ভয়, না, সে ভাগ্য! যোগ্যতায় বিনয় বাবুর সঙ্গে তুলনা হয় এমন লোক ওঁদের মধ্যে ক'জন আছে!

সুধীর ললিতার রাগ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, সে ত ঠিক কথা! কিন্তু বিনয় বাবু ত—

ললিতা। ব্রাহ্মসমাজের লোক নন! সেই জন্যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে দণ্ড দেবেন! এমন সমাজের জন্যে আমি গৌরব বোধ করিনে!

ছাত্রীদের সম্পূর্ণ তিরোধান দেখিয়া সুচরিতা, ব্যাপারখানা কি এবং কাহার দ্বারা ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে এসম্বন্ধে কোনো কথাটি না কহিয়া উপরের ঘরে সতীশকে তাহার আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতেছিল।

সুধীরের সঙ্গে কথা কহিয়া ললিতা সুচরিতার কাছে গেল, কহিল—শুনেছ?

সুচরিতা একটু হাসিয়া কহিল, শুনি নি, কিন্তু সব বুঝেছি।

ললিতা কহিল, এ সব কি সহ্য করতে হবে?

সুচরিতা ললিতার হাত ধরিয়া কহিল, সহ্য করতে ত অপমান নেই। বাবা কেমন করে সব সহ্য করেন দেখেছিস্ ত?

ললিতা কহিল, কিন্তু সুচি দিদি, আমার অনেক সময় মনে হয় সহ্য করার দ্বারা অন্যায়কে যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়! অন্যায়কে সহ্য না করাই হচ্চে তার প্রতি উচিত ব্যবহার!

সুচরিতা কহিল, তুই কি করতে চাস্ তাই বল্!

ললিতা কহিল, তা আমি কিচ্ছু ভাবিনি—আমি কি করতে পারি তাও জানিনে—কিন্তু একটা কিছু করতেই হবে। আমাদের মত মেয়ে মানুষের

সঙ্গে এমন নীচ ভাবে যারা লেগেছে তারা নিজেদের যত বড় লোক মনে করুক্ তারা কাপুরুষ। কিন্তু তাদের কাছে আমি কোনো মতেই হার মান্‌ব না—কোনো মতেই না। এতে তারা যা করতে পারে করুক! বলিয়া ললিতা মাটিতে পদাঘাত করিল।

সুচরিতা কোনো উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে ললিতার হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, ললিতা, ভাই, একবার বাবার সঙ্গে কথা কয়ে দেখ্।

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি এখনি তাঁর কাছেই যাচ্চি।

ললিতা তাহাদের বাড়ির দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল নতশিরে বিনয় বাহির হইয়া আসিতেছে। ললিতাকে দেখিয়া বিনয় মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল—ললিতার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিয়া লইবে কি না সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটা বিতর্ক উপস্থিত হইল—কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া ললিতার মুখের দিকে না চাহিয়া তাহাকে নমস্কার করিল ও মাথা হেঁট করিয়াই চলিয়া গেল।

ললিতাকে যেন অগ্নিতপ্ত শেলে বিদ্ধ করিল। সে দ্রুতপদে বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই একেবারে তাহার ঘরে গেল। তাহার মা তখন টেবিলের উপর একটা লম্বা সরু খাতা খুলিয়া হিসাবে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ললিতার মুখ দেখিয়াই বরদাসুন্দরী মনে-শঙ্কা গণিলেন। তাড়াতাড়ি হিসাবের খাতাটার মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবার প্রয়াস পাইলেন—যেন একটা কি অঙ্ক আছে যাহা এখনি মিলাইতে না পারিলে তাঁহার সংসার একেবারে ছারখার হইয়া যাইবে।

ললিতা চৌকি টানিয়া টেবিলের কাছে বসিল। তবু বরদাসুন্দরী মুখ তুলিলেন না। ললিতা কহিল—মা!

বরদাসুন্দরী কহিলেন, রোস্ বাছা, আমি এই—বলিয়া খাতাটার প্রতি নিতান্ত ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

ললিতা কহিল, আমি বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। একটা কথা জানতে চাই। বিনয় বাবু এসেছিলেন?

বরদাসুন্দরী খাতা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন, হাঁ।

ললিতা। তাঁর সঙ্গে তোমার কি কথা হল?

সে অনেক কথা।

ললিতা। আমার সম্বন্ধে কথা হয়েছে কি না?

বরদাসুন্দরী পলায়নের পন্থা না দেখিয়া কলম ফেলিয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, তা বাছা হয়েছিল! দেখ্‌লুম যে ক্রমেই বাড়াবাড়ি হয়ে পড়চে—সমাজের লোকে চারিদিকে নিন্দে করচে তাই সাবধান করে দিতে হল।

লজ্জায় ললিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাহার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কি বিনয় বাবুকে এখানে আসতে নিষেধ করেছেন?

বরদাসুন্দরী কহিলেন, তিনি বুঝি এসব কথা ভাবেন? যদি ভাব্‌তেন তাহলে গোড়াতেই এ সমস্ত হতে পারত না!

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, পানু বাবু আমাদের এখানে আস্‌তে পারবেন?

বরদাসুন্দরী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, শোন একবার! পানু বাবু আস্‌বেন না কেন?

ললিতা। বিনয় বাবুই বা আস্‌বেন না কেন?

বরদাসুন্দরী পুনরায় খাতা টানিয়া লইয়া কহিলেন, ললিতা, তোর সঙ্গে আমি পারিনে বাপু! যা এখন আমাকে জ্বালাস্‌নে—আমার অনেক কাজ আছে!

ললিতা দুপুর বেলায় সুচরিতার বাড়িতে ইস্কুল করিতে যায় এই অবকাশে বিনয়কে ডাকাইয়া আনিয়া বরদাসুন্দরী তাঁহার যাহা বক্তব্য বলিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, ললিতা টেরও পাইবে না। হঠাৎ চক্রান্ত এমন করিয়া ধরা পড়িল দেখিয়া তিনি বিপদবোধ করিলেন। বুঝিলেন, পরিণামে ইহার শান্তি নাই এবং সহজে ইহার নিষ্পত্তি হইবে না। নিজের কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীর উপর তাঁহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল। এই অবোধ লোকটিকে লইয়া ঘরকন্না করা স্ত্রীলোকের পক্ষে কি বিড়ম্বনা!

ললিতা হৃদয়ভরা প্রলয় ঝড় বহন করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নীচের ঘরে বসিয়া পরেশ বাবু চিঠি লিখিতেছিলেন, সেখানে গিয়াই একেবারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, বিনয় বাবু আমাদের সঙ্গে মেশবার যোগ্য নন্?

প্রশ্ন শুনিয়াই পরেশ বাবু অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার পরিবার লইয়া সম্প্রতি তাঁহাদের সমাজে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহা পরেশবাবুর অগোচর ছিল না। ইহা লইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট চিন্তা করিতেও হইতেছে। বিনয়ের প্রতি ললিতার মনের ভাব সম্বন্ধে যদি তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত না হইত তবে তিনি বাহিরের কথায় কিছুমাত্র কান দিতেন না। কিন্তু যদি বিনয়ের প্রতি ললিতার অনুরাগ জন্মিয়া থাকে তবে সে স্থলে তাঁহার কর্ত্তব্য কি সে প্রশ্ন তিনি বরাবর নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লওয়ার পর তাঁহার পরিবারে আবার এই একটা সঙ্কটের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য একদিকে একটা ভয় এবং কষ্ট তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করিতেছে অন্যদিকে তাঁহার সমস্ত চিত্তশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বলিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সময় যেমন একমাত্র ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, সত্যকেই সুখ সম্পত্তি সমাজ সকলের উর্দ্ধে স্বীকার

করিয়া জীবন চিরদিনের মত ধন্য হইয়াছে এখনো যদি সেইরূপ পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয় তবে তাঁহার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া উত্তীর্ণ হইব।

ললিতার প্রশ্নের উত্তরে পরেশ বাবু কহিলেন—বিনয়কে আমি ত খুব ভাল বলেই জানি। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিও যেমন, চরিত্রও তেমনি।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতা কহিল—গৌর বাবুর মা এর মধ্যে দুদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। সুচি দিদিকে নিয়ে তাঁর ওখানে আজ একবার যাব?

পরেশ বাবু ক্ষণকালের জন্য উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি নিশ্চয় জানিতেন বর্ত্তমান আলোচনার সময় এইরূপ যাতায়াতে তাঁহাদের নিন্দা আরো প্রশ্রয় পাইবে। কিন্তু তাঁহার মন বলিয়া উঠিল, যতক্ষণ ইহা অন্যায় নহে ততক্ষণ আমি নিষেধ করিতে পারিব না। কহিলেন আচ্ছা যাও! আমার কাজ আছে, নইলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতুম!